কোশল পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ. কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ : ১৩৫৭

প্রচ্ছদপট : সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর :
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১, সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমনোজ বসু

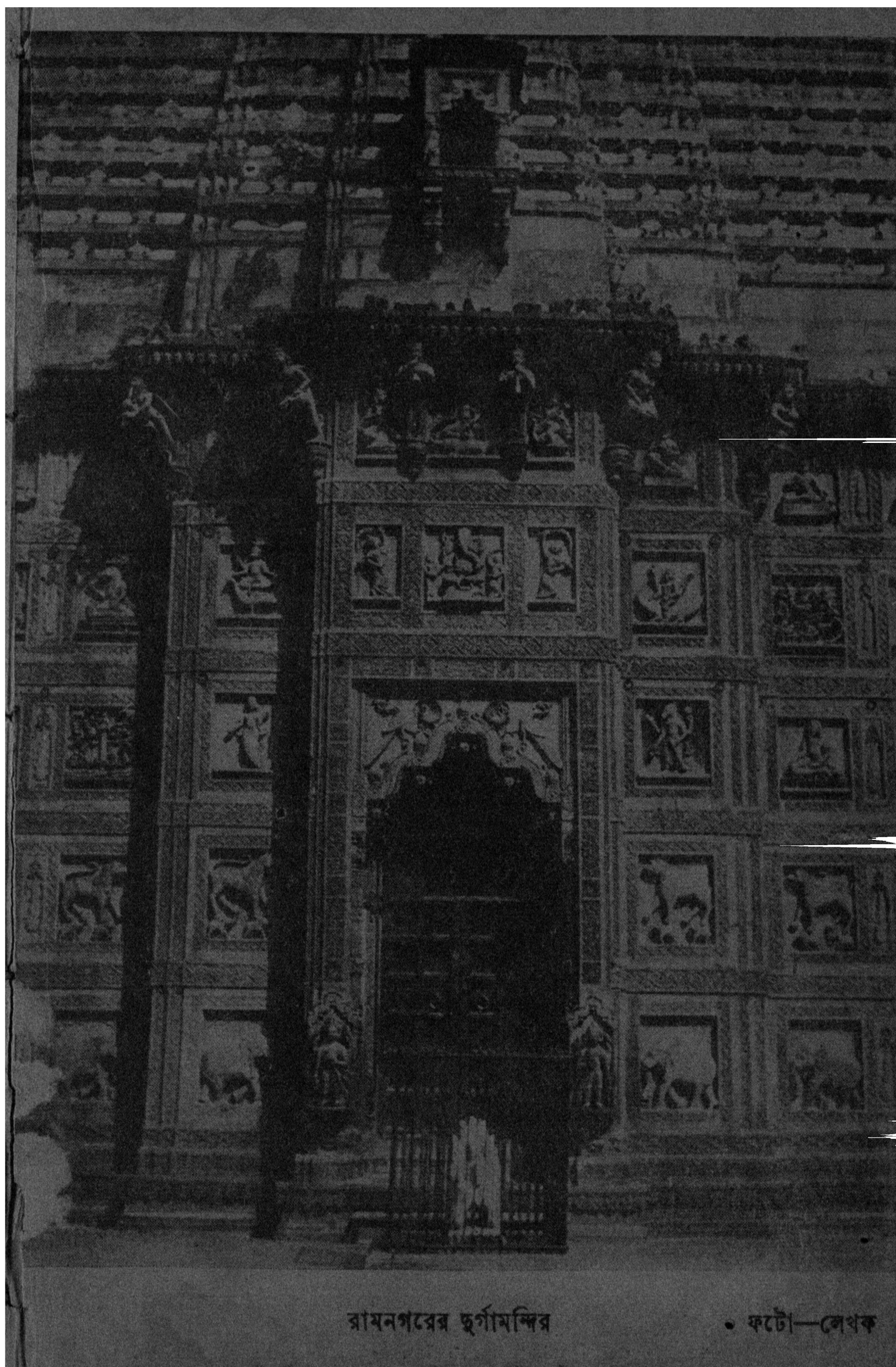
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

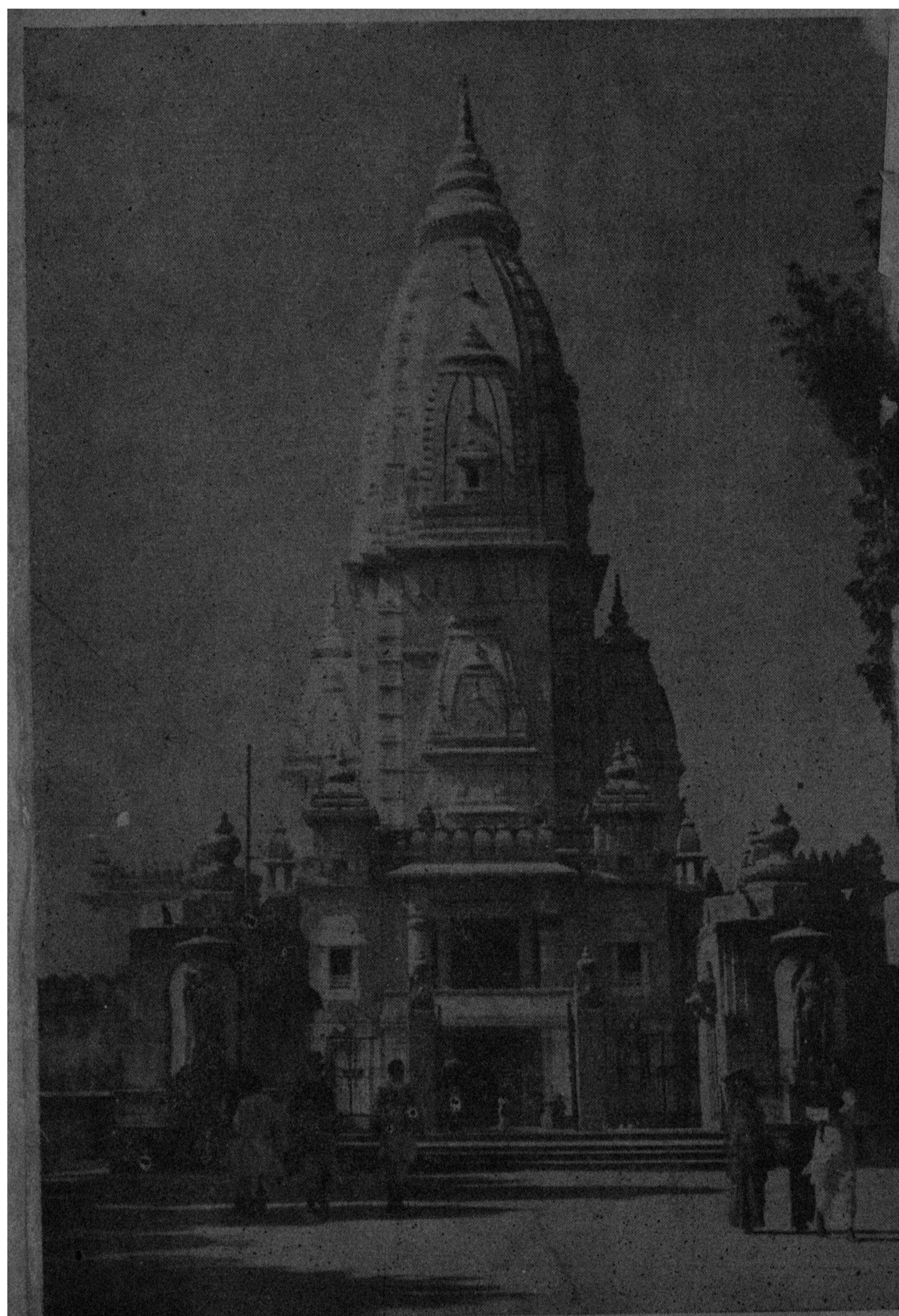
রম্যাণি বীক্ষ্যের মগধ পর্ব প্রকাশের সময় মনে হয়েছিল যে পুরাতন উত্তর ভারত পর্বের শেষাংশ উত্তর ভারত পর্ব নামেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই গ্রন্থখানি নূতন করে লেখার পরে দেখা গেল যে উত্তর ভারত নাম আর সার্থক হচ্ছে না। সমগ্র উত্তর ভারতের কথা এতে নেই কাশী অযোধ্যা হরিদ্বার এবং হিমালয়ের শৈলাবাস ও তীর্থস্থানগুলির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। পুরাকালে এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধতম রাজ্য কোশল। গ্রন্থের নাম তাই কোশল পর্ব রাখা হল।

উত্তর ভারত পর্ব আর প্রকাশিত হবে না।

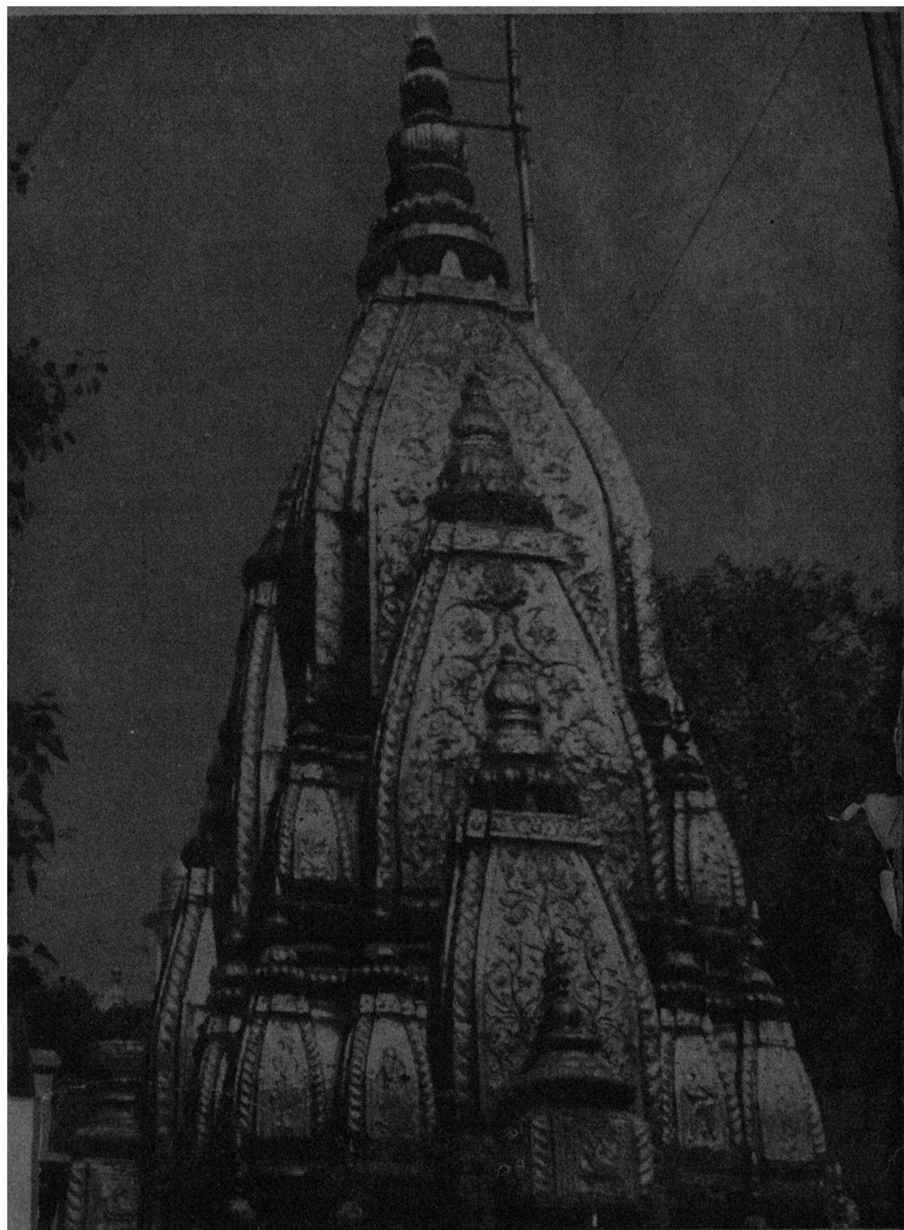
৩৫০, অফিসার্স কলোনি,
দানাপুর (পাটনা) গ্রন্থকার



রামনগরের দুর্গামন্দির • ফটো—লেখক



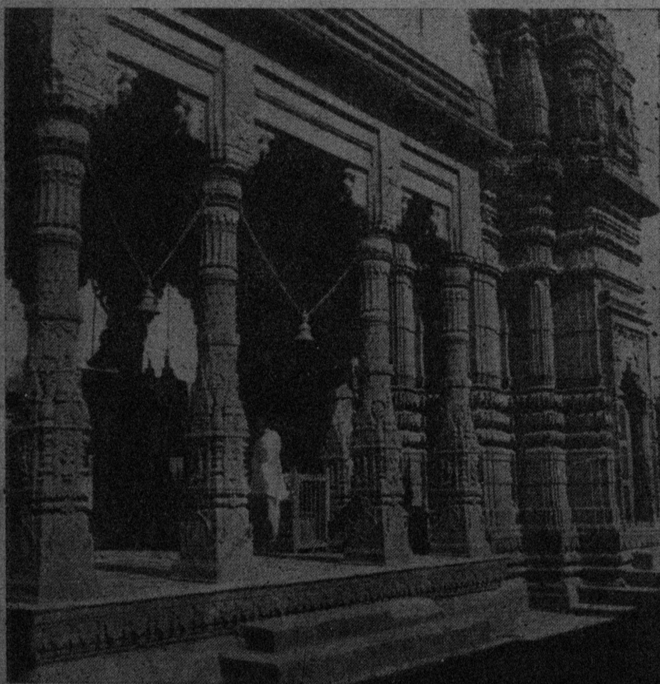
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনাথের নূতন মন্দির ফটো—



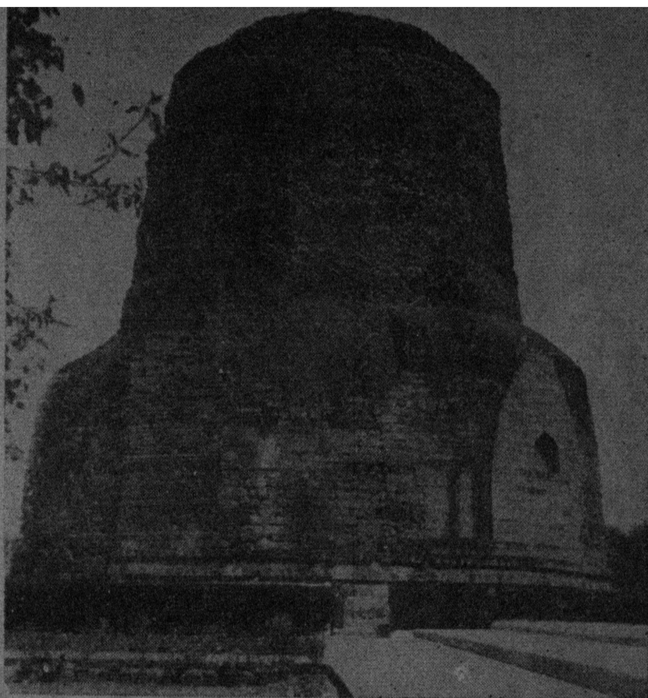
বিশ্বনাথের মন্দির, বারাণসী

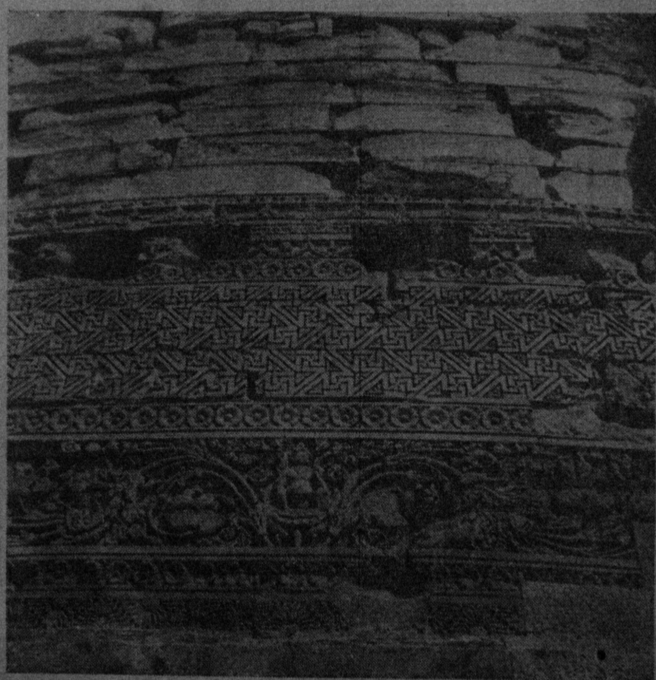
ফটো—লেখক



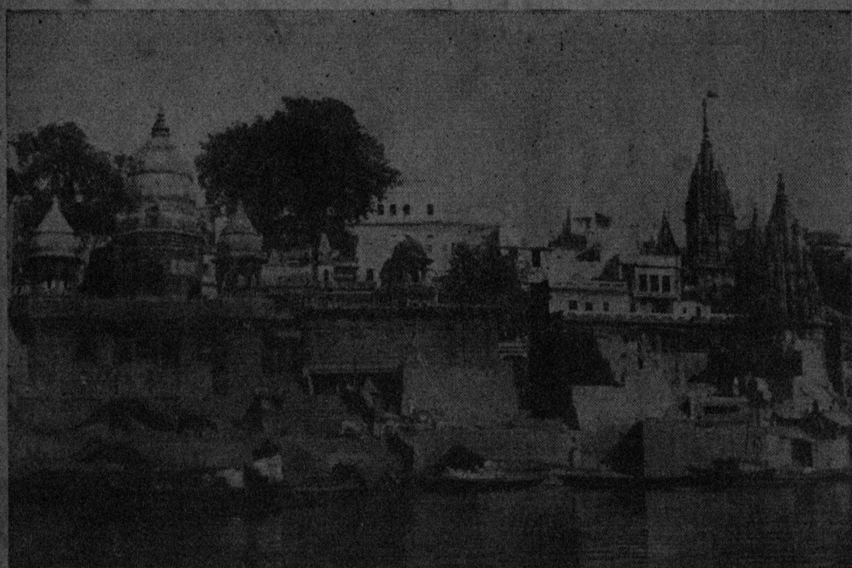


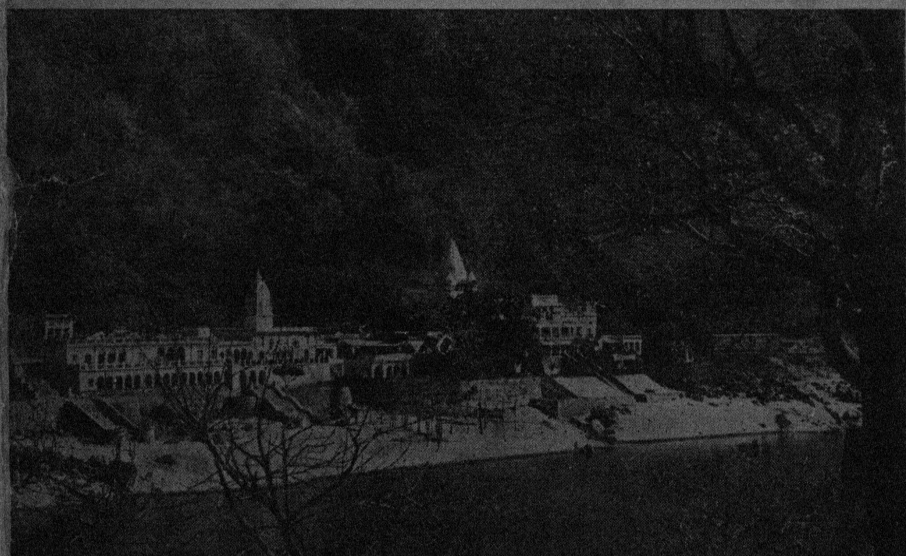
কাশীর দুর্গাবাড়ির ভিতর ও বাহির ফটো—লেখক





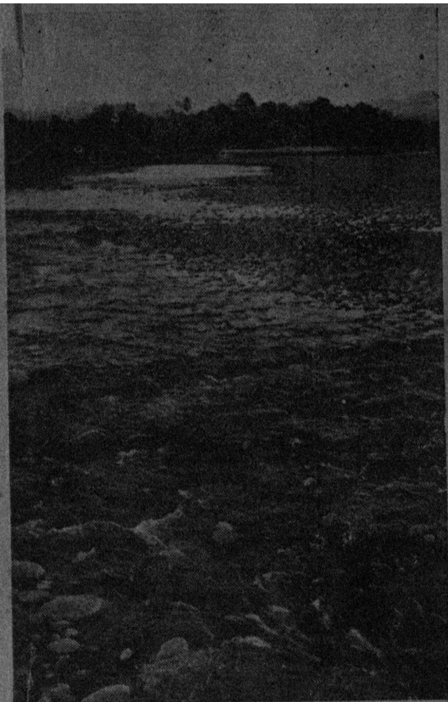
সারনাথের ধামেক স্তূপ ও তার গাত্রের কারুকার্য



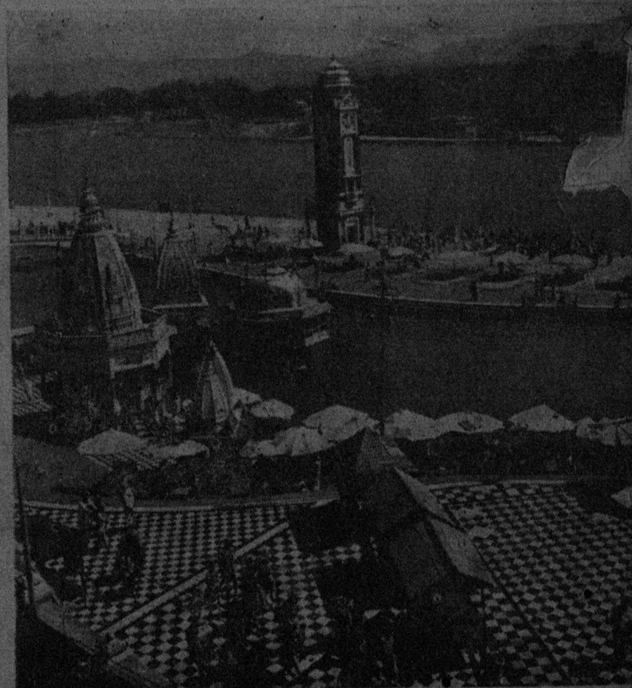


বারাণসী ও হৃষীকেশের গঙ্গা

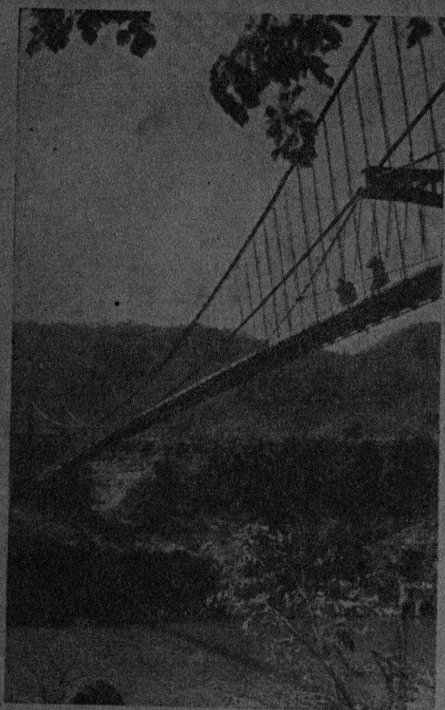
ফটো—লেখক ও ডক্টর সীতাংশু মিত্র



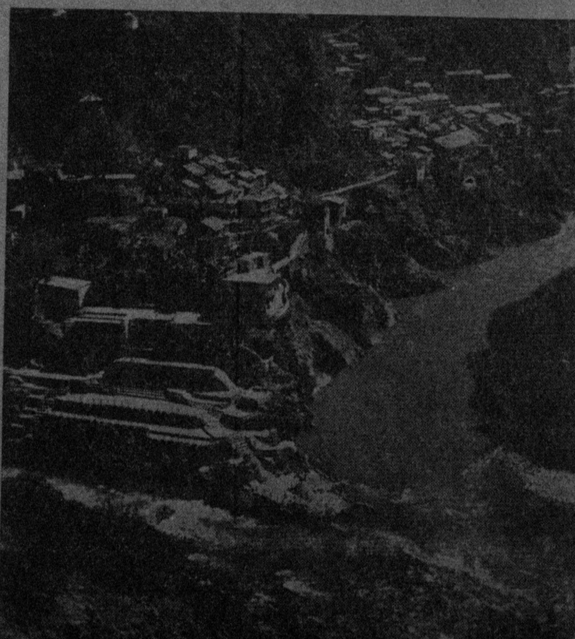
সপ্তর্ষি, হরিদ্বার



হর কী পৌড়ি, হরিদ্বার   ফটো—ডক্টর সীত



দেবপ্রয়াগ



দেবপ্রয়াগে অলকনন্দা ও
ভাগীরথীর সঙ্গম
ফটো—ডক্টর সীতাংশু মিত্র
শালকিয়া।

আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলুম।

একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। তার দাঁত নেই, চোখ দুটো বুঁজে গেছে। তবু বুঝতে পারছি যে তিনি কাঁদছেন না, হাসছেন আমাকে দেখে। চারি ধারটা একবার চেয়ে দেখে নিলুম। সত্যিই কেউ কোথাও নেই, শুধু আমি আছি, আর তিনি। আমাকে দেখেই তিনি হাসছেন। আমি রেগে গেলুম, বললুম, কে আপনি? কেন হাসছেন অমন করে?

কিন্তু বুড়ো কোন উত্তর দিলেন না। যে দিল, তাকে আমি দেখতে পেলুম না। বলল, কী আশ্চর্য! তোমার বিধাতাকে তুমি চেন না!

আমার বিধাতা! আমি চমকে উঠে দু চোখ রগড়ে ভাল করে তাকালুম, কিন্তু কাউকে আর দেখতে পেলুম না। সামনে পিছনে কেউ কোনখানে নেই। শুধু একটা আওয়াজ আসছে খটখট করে, আর একটা বিশ্রী আলোয় চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

আমি একটু নড়ে চড়ে বসবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারলুম যে ট্রেনের একটা কামরায় আমি বসে আছি, আর আমার সামনের সেই বুড়ো ভদ্রলোক ঘুমে একেবারে এলিয়ে পড়েছেন।

একটু একটু করে সব কথা আমার মনে পড়ছে। গয়া থেকে ট্রেনে উঠে মোগলসরাই যাচ্ছি। কিন্তু দিনকয়েক আগে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলুম কাশী যাবার জন্যে, কাশী থেকে হরিদ্বার। পদব্রজে কেদার বদরী আমরা যাব না, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীও নয়। হিমালয় পার হয়ে মানস সরোবর ও কৈলাস অভিযানের বাসনাও

আমাদের নেই। আমরা হরিদ্বারে যাব। আর হৃষীকেশে লছমনঝুলা পার হয়ে আমরা হিমালয়ের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসব।

মনোরঞ্জন বলেছিল: ২রা আশ্বিন তিথ্যমৃত যোগ, যাত্রা শুভ। পূজোর দেরি আছে, গাড়িতে ভিড় হবার আগেই বাড়িতে ফিরে আসব।

এই আশা নিয়েই আমরা বেরিয়েছিলুম এবং আমার বিধাতা বোধহয় সেদিনও এমনি করে হেসেছিলেন। হরিদ্বারে যাওয়া আমার হল না, কাশীতেও পৌছতে পারলুম না। মনোরঞ্জনের অজ্ঞাতসারে আমি পাটনায় নেমে পড়েছিলুম। পাটনা থেকে এসেছিলুম গয়ায়। আজ আমি একা যাচ্ছি মোগলসরাইয়ের দিকে। সেখান থেকে কাশী যাব কিনা এখনও তা ঠিক করতে পারি নি।

কাশী যাবার বাসনা আমার আছে, মনোরঞ্জনকেও আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু তার একটা কথায় আমি ভয় পেয়েছি। এখন এই মুহূর্তে সেই কথা আমার মনে পড়ছে।

পাঞ্জাব মেল বর্ধমান স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই মনোরঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল। ফিরেছিল কলা পাতায় মোড়া লুচি তরকারি নিয়ে। বলেছিল: তোমার জন্যেই এইসব পাওয়া গেল।

কার কাছে পাওয়া গেল, সেকথা সে বলেনি। বলেছিল: তোমারই বন্ধু তাঁরা। পাড়ার বন্ধু নয়, পথের বন্ধু। বুড়ো বুড়ির সঙ্গে তাঁদের মেয়েও আছে।

আমি চমকে উঠেছিলুম। মনোরঞ্জন কি স্বাতির কথা বলছে! মামা মামীর সঙ্গে কি সে আবার বেড়াতে বেরিয়েছে! কলকাতায় তাঁরা কবে এলেন! আর এলেনই যদি তো আমাকে একটা সংবাদ দিলেন না! হাওড়া স্টেশনেই বা লুকিয়ে রইলেন কেন?

আমাকে উদ্বিগ্ন দেখে মনোরঞ্জন সহাস্যে বলেছিল: তুমি চিন্তাশীল মানুষ, তোমাকে চিন্তার খোরাক দিলুম। গুড নাইট।

বলেই সে শোবার আয়োজন করেছিল। আর আমি জেগে

বসেছিলুম জানালার ধারে। এমনি করে জানালার ধারে বসে আমি তাঁদের সঙ্গে শুধু দক্ষিণ ভারতই ভ্রমণ করে আসি নি, রাজস্থান সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রও দেখে এসেছি। কিন্তু সে নিজের উদ্যোগে নয়, এবারের মতো বন্ধুর উৎসাহেও নয়। প্রথমবারে হাওড়া স্টেশনে আমি ধরা পড়েছিলুম, আর দ্বিতীয় বারে জয়পুর থেকে মামা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে মামার কৌতূহল ছিল, তিনি নিজেই তা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন: জীবনে বড় কাজ করার যোগ্যতা তোমার আছে, কিন্তু কী মতলবে কেরানিগিরি করছ তা বুঝিনে।

মামীর কোন কৌতূহল দেখিনি, কিন্তু লক্ষ্য করেছি তাঁর সতর্কতা। প্রথম দিনেই তিনি আমাকে বলেছিলেন: তোমার বোন স্বাতিকে তুমি আগে দেখনি গোপাল?

এই প্রশ্ন শুনেই আমার মনে হয়েছিল যে মামী আমাকে তার আদেশ জানিয়ে দিলেন। হোক সে দু-পুরুষ আগের একটা পাতানো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধকেই আমার শ্রদ্ধা করতে হবে।

তারপরে তিনি আমাকে স্বাতির বিবাহের খবর দিয়েছিলেন। অগ্রহায়ণে দিন স্থির হয়েছে। তার জন্যে শাড়িও কিনতে চেয়েছিলেন মাদ্রাজে। কিন্তু স্বাতির পছন্দ হয়নি। নিজের জন্যে একখানা কিনে বলেছিলেন, এই শাড়ি পরে জামাই বরণ করব।

কিন্তু আজও তিনি জামাই বরণ করতে পারেন নি। সেই সম্বন্ধ কেন ভেঙ্গে গিয়েছিল তা জানিনে, জানবার কোন চেষ্টাও করিনি। কিন্তু দিল্লীর রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে কেন বিয়ে হল না, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পেরেছি।

স্বাতির বিবাহের জন্য মামার কোন তাড়া দেখিনি। স্বাতির মতো তিনিও নির্বিকার আছেন এবং মামীর উদ্বেগ বোধহয় মনে মনে উপভোগ করেন।

কিন্তু আমি কেন এসব কথা ভাবছি! এ সব তো আমার

ভাববার কথা নয়। স্বাতি আমার ভ্রমণের সঙ্গী ছিল দক্ষিণ ভারতে, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রও একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি। পুণা দেখেছি, বোম্বাই থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছি নিজের দেশে।

স্বাতিরা নিশ্চয়ই এ গাড়িতে যাচ্ছে না। আমার কথা জানতে পারলে কি তারা আড়ালে লুকিয়ে থাকত! এ সমস্তই মনোরঞ্জনের ছল। আমার দুর্বলতার কথা জানে বলেই উপহাস করার সাহস রাখে।

স্বাতির কথা আমি আর ভাবব না। তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার শেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। যে স্মৃতি জেগে আছে, তা তিক্ত নয়। অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে যে রক্ত ঝরে, তার যন্ত্রণাও যে মধুর।

কিন্তু তবু আমি দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাই নি। বার বার মনোরঞ্জনের কথা মনে পড়ছে। আবার মনে পড়ছে। এ সঙ্গীদের আমি দেখতে পাই নি, তারা আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীর ভাবে। আমি অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়েছিলুম। তারপর নেমে গিয়েছিলুম পাটনায়।

ভয় পেয়ে নামি নি, সঙ্গীদের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম আমাকে টেনে নামিয়েছিল শীলা, অনিমেষ দাঁড়িয়ে ছিল নীরবে; তাদের সঙ্গেই আমি প্রাচীন মগধ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।

গয়া থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু ফিরে যেতে পারলুম না। কাশী আমাকে টানে নি, মনোরঞ্জনও না। মনে হল যে হিমালয় আমাকে আহ্বান করছে। দেবতাত্মার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।

হিমালয়ের কথা আমি মামার কাছে শুনেছিলুম দিল্লীতে। তিনি বলেছিলেন: আজকের আনন্দ লোকে কাল ভুলে যায়, গভীর দুঃখও ভোলে মানুষ। তবে তার জন্যে সময় লাগে। কিন্তু হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন যে

জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। ভগবান কোথায়! কে দেখেছে ভগবান! হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! এখানে ত্যাগ কোথায়! প্রাণ ভরে এখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

এই নগাধিরাজ হিমালয় প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতকে মহা মহিমান্বিত করে আছে। কিন্তু আজও এই দেবতাত্মাকে ভাল করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ট্রেনে বা মোটরে চেপে কোন শৈলাবাসে গিয়ে তো দেবতাত্মাকে দেখা যায় না। তার জন্যে তপস্যার দরকার।

মামা বলেছিলেন: হিমালয় বড় খাম খেয়ালি। যারা ট্রেনে বা মোটরে চেপে পাহাড় দেখতে আসে, পাহাড় দেখেই তারা ফিরে যায়। হিমালয় তাদের কাছে ধরা দেয় না। যারা বন্ধুর দুর্গম পথে পায়ে হেঁটে চলে দিনের পর দিন, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে হয় না কাতর, হিমালয় তাদের কাছে প্রতিদিন ধরা দেয় নানা রূপে, নানা মায়ায় ভুলিয়ে তাদের দুর্গমতর পথে টেনে নিয়ে যায়, আত্মার সম্পর্ক হয় প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা যমুনার উৎস দেখবার পর আমিও হিমালয়কে ভালবেসেছিলুম। বাড়ি ফিরে আসার পরেও হিমালয় আমাকে টানত। মনে হত যে, একটা সুন্দর অজগর সাপ তার প্রবল নিঃশ্বাস দিয়ে আমাকে টানছে। রাক্ষসী হিমালয় তাড়কার মতো কুৎসিত নয়, উর্বশীর মতো মোহিনী।

মামার এই বিশেষণগুলি নিয়ে আমরা কোন সমালোচনা করি নি। যেভাবেই হোক, হিমালয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা বুঝেছিলুম যে তুষারমৌলি গিরি-শৃঙ্গেই হিমালয়ের সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ নেই, দুর্গম পথ যখন আদিম অরণ্যে আর বিস্তীর্ণ হিমবাহে যাবে হারিয়ে, হিমালয় প্রকাশিত হবে নূতনতর রূপে। সে রূপ কবে দেখতে পাব জানি নে। এবারে

সে সুযোগ নেই, কোনদিন সে সুযোগ আসবে কিনা তাও আজ জানি নে।

গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটছে। এই ট্রেন পাঠানকোট যাবে। পাঞ্জাবের উত্তর সীমায় অবস্থিত এই শহর থেকে লোকে কাঙ্গড়া ও কুলু উপত্যকায় যায়, যায় কাশ্মীরে। আমি মোগলসরাইয়ে নামব। রাত নটার পরে এই ট্রেন ধরেছি গয়ায়। মনোরঞ্জন এখন কাশীতে না হরিদ্বারে তা জানি নে। কাশীতে তার খোঁজ করে আমাকে হরিদ্বারে যেতে হবে। দেখা হবে কিনা জানি নে। শুধু প্রতিশ্রুতি রেখেছি এই সান্ত্বনা নিয়ে দেশে ফিরতে পারব। তারও তো মূল্য আছে, আনন্দও আছে। কিন্তু আমার স্বপ্নের বিধাতা কেন হাসলেন তা জানি নে।

২

পাটনায় শুনেছিলুম যে গয়ার পরে ডেহরি অন শোন বড় স্টেশন। শোন নদের এক ধারে শোন ঈস্ট ব্যাঙ্ক, অন্য ধারে ডেহরি অন শোন। কারখানার শহর ডালমিয়া নগর এইখানেই। কিন্তু তার জন্যে রেলের যাত্রীর কোন দুর্ভাবনা নেই। গাড়িতে বসেই এই বিরাট পুলটি পার হয়ে যায়। জানতেও পারে না যে এটি ভারতের দীর্ঘতম পুল, এমন লম্বা পুল পৃথিবীতে কম আছে। এই শোন নদ পাটনার উত্তরে গঙ্গায় মিলেছে। কোইলোয়ার নামে একটা স্টেশনেও তার উপরে একটা পুল আছে। কিন্তু সেটা তেমন বড় নয়। সাধারণ যাত্রীর নাকি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তবে একটা সুবিধা আছে এই পুলে। অন্যান্য যানবাহন এই পুলের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। ডেহরি অন শোনে সে সুবিধা নেই। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যে সমস্ত যানবাহন চলে তা মালগাড়িতে পারাপার করতে হয়। তার জন্যে অকারণে অনেক সময় নষ্ট হয়, অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন শৌখিন যাত্রীরা। তবে শোনা যাচ্ছে যে শীঘ্রই এ অসুবিধা দূর হবে। নদীর উপরে পথের যানবাহনের জন্য পুল তৈরির কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

এই নদীর পুল আমরা কখন পেরিয়েছি খেয়াল করি নি। পুলের উপরে লোহা লক্কড়ের প্রবল শব্দ হয় নি বলেই টের পাইনি। ডেহরি অন শোনে দাঁড়িয়েছি অল্পক্ষণের জন্য, তারপর আবার যাত্রা করেছি। এক সময়ে সসারামও ছেড়ে এসেছি, কিন্তু পথের উপরে শের শাহের কবর দেখতে পাইনি। অন্ধকারে সব কিছুই আবৃত ছিল।

শুনেছিলুম যে কর্মনাশা নদী হল বিহার ও উত্তর প্রদেশের সীমানা। পূর্বে বিহার আর পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ। অন্য ধারেও ঠিক এমনি। যে লাইন পাটনা থেকে আরা বক্সার হয়ে মোগলসরাই গেছে, সেদিকেও এই কর্মনাশা নদী দুই প্রদেশের মাঝখানে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীটিও কখন পেরিয়ে এসেছি জানতে পারিনি।

ট্রেনের কামরায় বসে বসে ঘুমতে পারি, এমন সাধনা আমার নেই। তাই নানা রকমের অদ্ভুত চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করে। কাশীতে মনোরঞ্জন কোথায় উঠেছে জানি নে। বোধহয় কোন ধর্মশালায় উঠেছে। কিন্তু যাঁদের কথা সে বলেছিল, তাঁরাও কি কাশীতেই গেছেন! মামা হলে নিশ্চয়ই আমাকে ডেকে নিতেন। স্বাতিই নেমে আসত আমাকে ডাকবার জন্যে।

দক্ষিণ ভারতে যাবার সময় হাওড়া স্টেশনে দেখতে পেয়েই মামা আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন। পরের বার জয়পুর থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। নানা দুর্ভাবনা নিয়ে আমি ছুটে গিয়েছিলুম, তারপরে জেনেছিলুম যে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে আমাকে তাঁদের সঙ্গী হতে হবে। এই প্রয়োজন যে নিতান্তই আন্তরিক, তা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি।

এর আগেও একবার মামা আমাকে দিল্লী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমার কাছে তাঁর গল্প শুনে কালিন্দী যমুনার নামেই ভয় জন্মেছিল। সে গল্প আমি ভুলি নি। ভোলা সম্ভব নয়।

মামা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অনুগ্রহ আমি গ্রহণ করব না। স্বাতি যে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন না। আর এ কথাও জানতেন না যে কারও অনুগ্রহেই আমার লোভ নেই। তাঁর ধারণা যে লোভ গরিবেরই, অভাব

মানুষকে লোভী করে। তাঁর নিজের প্রচুর আছে বলেই তিনি এই রকম ভাবেন। যদি কম থাকত, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারতেন যে অভাবে লোভ বাড়ে না, লোভ বাড়ে পেয়ে পেয়ে। যে যত পায়, সে তত চায়। গরিব ভিখারী ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এক টাকার জন্য কারও পকেটে হাত দেয় না, একটা পয়সার জন্য হাত পেতে সারাদিন বসে থাকে। যার পকেটে টাকা আছে, সেই অন্যের পকেটে হাত দেয়, সিঁধ কাটে পরের ঘরে। ভিখারীর ধর্মজ্ঞান আছে, আত্মসম্মান আছে গরিবের। সংসারের দুঃখ দারিদ্র্যকে তারা দেখে বৈরাগীর চোখে।

এই সত্যটুকু জানা থাকলে মামা আমাকে জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন না। স্বাতি আমাকে চিনেছিল, তাই সে বিশ্বাস করে নি যে আমি সম্মত হব। সম্মত হয়েছি শুনে অন্তরে আঘাত পেয়েছিল, শ্রদ্ধা হারিয়েছিল মানুষের উপর। এলাহাবাদের সমস্ত ঘটনা তাকে অকপটে শুনিয়েও তার মন ফিরে পাই নি। একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সে লোক যেন মরে গেছে। সাবিত্রীর মতো সেই মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারের সাধনা করতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনেক দুঃখে সে বুঝেছে যে তার সত্যবানের দেহে আর রক্তমাংস নেই, শুধু একটা শুকনো কঙ্কাল মাত্র পড়ে আছে। তাতে প্রাণ সঞ্চার হলে সে নিজেই সারাক্ষণ ভয় পাবে। আমিও বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে বৈষয়িক জগতে লাভ করতে গিয়ে স্বাতিকে আমি চিরদিনের মতো হারিয়েছি। স্বেচ্ছায় সে তার মন আমার কাছে বাঁধা রেখেছিল।

দিল্লী থেকে ফেরার পথে এলাহাবাদে আমি আর নামি নি। ভয় না বেদনায় তা বলতে পারব না। ভয়ও হয়েছিল। মামা বলেছিলেন, যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা ও যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে। তাই তার বংশ রক্ষা হচ্ছে না। গোটা

কয়েক ছেলেমেয়ে জন্মেই মারা গেল, সন্তানই হল না দ্বিতীয় পক্ষের। ভাই-এর ছেলে পোষ্য নিল, সে বাঁচল না। উপযুক্ত সংসারী ছেলে আনল বোনের কাছে চেয়ে; অসুখ নেই, বিসুখ নেই, টুপ করে একদিন মরে গেল। এবারে তোমাকে ডেকেছে।

কাজেই আমারও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে আছে।

না না, ভয় নয়। ভয়ের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। দিল্লী ছাড়বার আগে স্বাতি যেন কী বলেছিল। তাতেই আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলুম। তা না হলে এলাহাবাদের টিকিট কেটেও তো সেখানে নামলুম না। ভয় পেলে নিশ্চয়ই এলাহাবাদের টিকিট কাটতুম না। সেখানে নামলে জীবনটা আমার বদলে যেত। শুধু অর্ধেক রাজত্ব নয়, রাজকন্যারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

রাজকন্যার কথায় রাণা ও মিত্রার কথা মনে পড়ে। ভারত সরকারের পুরনো আই সি এস ব্যানার্জি সাহেবের পুত্র কন্যা তারা। সেক্রেটারিয়েটে রাণাও অফিসার হয়ে ঢুকেছে, কিন্তু ভাল ছেলে বলে তার বদনাম আছে। এই রাণার সঙ্গে স্বাতির বিবাহের সম্বন্ধ করছিলেন মামী, রাজস্থান ভ্রমণের সঙ্গী হবার অনুরোধ করেছিলেন। আবু পাহাড়ে রাণার আসবার কথা ছিল, কিন্তু সে আসে নি। নিশ্চয়ই সে তার পিতার অনুমতি পায় নি। এই পিতৃভক্তির প্রশংসা যে যুগে ছিল, সে যুগ আজ গত হয়েছে। এখন স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। ছেলেমেয়ে বড় হতে না হতেই পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করে, ভাবে যে তাদের জন্মের জন্য যারা দায়ী তাদের লালনের নৈতিক দায়িত্ব সেই পিতামাতার। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে স্বাধীন মতবাদ পোষণ করে, অস্বীকার করে তাদের স্বাধীনতায় অন্যের হস্তক্ষেপের অধিকার। ভাল না লাগে তো চুপ করে থাক, খারাপ লাগে তো পাঠিয়ে দাও বোর্ডিঙে, খরচ বন্ধ করার আগে নিজেদের পরিণামের কথা ভাব।

তবু দেখা যায় যে রাণার মতো ছেলে আজও আছে। এ

যুগের সমাজ তাদের গাধা বলে। বাপকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখালে নিশ্চয়ই তা বলবে না। তখন এই সমাজই তার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করবে।

কিন্তু মিত্রা অন্য উপাদানে গড়া। তার চরিত্রের দৃঢ়তা পাঞ্জাবী ছেলে চাওলাকেও মুগ্ধ করেছে। চাওলা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাকে প্রথম দিন থেকেই পুরনো মনে হয়েছে। তার সঙ্গে যে এক দিনের পরিচয় নয়, পরিচয় যে জন্মান্তরের—এই কথাই মনে হয়েছে তার কথায় ও ব্যবহারে। সে আমার কাছে অকপটে স্বীকার করেছিল যে মিত্রাকে সে ভালবাসে। কিন্তু মিত্রার ধারণা অন্য রকম। সে নাকি ভাবে যে ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে ভালবেসেও কুমারী থাকা চলে। চাওলা বলে, না, আমি যাকে ভালবাসব তাকে চাই আমার সমস্ত অধিকারের মধ্যে। দুনিয়ার আর কেউ তার ওপর দাবী রাখতে পারবে না।

আমি স্বীকার করেছিলুম যে এরই নাম পুরুষের ভালবাসা। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ভালবাসাকেই আমরা শ্রদ্ধা করে আসছি।

দুঃখ করে চাওলা বলেছিল, যে শ্রদ্ধা করলে আমার জীবনটা সার্থক হত, সে তো এ কথা মানে না।

কিন্তু স্বাতি এসব কথা আমাকে কোনদিন বলেনি। অথচ তার একটি কথায় আমার জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা ওলোট পালোট হয়ে গেল। দিল্লীতে মামা মামী ও স্বাতি আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন। মামা মামীকে প্রণামটা আমি সেরে নিলুম। স্বাতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গিয়ে বললুম: তুমি কিছু বলবে না?

স্বাতি হাসল।

হাসি নয় স্বাতি, তোমার কি কিছুই বলবার নেই? কিছু জানবার, কিছু শোনবার—

এর উত্তরেও স্বাতি হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি।

আমি তার মুখের দিকে চাইলুম।

অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে স্বাতি জবাব দিল: গোপালদা, তোমার মন কি কোন কথা দেয় নি আমার কাছে যে আজ মুখের কথা শোনবার প্রয়োজন হবে!

কী আশ্চর্য! স্বাতি কি আমার মনটাও দেখতে পাচ্ছে! না নিজের মনের ছায়া দেখছে আমার মনের আয়নায়!

এলাহাবাদে নামা আমার হল না। স্টেশন থেকে ছেড়ে ট্রেন কালিন্দীর পুলে উঠল। তারপর শব্দের তরঙ্গ হল শেষ। কঠিন মাটিতে আবার নেমে এলুম।

আমার মন কি সত্যিই স্বাতিকে কোন কথা দিয়েছে!

৩

রাত প্রায় একটার সময় মোগলসরাই জংশনে এসে নামলুম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল বলেই নেমে পড়লুম। তা না হলে আর এক ঘণ্টা কষ্ট করলেই বারাণসীতে পৌঁছতে পারতুম। বারাণসী স্টেশনের উপর তলায় ডর্মিটরি আছে শুনেছি। একটা ঘরে অনেকগুলি খাট পাশাপাশি সাজানো, বিছানাপত্রও পাওয়া যায়। অথচ ভাড়া সামান্য। এর চেয়ে আরামদায়ক ব্যবস্থা গরিবের কাছে স্বপ্নের সামিল। কিন্তু আরও এক ঘণ্টা জেগে কাটানো আমার কাছে দুঃসহ মনে হচ্ছিল। তাইতেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম।

কিন্তু নেমে পড়বার পরে নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে স্টেশনে রাত কাটানো একটা সমস্যার ব্যাপার। আপার ক্লাস যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম আছে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং হল। এই হলে আশ্রয় নিয়ে রোদ ও বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যারা অভ্যস্ত তারা অপরিচ্ছন্ন মেঝেয় গামছা বিছিয়ে ঘুমোতেও পারে। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীরা তা পারে না। ভালো বসবার জায়গা থাকলে আমি বসেই রাত কাটাতে পারি।

ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখে আমি প্ল্যাটফর্মের একখানা বেঞ্চির একটা কোণ অধিকার করে বসলুম। বেঞ্চে হেলান দিয়ে কোন রকমে আমাকে একটা রাত কাটাতে হবে। ঝোলাটা কোলে রাখলুম, কম্বলখানা দিলুম পিঠে। দেহটা এলিয়ে দিতেই আরাম বোধ হল।

সারা রাত ট্রেনের শব্দ পেয়েছি, কিন্তু তাতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় নি। চোখ বুঁজে আমি শুয়ে ছিলুম। ক্রমে ক্রমে অনেকখানি জায়গা অধিকার করে বেশ খানিকটা ঘুমিয়েও নিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল, আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নি, বিদ্যুতের আলোতেই সব পরিষ্কার দেখাচ্ছে। আমি আর দেরি করলুম না। স্টেশনেই মুখ হাত ধুয়ে সারা দিনের জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম। গরম চা খেলুম স্টেশনের স্টলে। তারপরে বাইরে এলুম।

ওভার ব্রিজের উপর থেকে যখন নিচে নামছি, প্রভাতের প্রথম আলোয় পৃথিবী তখন হাসছে। পুলের ঠিক নিচেই কয়েকখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, আর সাইকেল রিক্সাগুলি অপেক্ষা করছে খানিকটা তফাতে। বাঁ হাতে একটা লম্বা পুকুর, তার একধারে স্টেশন এলাকা, অন্য ধারে রেল কলোনি। ডান হাতে বুকিং অফিস ওয়েটিং হল প্রভৃতি রেলেরই ঘর বাড়ি। আমি শুনেছিলুম যে এইখান থেকেই বারাণসীর বাস ছাড়ে, কিন্তু বাস একখানাও দেখতে পেলুম না।

ভাল করে সবকিছু দেখবার চেষ্টা করতেই অন্য একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। জনকয়েক ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন ছোট খাট গোছের ভদ্রলোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আর একজন মহিলা তাঁর বিপুল বপু নিয়ে ভদ্রলোককে আগলাচ্ছেন। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলুম যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররাই বোধহয় ভদ্রলোককে আক্রমণ করেছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম যে আক্রমণটা ভদ্রলোকই চালাচ্ছেন। চীৎকার করে হিন্দীতে বলছেন: এ কি মগের মুলুক নাকি যে নতুন মানুষ দেখে গলায় ছুরি দেবে!

সিঁড়ির উপরেই আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। বুঝতে পারলুম যে ট্যাক্সি নিয়ে দরাদরি হচ্ছে। তাদের মধ্যেই একজন ধীর স্থির লোক খুবই বিনয় সহকারে বলল: দূরত্বটাও একবার ভেবে দেখুন। যাতায়াতে একশো মাইলেরও বেশি হবে। পঞ্চাশ টাকা আমরা বেশি বলিনি।

আর একজন বলল : অত কথার দরকার কী! আট আনা মাইল রেট আছে, মিটারে যত মাইল উঠবে তাই দেখেই পয়সা দেবেন।

চল্লিশ টাকার বেশি এক পয়সাও দেব না। চলে এসো।

বলে গৃহিণীকে সেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যূহ ভেঙ্গে গেল এবং ড্রাইভারেরা যে যার গাড়িতে ফিরে চলে গেল।

আমি আর দেরি না করে বাকি কয়েকটা সিঁড়ি নেমে পড়লুম। তারপরেই শুনতে পেলুম ভদ্রমহিলার কথা। চাপা গলায় তিনি বাংলায় বললেন, চল্লিশ টাকায় যাবে না, আর কিছু বাড়াও।

ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে বললেন: তোমার জন্যেই এই ঝামেলা। আগে থেকে বললে ভোর বেলার প্যাসেঞ্জারেই চড়ে পড়তুম। এই হতভাগাদের পাল্লায় তাহলে পড়তে হত না।

আমি তাঁদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলুম : বাস কোথা থেকে ছাড়ে?

ভদ্রলোক কটমট করে তাকালেন আমার দিকে, জিজ্ঞাসা করলেন : আপনিও কি বিন্ধ্যাচল যাবেন নাকি?

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : দশ টাকা খরচ করবেন?

মাথা নেড়ে বললুম : না।

পাঁচ টাকা?

আমার কী মনে হয়েছিল জানি নে, বোধহয় কতকটা কৌতুক দেখবার জন্যেই বললুম : তা করতে পারি।

আশান্বিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন : কি হে যাবে পঁয়তাল্লিশ টাকায়?

কিন্তু উত্তর কেউই দিল না।

ভদ্রলোকের মালপত্র মাটিতে নামিয়ে একজন কুলি অপেক্ষা করছিল। সে বলল: পঞ্চাশ টাকার কমে কেউ যাবে না বাবু।

শান্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: সে কথাও যে কেউ এখন আর বলছে না।

কুলিই সব সমস্যার সমাধান করে দিল, বলল: আও ভাই।

ড্রাইভারদের মধ্যে একজন এগিয়ে এল।

ভদ্রলোক বললেন: ভাল করে সব দেখাবে তো? বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী, অষ্টভুজা, আর ফেরার পথে চুনার ফোর্ট।

কুলি ততক্ষণে একটা ট্যাক্সির পিছনের ঢাকা খুলে ফেলেছে। ড্রাইভারের সম্মতি পেতেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি উঠে পড়ুন সামনে। আপনার মালপত্র? কাঁধের কম্বল ও হাতের ঝোলাটা দেখিয়ে বললুম, আর কিছু নেই।

পিছন থেকে ভদ্রমহিলা বললেন: নিজের মাল পত্র দেখ। সব ওঠে নি বলে পরে যেন হায় হায় করো না।

বলে উনি নিজে গেলেন গাড়ির দিকে এগিয়ে।

ড্রাইভার দরজা খুলে ধরেছিল। ভদ্রমহিলা আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে উঠে বসলেন। ভদ্রলোক উঠলেন কুলির পয়সা মিটিয়ে। আমি গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলুম।

ট্যাক্সি যখন ছাড়ল, তখনও সকাল সাতটা বাজে নি। দুধারে পথের উপরে সকালের সোনালি রোদ সুন্দর দেখাচ্ছে। অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় মন আমার ভরে গেল।

৪

দুর্বল মুহূর্তে নিজের জীবনের কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। বিন্ধ্যাচলের পথে আমারও নিজের কথা মনে পড়ল। আমি কাশী যাব বলে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু এখন চলেছি বিন্ধ্যাচলের দিকে। যাঁদের সঙ্গে যাচ্ছি, তাঁদের আমি চিনিনে। এই দম্পতির সঙ্গে আমাব পরিচয় যে কোন দিন অন্তরঙ্গ হবে না, তাও জানি। অত্যন্ত আকস্মিক এই যোগাযোগ। কতকটা অবিশ্বাস্যও বটে। এই অবিশ্বাসেব কথা মনে হতেই আমি পিছন ফিরে তাকালুম। না, ঘটনাটা সত্য। দুজনে দুপাশে বসে আছেন গম্ভীর ভাবে, কথা নেই কারও মুখে। সেই ছোট খাট ক্ষীণজীবী ভদ্রলোকের মুখ অপ্রসন্ন, কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বসে আছেন। সহসা আমার একটি নৌকোর কথা মনে পড়ল। সেই নৌকোয় মাঝি আছে, কিন্তু তার হাতে হাল নেই। নৌকো তাই সামনের দিকে এগোচ্ছে না, স্রোতের ধাক্কায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে ইতস্তত। এই নৌকোর কথা কেন মনে এল তাই ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের কথাই আবার মনে পড়ল। আমার নিজের জীবনটাই বুঝি একটা নৌকো, শক্ত মুঠিতে হাল ধরে তাকে আমি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছি। স্টেশনের ওভার ব্রিজের নিচে ট্যাক্সি ও রিক্সর স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে সোজা রাস্তায় খানিকটা এগোলেই বাস স্ট্যাণ্ড। উত্তর প্রদেশ সরকারের অনেকগুলো বাস সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বারাণসী ও মোগলসরাই-এর মাঝে নাকি চব্বিশ ঘণ্টা বাস চলাচল করে।

কোন বাস বারাণসীর কাছারি যায়, কোন বাস যায় গোধুলিয়া। এঁ ছাড়া গ্রামান্তরে যাবার বাসও আছে। দশ পনর মিনিট পরে পরেই বাস ছাড়ে। বারাণসীর বাসিন্দারা ট্রেনে চেপে বোধ হয় যায় না, যায় বাসে। মোগল সরাই-এ নেমে তারা এই বাস স্ট্যাণ্ডে ছুটে আসে। একজনের কাছে শুনেছি যে বারাণসীর বুদ্ধিমান বাসিন্দা পাঞ্জাব মেল থেকে নেমে এসেও বাস ধরে। তাতে নাকি আগে পৌছানো যায় বাড়িতে।

এই বাস স্ট্যাণ্ডের পাশেই একটি সংকীর্ণ দরজা। এ ধারে রেল কলোনি আর ওধারে বাজার। সমস্ত যানবাহন এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে সারাক্ষণ যাতায়াত করছে। আমরাও এই পথে বেরিয়ে এসে সোজা রাস্তা ধরেছিলুম। দোকানপাট তখনও খোলে নি, মানুষের ভিড় ছিল না পথে। নির্জন প্রশস্ত পথ ধরে ড্রাইভার ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়েছিল।

মাইল পাঁচেক দূরে পড়াও নামে একটি গ্রাম এ-পথের একটি বড় জংসন স্টেশন। সমস্ত বাস এখানে দাঁড়ায়। রিক্স দাঁড়িয়ে থাকে খানকয়েক। এখান থেকে পথ ক্রমাগত উঁচু হয়ে গঙ্গার পুলের উপরে উঠেছে। এখান থেকেই পথ বেরিয়েছে এলাহাবাদ হয়ে দিল্লী যাবার। এই পথের উপরেই চুনার মির্জাপুর ও বিন্ধ্যাচল। বারাণসী থেকে ব্যাস কাশী আসতে হয় এই পথে। কাজেই এই জায়গাটি সারাক্ষণ যানবাহনের শব্দে মুখর হয়ে থাকে।

এই পড়াও-এ পৌছে আমরা বাম হাতেব পথ ধরেছিলুম। দুতিন মাইল এগিয়ে রামনগর শহর। গঙ্গার এপারে রামনগর, ওপারে বারাণসী। রামনগরের রাজাদের কথা ইতিহাসে পড়েছিলুম। কিন্তু সহসা সেকথা আমার মনে পড়ল না। পিছনে কথোপকথন শুনে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম।

ভদ্রমহিলাই প্রথমে কথা কইলেন, বললেন: সব জায়গাতেই তুমি ঠকো।

ভদ্রলোক তখুনি জবাব দিলেন : প্রথম ঠকেছি ছাব্বিশ বছর আগে।

এটি যে পুরনো কথা তা বুঝতে পারলুম মহিলার উত্তর শুনে। তিনি বললেন : জীবনে ঐ একবারই জিতেছিলে।

আমি এঁদের বয়স দেখে অনুমান করেছি যে ছাব্বিশ বছর আগে তাঁদের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু কে ঠকেছেন আর জিতেছেন কে, তা অনুমান করতে পারি নি। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কথার উত্তর দেন নি, কিন্তু সেই মহিলা নীরবে থাকতে পারলেন না। বললেন : নিজের ব্যবসা যে কেমন দেখ তা বুঝতেই পারছি।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন : এবার থেকে তুমিই দেখো। দেখতেই হবে।

বলে ভদ্রমহিলা থামলেন। আড় চোখে আমি দেখলুম যে এখন আর তিনি কথা কইতে পারবেন না। পানের বাটা থেকে গোটা কয়েক পান তিনি মুখে পুরেছেন। মুখ বুঁজে এখন তাঁকে পান সামলাতে হবে।

সোনার মতো সকালের রোদে উত্তাপ একটুও নেই, বাতাস স্নিগ্ধ ও শীতল। নিঃশব্দে পথ চলতেই বেশি ভাল লাগছে। এক সময়ে অহরোরা নামে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম আমরা অতিক্রম করে গেলুম। এর পরে চুনার। মাইলের হিসাব রাখা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝে মাঝে মাইল স্টোনের উপরে অনেক কিছু লেখা আছে, কিন্তু বেগে চলবার জন্যে ভাল করে তা পড়া যাচ্ছে না। মনে হয় মোগলসরাই থেকে চুনারের দূরত্ব হবে মাইল পঁচিশেক, কিংবা [illegible] কম বেশি। মোগলসরাই থেকে মির্জাপুরের মাঝে [illegible] মির্জাপুর ছাড়িয়ে।

[illegible]গাটি চিনতে আমার ভুল হয় নি। একটি ছোট [illegible] দুর্গ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপরে [illegible]দিয়ে যাবার সময় নামটা পড়তে পেরেছিলুম। চুনার

স্টেশন এখন নাকি আগের চেয়ে বড় হয়েছে। জংসন হয়েছে একটা নতুন লাইনের জন্য। রবার্টস্‌গক পর্যন্ত একটা শাখা লাইন কয়েক বছর আগে নির্মিত হয়েছে।

চুনার দুর্গ আমাদের পথের পাশে পড়ল না। পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটিও দেখতে পেলুম না। বিন্ধ্যাচল পৌঁছবার আগে আমাদের গাড়ি আর কোথাও থামবে না।

বিন্ধ্যাচলের কথায় বিন্ধ্য পর্বতের কথা এসে পড়ে। অচল মানে পর্বত। তাই বিন্ধ্যাচল মানে বিন্ধ্যপর্বত কিনা সেই কথাটিই আগে জানা দবকার। ভূগোলের কথা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ঘরের বাহিরে যাঁরা ঘুরে বেড়ান তাঁদের কাছে এ প্রসঙ্গ অবান্তর। বোম্বাই-এর পথে তাঁরা বিন্ধ্যপর্বত দেখেছেন। রাজস্থানের আরাবল্লী পাহাড়ের দক্ষিণে তাঁরা মধ্যভারতের বিন্ধ্যপর্বত দেখেছেন, নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মধ্যে সাতপুরা পাহাড়ও তাঁদের অদেখা নেই। সাতপুরা পাহাড় পূর্বদিকে মহাদেব ও মহাকাল পর্বত নামে বিস্তৃত। এরই উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত ভানবের ও কাইমুর পর্বত নামে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আরাবল্লী পাহাড়ে অবস্থিত রাজস্থানের উদয়পুর বিন্ধ্যপর্বতস্থিত মধ্য প্রদেশের ইন্দোরের সঙ্গে পার্বত্য পথে সংযুক্ত। বিন্ধ্য ও সাতপুরার মধ্যে প্রবাহিত নর্মদা নদী, মহাকাল পর্বতে তার উৎসস্থল বিন্ধ্যের সঙ্গে ভিন্ন নয়। এই পার্বত্য [illegible] শোন নদের জন্ম। শোন কাইমুর পর্বত শ্রেণীর মধ্যে [illegible] গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। ছোট নাগপুরের পাহাড় [illegible] না সাতপুরার, মানচিত্র দেখে তা বুঝবার উপা[illegible] বিন্ধ্যাচলে আমরা যাচ্ছি, তা বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাংশে [illegible] শ্রেণীতে অবস্থিত একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। বিন্ধ্যাচ[illegible] বিন্ধ্যপর্বত বুঝি না, কিন্তু বিন্ধ্যাচল যে পাহাড়ের [illegible] তাকে বিন্ধ্যপর্বত বললে ভুল হবে না।

সরল সমতল পথেই আমরা মির্জাপুর পৌঁছে গে[illegible]

জেলার প্রধান শহর এটি। বাজারের মধ্য দিয়েই পথ। এক জায়গায় রেলের স্টেশনটিও দেখতে পেলুম। অল্প খানিকটা দূরে স্টেশন, রেললাইনও পার হতে হয়েছিল একাধিক বার। শহরটা কত বড় তা দেখবার সুযোগ আমাদের ছিল না, ড্রাইভারের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ। আমি চাইলেও আমার সহযাত্রীরা রাজী হবেন না।

মির্জাপুরের নামে মির্জাপুরের কার্পেটের কথাই আমার মনে আসে। এই শহর ও আশে পাশে ভাল কার্পেট বোনা হয়। সমগ্র উত্তর ভারতে এই অঞ্চলেরই কার্পেট বিক্রি হয়। এলাহাবাদে জ্ঞানশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমি এই কার্পেট দেখেছি নানা ঘরে। নানা আকারের ও নানা ধরনের নক্সা দেখেছি। ভেবেছিলুম যে পথের ধারেই হয়তো কার্পেটের দোকান বা তাঁত দেখতে পাব। কিন্তু হতাশ হতে হল। যে রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে গেলুম তার আশে পাশে কিছুই দেখতে পেলুম না।

এক সময় আমরা শহর ছাড়িয়ে বিন্ধ্যাচলের পথ ধরলুম। বিন্ধ্যাচলে যাবার দুটি পথ আছে বলে মনে হল। একটা প্রশস্ত পথ সোজা গেছে, আর একটা পথ গেছে একটু ঘুরে, তার ধারে ধারে ঘরবাড়িগুলি বিন্ধ্যাচলকে যুক্ত করে রেখেছে মির্জাপুরের সঙ্গে। ভোর বেলায় যে ট্রেনটি ছেড়েছিল সেই ট্রেনটিও আমরা দেখতে পেলুম, মির্জাপুর ছেড়ে বিন্ধ্যাচলের দিকে ছুটেছে। এই ট্রেনের জন্যেই লেভেল ক্রসিং-এ আমাদের খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হল।

বিন্ধ্যাচল স্টেশনের কাছে আমরা যাই নি, স্টেশনটি দেখতেও পাই নি। শহরের প্রধান রাস্তার ধারেই আমাদের গাড়ি একজায়গায় থামল। অন্য ধার থেকে আর একটি পথ এসে এইখানে মিলেছে। ড্রাইভার বলল যে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দর্শনে আমাদের এইখানেই নামতে হবে।

কিন্তু পথের উপরে কোন মন্দির নেই। গাড়ি থেকে নেমে চারি ধারটা চেয়ে দেখবার আগেই এক তরুণ ব্রাহ্মণ আমাদের সামনে

এসে দাঁড়াল। বলল : মন্দিরের দরজা পর্যন্ত গাড়ি যায় না, অল্প একটুখানি পথ আমাদের হাঁটতে হবে।

বুঝতে কষ্ট হল না যে পথ আর সমতল নয়, ছোট একটি পাহাড়ের উপর মন্দির। সংকীর্ণ গলি এঁকে বেঁকে উপরে উঠেছে। ব্রাহ্মণ বলল, মন্দিরে উঠবার আরও একটি পথ আছে। সে পথও এমনি।

আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় তখনও হয় নি। বরাবরই তিনি একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। এইবারে বলে উঠলেন : পড়েছেন তো খপ্পরে! গলায় ছুরি দেবে পরে।

ব্রাহ্মণ কী বুঝল জানি নে, মুখ ফিরিয়ে শুধু হাসল।

সরু পথ ধরে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। এক সময় মনে হল যে ঘর বাড়ির ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি—দরজা পেরিয়ে উঠোনের মাঝখান দিয়েই। তারপরে একটা রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। তার দুধারে দোকান পাট লোকজনের কলরবে মুখর। মিষ্টির দোকান, পাথর ও পূজার উপকরণের দোকান। তেল দিয়ে পাকানো বড় বড় লাঙ্গল লাঠিও বিক্রি হচ্ছে। এই সব পথ অতিক্রম করবার সময় একটি কথা মনে আসে। ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থেরই রূপ কতকটা এক রকম। বড় বড় মন্দিরে প্রবেশের পথ এই রকম সংকীর্ণ। যাত্রীর ঠেলাঠেলি আর কোলাহল। তারই মধ্যে দুধারের দোকান পাটে স্বচ্ছন্দে কেনাবেচা চলেছে।

যাত্রীর ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে হতে আমি বললুম : রোজই এই রকম ভিড় হয়?

সবিনয়ে ব্রাহ্মণ বলল : না। আজ পূর্ণিমার জন্যে যাত্রী বেশি।

ডানদিকে ফিরেই মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। ছোট প্রাঙ্গণটি আজ লোকে লোকারণ্য।

পূজার জন্য ফুল নৈবেদ্য ক্রয়ের কথা ব্রাহ্মণ আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

আমি বলেছিলুম যে তার দরকার নেই। সকাল বেলায় জলযোগ করে বেরিয়েছি।

তাই ভক্তি দিয়েই আজ বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা হোক।

পিছন ফিরে, আমি আর সহযাত্রী ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম না। বুঝতে পারলুম যে গৃহিণীর জন্য তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। বিপুল বপু নিয়ে সেই মহিলার চড়াই পথ উঠতে কষ্ট হচ্ছে। ব্রাহ্মণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা কববে কি না বোধহয় সেই কথা ভাবছিল। আমি তাকে বললুম ঃ চল।

আর একজন ব্রাহ্মণকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সে মন্দিরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সামনের দরজাটি প্রবেশের পথ নয়। এই পথে যাত্রীরা দেবী দর্শন করে বের হচ্ছে। অন্য ধারের একটি সংকীর্ণ দরজা দিয়ে আমাদের ঢুকতে হবে। যাত্রীরা তার জন্যে লাইন দিয়েছে। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কেউ নেই, অস্থির ভাবে ভিতরে ঢোকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দরজা দিয়ে দুজন করে বোধহয় পাশাপাশি ঢুকতে পারে, তাই দুটি লাইন হয়েছে। ব্রাহ্মণ আমাকে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে বলল। কিন্তু দাঁড়ানো কি সহজ কথা! পাশ থেকে চাপ আসছে, সামনে থেকেও চাপ। দেখতে দেখতে পিছন থেকেও চাপ পড়তে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই মনে হল যে জলের উপর আমি দুলছি, নিজে থেকে নড়বার ক্ষমতা আর আমার নেই। ব্রাহ্মণের দিকে নজর পড়তেই দেখলুম যে সে বেচারা আমাকে রক্ষা করবার জন্য যেন যুদ্ধ করছে। তার একটি হাত দেওয়ালের গায়ে, আর দ্বিতীয় হাত দিয়ে সে ভিড় সামলাচ্ছে। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে জবাফুলের মতো, সে যুদ্ধ করছে অসহায়ের মতো। এবং তারই চেষ্টায় আমাকে কেউ পিষে ফেলতে পারছে না। সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি এই দেখে যে এক পা'ও আমরা এগোতে পারছি না। মনে হল যে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছেন যে যাত্রীরা তাঁরা বোধহয়

সমবেত ভাবে পূজো দিচ্ছেন। তাঁরা বেরোলে আরও একদল ঢুকবে, তখন বোধহয় আমরা দরজার কাছে পৌঁছতে পারব। বড় করুণ বড় বিপন্ন অবস্থা। ব্রাহ্মণের অবস্থা আরও করুণ। নিজের চেয়ে তার জন্যেই আমার দুঃখ হল বেশি, বললুম: দেবী দর্শনের আমার দরকার নেই।

আমার বাঙলা কথা সে অন্য রকম বুঝল, বলল: দর্শন কিজিয়ে গা! তব্ আইয়ে।

বলে আমার হাত ধরে এক কথায় আমাকে ভিড়ের ভিতর থেকে বার করে আনল। খানিকটা নিঃশ্বাস নিতে পেরে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

তারপরে সে আমাকে সামনের দরজার কাছে নিয়ে এল। চৌকাঠের ভিতরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ধাক্কা দিল বেপরোয়া ভাবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ঠেলে দিল ভিতরে।

দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে আমি দেখলুম। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, ভিড়ের চাপেই ছিটকে এলুম বেরিয়ে।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল: দর্শন হয়েছে?

পরম পরিতৃপ্তিতে বললুম: হয়েছে।

এরই নাম দেবদর্শন। এরই জন্যে যাত্রীদের এই কৃচ্ছ্রসাধন। এ কোন নূতন অভিজ্ঞতা নয়, সমস্ত তীর্থেই এই রকম। তবে সাধারণ দিনে আমরা স্বচ্ছন্দে দেখি, আর বিশেষ তিথিতে দেখি এই রকম করে। যত বড় তীর্থ, তত কষ্ট বেশি। যত পবিত্র তিথি বা যোগ, তত অসহায় অবস্থা। শিবরাত্রির দিন তারকেশ্বরে বা বৈদ্যনাথে, প্রয়াগ বা হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়, পুরীর রথযাত্রায় আমরা আতঙ্কে অজ্ঞান হই। সারা বছর আমরা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিনে, তাই আমাদের এই দুরবস্থা। খ্রীষ্টানরা প্রতি রবিবারে গির্জায় যায়। মুসলমানরা মসজিদে যায় প্রতি শুক্রবারে। উৎসবের দিনে খোলা ময়দানে তারা নমাজ পড়ে। হিন্দুদের মতো একদিনে তারা পুণ্যসঞ্চয় করে না।

আর কী দেখবার আছে ভেবে চারি দিকে দৃক্‌পাত করতেই আমি আমার সহযাত্রী দম্পতিকে দেখতে পেলুম। তাঁরাও এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। মহিলার হাতে ফুল নৈবেদ্য। তিনি সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বকাবকি করছিলেন এক ব্রাহ্মণকে : কী অসভ্য ব্যবস্থা! মহিলাদের সম্মান রাখতে জানে না! কোন ভদ্রলোক এখানে দাঁড়াতে পারে! উহু হু হু!

পাশের যাত্রীর কনুইএর গুঁতো খেয়ে ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠলেন।

আমি দেখলুম যে আমাকে এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে। তাই ব্রাহ্মণকে বললুম : গঙ্গা কত দূরে?

খুব কাছে।

বলে ব্রাহ্মণ বাঁ হাতের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

সংকীর্ণ পথ উঁচু থেকে নিচে নেমে গেছে। বাঁধানো পথের উপরে জল দেখেই বুঝতে পারছিলুম যে গঙ্গা খুবই নিকটে, স্নান করে যাত্রীরা এই পথেই আসছে মন্দিরে। ফুল নৈবেদ্যর দোকানও আছে পথের পাশে। অল্পক্ষণেই আমরা গঙ্গার ধারে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু গঙ্গা বইছে অনেক নিচে দিয়ে। ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি নামলে জলের কাছে পৌঁছনো যায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা কোন পুরাতন পরিত্যক্ত অট্টালিকার সঙ্গে সংলগ্ন বাঁধানো ঘাট।

গঙ্গার ধারা এখানে প্রশস্ত নয়, রূপালি বালির বুকের উপর দিয়ে মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে। দুদিন আগে পাটনায় গঙ্গার অন্য রূপ দেখেছি। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার বুক জলভারে সেখানে ফুলে আছে। এই গঙ্গাকে সেই গঙ্গা বলে বিশ্বাস হয় না। গঙ্গার সঙ্গে যমুনা মিলেছে এলাহাবাদের কাছে প্রয়াগে, তারপরে বিন্ধ্যাচল। বারাণসী আরও পরে। উত্তর থেকে ঘর্ঘরা এসে মিলেছে। দক্ষিণ

থেকে মিলেছে শোন। তারপরে পাটনা। আর এই খানেই গণ্ডক এসে মিলেছে গঙ্গার সঙ্গে। বিচিত্র তার রূপ। গম্ভীর সুন্দর।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি গঙ্গার শোভা দেখলুম, দেখলুম অগণিত যাত্রীর স্নানের দৃশ্য। নিচের মানুষগুলিকে উপর থেকে শিশুর মতো দেখাচ্ছে। গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ঘাটে দাঁড়িয়ে ফল্গু নদীও ঠিক এমনই দেখেছি। অসংখ্য সিঁড়ি নামলে ফল্গুর শুকনো বুক। এখানে জল আছে। নিচে থেকে নিশ্চয় মনে হবে যে পাহাড়ের উপরে এই ঘাট।

দেখবার আব কিছু বোধ হয় নেই। পুবনো পথ ধবে আমি ফিরে এলুম।



ট্যাক্সিব কাছে পৌছে আমি ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলুম। আমাব সহযাত্রীবা তখনও ফিবে আসেননি। তাঁদেব জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা কবতে হবে মনে কবে আমি নিজেব জায়গাতে গিয়ে বসলুম।

অনেকদিনেব পুবনো একটি কথা আমাব মনে পড়ল। কে একজন আমাকে বলেছিলেন যে একদা এইখানে কোন বাজ্যেব পম্পাপুব নামে বাজধানী ছিল। তাবই একটি ভাঙ্গা দুর্গেব ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গাব ধাবে আমি যে পবিত্যক্ত অট্টালিকা দেখলুম, তাই কি পম্পাপুরেব প্রাচীন দুর্গ। শুনেছিলুম যে বহু ধনে জনে পূর্ণ ছিল এই পাবত্য নগবী, দেড়শতাধিক দেবমন্দিবে সমৃদ্ধ ছিল। হিন্দু-বিদ্বেষী বাদশাহ ঔবঙ্গজেব নাকি এই নগব ধ্বংস কবেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ফুবাব সাহেব একথা সম্পূর্ণ অস্বীকাব কবেন নি। তিনি বলেছেন যে দেড়শো না হলেও এই শহবে যে অনেক সুন্দব মন্দিব ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু ইতিহাসে নয়, পুবাণেও আমবা বিন্ধ্যাচলের নাম পাই। জনমেজযেব প্রশ্নেব উত্তবে বেদব্যাস যে সব পীঠস্থানেব উল্লেখ কবেছিলেন তাব মধ্যে বিন্ধ্যেব উল্লেখ আছে, দেবতাব নাম বিন্ধ্যবাসিনী। বিন্ধ্যাচল একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। সতীব বাম পদাঙ্গুলি পড়েছে এইখানে, বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর ভৈবব হলেন পূণ্যভাজন। দেবী ভাগবতে আছে —

চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী।

কিন্তু বামনপুরাণে আছে অন্য কথা—

সহস্রাক্ষোঽপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগামহ।

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুর্গাকে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর—

পূজ্যমানা সুরৈর্নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী।

দেবতাদের পূজা পেয়ে তিনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে বিখ্যাত হয়েছেন।

দেবীপুরাণের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। চণ্ডী আমাদেব ঘরে ঘরে পাঠ হয়, আমরা শুনেছি যে দেবী দুর্গামূর্তিতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন, বধ কবেছিলেন চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ ও শুম্ভ নিশুম্ভকে। দেবীপুরাণেব মতে এই যুদ্ধ হিমালয়ে হয়েছিল। কিন্তু পুরাণান্তবে দেখি যে এই যুদ্ধ হয়েছিল বিন্ধ্যাচলে। দেবী পুরাণেও আছে—

বিন্ধ্যেঽবতীর্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী॥

মহিষাসুবকে বধ করে দেবী বিন্ধ্যপর্বতেই বাস করছিলেন। রক্তবীজ এই সংবাদ দিল শুম্ভ নিশুম্ভকে। পূর্বজন্মে বক্তবীজ ছিল মহিষাসুরের পিতা রম্ভাসুর। আর মহিষাসুরের দুই অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ভয়ে নর্মদার জলে লুকিয়ে ছিল। সবাই মিলে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করল।

প্রথমে তারা সুগ্রীব নামে এক অসুরকে বিন্ধ্যপর্বতে দেবীর কাছে পাঠাল দূত রূপে। সুগ্রীব দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, দেবি, ত্রিলোকে তোমাব মতো সুন্দরী যেমন নেই, শুম্ভ-নিশুম্ভও তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, তুমি তাদের একজনকে বরণ কর।

দেবী বললেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু বাধা কী জান? আমি একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি। যে আমায় যুদ্ধে জয় করবে এবং আমার দর্পনাশ করবে, আমি তারই গলায় বরমাল্য দেব। শুম্ভ-নিশুম্ভ যখন দেবতাদের জয় করেছেন, তখন আমাকে জয় করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে না। যুদ্ধে আমাকে জয় করতে বল।

কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হল। শুম্ভ-নিশুম্ভ মহিষাসুর বধের প্রতিশোধ নেবে, আর দেবী অসুরদের বধ করে দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করবেন

স্বর্গরাজ্যে। সুগ্রীব গিয়ে দেবীর উত্তর জানাতেই শুম্ভ-নিশুম্ভ রেগে অস্থির। ধূম্রলোচনকে ডেকে বলল, তুমি সসৈন্যে গিয়ে তার কেশাকর্ষণ করে এইখানে নিয়ে এস।

তারপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হল। দেবী যেমন করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি করে একে একে বধ করলেন ধূম্রলোচন চণ্ড মুণ্ড ও রক্তবীজকে, তারপরে শুম্ভ-নিশুম্ভকে। এই যুদ্ধের প্রাণবন্ত বিবরণ আছে দেবীমাহাত্ম্যে।

কানের কাছে হঠাৎ একটা হুঙ্কার শুনে অন্যমনস্কতা আমার ঘুচে গেল। মুখ ফিরিয়ে আমি দেখলুম যে আমার সহযাত্রী দম্পতি এসেছেন ফিরে। ব্রাহ্মণকে বিদায় দেবার ব্যাপারেই বিবাদ বেধেছে। কী দিয়েছেন জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সন্তুষ্ট হয় নি। তারই উত্তরে ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠেছিলেন: আমি খ্যাংরাপটির বেচু মল্লিক, তুমি আমাকে ঠকাবে!

ভদ্রলোকের বাঙলা কথা ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই বোঝে নি; তাই সে হাতটা বাড়িয়েই রইল। তার স্ত্রী বললেন: দেখলে তো, এই জন্যেই তোমাকে বোকা বলি। আগে থেকে কড়ার করে নিলে এই ঝামেলা পোয়াতে হত না।

মহিলার চেহারা দেখে আমার ভয় হচ্ছিল। আলুথালু চুল, বেশ বাসও কিছু বিপর্যস্ত। এক হাতে পূজার ফুল ও প্রসাদ, অন্য হাতে মাথার কাপড় খানিকটা টেনে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন, বললেন: চলে এসো।

ভদ্রলোক করুণ ভাবে বললেন: আসব কি, হাত যে গোটাচ্ছে না!

থাক্ হাত বাড়িয়ে। এই ড্রাইভার!

বলে মহিলা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন।

খ্যাংরাপটির বেচু মল্লিক আরও কিছু ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে লাফিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। মনে হল, চোখ বুঁজে তিনি গাড়ি ছাড়ার অপেক্ষা করছেন।

গাড়ি ছাড়বার পর ভদ্রলোক আমাকে আক্রমণ করলেন, বললেন : আপনি কত দিয়ে পার পেলেন ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : এক টাকা।

এক টাকা !

বলে ভদ্রলোক তাঁর চোখ তুললেন কপালে। মহিলা বললেন : এই কোরেই তো ওদের মাথায় তোলা হচ্ছে।

আমি এ অভিযোগের কোন উত্তর দিলুম না। বোধ হয় এর কোন উত্তর সেই। অনেক অর্থব্যয় করে আমরা তীর্থস্থানে আসি, পুণ্যের লোভে অনেক কষ্ট স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের জন্য যারা আরও বেশি শ্রম স্বীকার করে, সেই পাণ্ডাদের আমরা বড় তাচ্ছিল্য করি, কৃপণ হই তাদের বেলায়। পথের ধারের ভিখারিকেও বোধহয় আমরা বেশি সহানুভূতির চোখে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কে দায়ী সে আলোচনা এখানে নিরর্থক।

সোজা রাস্তায় অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে গেলুম। এবারে আমরা অষ্টভুজা দেবীর দর্শনে চলেছি। অষ্টভুজা দেবীর নাম আমি কোন প্রাচীন গ্রন্থে পড়ি নি। কোন আধুনিক লেখাতেও এ নাম দেখি নি। স্থানীয় লোকের মুখেই এই নামটি আমরা শুনলুম। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই দেবীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

সহসা আমার মনে পড়ল যে বিন্ধ্যাচলে আমি দেবীর নাম পড়েছি অন্যরকম। যে মন্দির দেখে এলুম তার নাম ভোগমায়ার মন্দির, আর যে মন্দির এখন দেখতে যাচ্ছি তার নাম যোগমায়ার মন্দির। একই দেবতার দুই রূপ। লোকালয়ের মধ্যে তাঁর পূজার বিধি সাড়ম্বরে, পর্বতোপরি তাঁর কৃপা মেলে যোগে।

অনেকটা পথ এগোবার পরে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ হাতের পথ ধরলুম। এই পথ এসেছে পাহাড়ের ধারে। আমরা একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে এসে নামলুম। এখান থেকে আমাদের পাহাড়ে উঠতে হবে পায়ে হেঁটে।

নির্জন পরিবেশেও দু-একজন লোক দেখতে পেলুম। এঁরা স্থানীয় অধিবাসী। একটি আবাসগৃহ দেখলুম। কিন্তু সেটি ধর্মশালা কি না তা জেনে নেওয়া হল না। কয়েক ধাপ উপরে উঠে দেখলুম যে সেখানেও মানুষজন আছে। চা ও মিষ্টির দোকান। যাত্রীরা পাহাড় থেকে নেমে এইখানে বিশ্রাম করে। বড় কড়াই-এ খোয়া তৈরি হচ্ছে, পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সেই তাজা খোয়ার সঙ্গে চা খায়।

বেচু মল্লিক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে উঠছিলেন খুব ধীরে ধীরে, আর যাকে পাচ্ছিলেন তাকেই জিজ্ঞাসা করছিলেন এই পাহাড়ের উচ্চতার কথা। কতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। আমি শুনেছিলুম যে, ধাপ অনেক আছে, উঁচু উঁচু ধাপ, বেশ কষ্ট হয় উঠতে। ভেবেছিলুম যে ত্রিচিনপল্লীর রকফোর্টের মতো বা পুণার পার্বতী মন্দিরের মতো পরিশ্রম হবে। পছন্দ মতো সঙ্গী নেই বলে এই শ্রম স্বীকারের জন্য মনটাকে তৈরি করেছিলুম। তাই নিতান্ত অল্প আয়াসে অষ্টভুজার মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ভাবলুম, এ বোধহয় আসল মন্দির নয়, আমাকে বোধহয় আরও উপরে উঠতে হবে। তাই চারিদিকে ঘুরে উপরে উঠবার পথ খুঁজতে লাগলুম।

কিন্তু না, উপরে উঠবার পথ আর নেই। দেবালয় গুনি এই প্রাঙ্গণেরই প্রান্তে অবস্থিত। জনকয়েক পুরুষ ও স্ত্রীলোক আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। এরাই মনে হল এই মন্দিরের পাণ্ডা। একজন পুরুষ আমাকে সামনের গুহার ভিতরে প্রবেশ করবার জন্য আহ্বান জানাল। মাথা নিচু করে আমি গুহায় প্রবেশ করলুম।

এই গুহা অজন্তা বা ইলোরার মতো কারুকার্য মণ্ডিত নয়, গুহাকে বাহির থেকে মন্দির বলেও মনে হয় না। পাহাড়ের গুহা বলতে আমরা যা বুঝি, এ ঠিক তাই। সংকীর্ণ প্রবেশের পথ, সোজা হয়ে বসবার উপায় নেই। তবে ভিতরে ঢুকবার পরে আমি সোজা হয়ে

দাঁড়াতে পারলুম। একসঙ্গে আরও কয়েকজন ভিতরে দাঁড়াতে পারে, এমন স্থান আছে। গুহার দেওয়ালের গায়ে দেবীর মূর্তি। বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা বোধহয় এখানে অষ্টভুজা নামে পরিচিত। দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি চোখ বন্ধ করে তাঁকে স্মরণ করি। তারপরে বেরিয়ে আসি। দেবী অষ্টভুজা না দশভুজা তা কোনদিন গুনে দেখি না। দেবী পাথরের, না ধাতু নির্মিত, তাও জানতে চাই না। দেবীর রূপের চেয়ে তাঁর শক্তিকে আমি বেশি সম্মান করি, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা', 'বিপদে যেন করিতে পারি জয়'।

দেবীকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই একজন স্ত্রীলোক আমাকে অন্য একটি মন্দিরে নিয়ে গেল। এও একটি গুহা, কিন্তু অনেক বেশি সংকীর্ণ এর প্রবেশ পথ। অত্যন্ত সন্তর্পণে শরীর ও মাথা বাঁচিয়ে আমি এই গুহা মন্দিরের দেবী দর্শন করলুম। মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীও আছেন বিন্ধ্যাচলে। কোন্ মন্দির কত দূরে সে সংবাদও পেলুম এইখানে। কিন্তু সেসব স্থানে যাবার উপায় নেই। ট্যাক্সির ড্রাইভারের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ। আমাদের ইচ্ছা মতো সে চলবে না।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে ফিরে এসে আমি বেচু মল্লিক ও তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেলুম। ভদ্রমহিলা মাটির উপরেই বসে পড়েছিলেন, আর ভদ্রলোক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক বলে উঠলেন: কী মারাত্মক জায়গা মশাই, প্রাণে মারা পড়বার দাখিল।

ছোটখাট হাল্কা চেহারার মানুষ, তাঁর এমন পরিশ্রান্ত হবার কারণ ছিল না। তাই আমি কোন উত্তর না দিয়ে অন্য একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম: এখানে আর কিছু দেখবার আছে?

তিনি বললেন: কুণ্ডগুলি দেখে এসেছেন? সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড অগস্ত্যকুণ্ড!

ক্লান্তভাবে বেচু মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন : সে আবার কত দূর ?

যাত্রীটি তাঁদের দুর্দশা দেখতে পেয়েছিলেন। হেসে বললেন : দূরে যেতে না চান, কাছের কুণ্ডটা দেখে নেবেন।

আমি আর সময় নষ্ট করলুম না। খানিকটা নিচে নেমে যে রাস্তা ডান দিকে চলে গেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে গেলুম। নিকটেই একটি কুণ্ড। পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণার একটি ধারার চিহ্ন আছে, এখন আর তাতে জলধারা নেই। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝির ঝির করে জমা হচ্ছে পথের ধারের একটি কুণ্ডে, তারপরে বয়ে যাচ্ছে নিচে। পরিষ্কার টলটলে জল। একজন বৃদ্ধ অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করল, তারপরে একটি ছোট বালতি ভরে নিচে নেমে গেল। এই জলের অনেক গুণের কথাও বলে গেল আমাকে।

কুণ্ডের অপর দিকে একটি শিবের মন্দির আছে, আর একটি বাসগৃহ। এগিয়ে গিয়ে আমি সে সবও দেখে এলুম। একজন সন্ন্যাসী সেখানে বাস করছেন, আর তাঁর সেবা করছেন জনকয়েক লোক। শান্ত সুন্দর পরিবেশ, অবসর যাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান।

পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় আমার একটি গল্প মনে পড়ল। এ গল্প আমি একজন সহকর্মীর কাছে শুনেছিলুম। সে ভাল তবলা বাজায়, শিখেছিল কাশীর এক ওস্তাদের কাছে। কথায় কথায় একদিন বলেছিল যে ভাল তবলা বাজাতে হলে নাকি তপস্যা করতে হয়। শুধু রেওয়াজ নয়, দেবীর কৃপালাভের জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। কেউ বারাণসীতে নিজের গৃহে, কেউ বা বিন্ধ্যাচলে এই মন্দির প্রাঙ্গণে এসে তপস্যা করেছেন। প্রতাপ্পু মহারাজ নাকি কোমরে তবলা বেঁধে নবরাত্রির নয় দিন দিবারাত্রি এখানে তবলা বাজিয়েছিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে তিনি দেবীকে শুনিয়েছিলেন তাঁর অনবদ্য বাদ্য। খুশী হয়েছিলেন দেবী, উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। নিজের কানে সেই কথা শুনে প্রতাপ্পু মহারাজ ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর কিষেণ মহারাজের পিতা হরি মহারাজ এসেছিলেন এইখানে। তিনিও অসাধ্য সাধন করেছিলেন। শোনা যায় যে তিনি নাকি দেবীর জ্যোতি দেখেছিলেন, আর পাগল হয়ে গিয়েছিলেন আনন্দে।

কণ্ঠে মহারাজের কথাও শুনেছি। তিনি বিন্ধ্যাচলে নয়, বারাণসীতে তপস্যা করেছিলেন ছয় মাস। একাগ্র মনে বাজাতে বাজাতে নূপুরের শব্দ শুনতে পেলেন, তারপর ছায়া দেখলেন নৃত্যরতা দেবীর। কণ্ঠে মহারাজের সাধনা সার্থক হয়েছে। আজও তিনি সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পরে আমি কণ্ঠে মহারাজের কাছে এই গল্প শুনেছিলুম। তিনি বলেছিলেন যে প্রতাপু মহারাজ তপস্যা করেছিলেন বিন্ধ্যাচলের এক কালী মন্দিরে। অনাহারে অনিদ্রায় তিনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তখন দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বর দিয়েছিলেন, কপালে দেবীর বিভূতি লাগিয়ে বাজাতে বসলে কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। নিজের ছোট ভাই হরি মহারাজের কথাও বলেছিলেন। তিনি তপস্যা করেছিলেন চুনারের কাছে একটি মন্দিরে। নবরাত্রি শেষ হবার আগেই বড় ভাই তাঁকে খুঁজে পেয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তপস্যা অসমাপ্ত ছিল বলেই বোধহয় হরি মহারাজ পাগল হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তারপরে নিজের কথাও বলেছিলেন কণ্ঠে মহারাজ। ছ মাস সাধনার পরে একদিন রাত তিনটের পরে তিনি শুভ্রবসনা সরস্বতীকে দেখেছিলেন। দেবী তাঁর এধার থেকে ওধারে গিয়েছিলেন একবার। আর ফিরে এসেছিলেন আর একবার।

চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে নামবার সময় আমি থেমে পড়লুম। গরম চা তৈরী হচ্ছে। উল্টো ধারে চাতালের উপরে বসে একজন জিলিপি খাচ্ছে, আর একজন তাজা খোয়া ওজন করাচ্ছে খাবার

জন্যে। কিছু খাবার ইচ্ছা আমার হল না, কিন্তু গরম চা-এর লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম: এক ভাঁড় চা পাব?

সবিনয়ে দোকানদার বলল: জরুর।

তারপরে তার সহকারীকে আদেশ করল ভাল করে চা তৈরি করতে।

এই অবকাশে আমি দুটি অলৌকিক কাহিনী শুনলুম। এখানকারই এক ব্যক্তি একজন যাত্রীকে সেই গল্প বলছিলেন।

পাহাড়ের উপরে যে গুহা আছে তার ভিতরে নাকি অনেক দূর যাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল আর কেউ বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস পায় না। অনেক দিন আগে তিনজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন এই গুহায় প্রবেশের জন্য। দেবীর পূজারী তাঁদের বাধা দেয়, বলে যে গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে মির্জাপুর থেকে সরকারের অনুমতি পত্র আনতে হবে। সন্ন্যাসীরা নিজের দায়িত্বে এই কাজ করছেন, এই মর্মে একটি দলিলে সই করে সরকারের নিকট অনুমতি পত্র সংগ্রহ করলেন। তারপরে ঢুকলেন মন্দিরের ভিতরে। কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই একজন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হল। তবু সাহস করে অন্য দুজন এগিয়ে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে এক অপরূপ কন্যার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দোলনায় দুলছিলেন, আর তাঁর সখীরা তাঁকে ব্যজন করছিলেন। সন্ন্যাসীদের দেখতে পেয়ে কন্যা বললেন, কী চাও তোমরা? তাঁরা বললেন, আপনাকে দর্শনের জন্যেই এসেছি। দেবী বললেন, তাহলে এখুনি ফিরে যাও, আর সাবধান, কাউকে একথা বলো না। সন্ন্যাসীরা বাহিরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু সহসা একজনের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তাঁর বোধহয় বাসনা হয়েছিল এই কথা প্রচার করবার। আর একজনের বাক্‌রোধ হল পরে। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এই ঘটনা প্রকাশ করবার পর।

গল্পটি শেষ করে বক্তা আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন: বাবুজী, এর পরে আর দেবী দর্শনের চেষ্টা কেউ করেনি।

আমি তখন চায়ের ভাঁড় হাতে পেয়েছিলুম। তাতে চুমুক দিয়ে বললুম : এ রকম ঘটনা নিশ্চয়ই আরও ঘটেছে।

ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে বললেন : ঠিক এ রকম ঘটনা নয়, অন্য রকম কাহিনী আছে প্রচলিত।

বলে আর একটি গল্প আমাদের শোনালেন।—

সে একটি বালকের গল্প। মায়ের সামনে সে নিত্য চণ্ডীপাঠ করত। কিন্তু তার পাঠ কিছু অশুদ্ধ হত। তাই দেখে এক পণ্ডিত তাকে মূর্খ বলে গাল দিলেন। রাতে সেই পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলেন যে দেবী তাঁকেই মূর্খ বলছেন। আর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলে তিনি শাপ দিলেন যে তাঁর কুষ্ঠ হবে।

প্রভাতে উঠে পণ্ডিত দেখলেন যে তাঁর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে, আর যন্ত্রণার যেন শেষ নেই। এক ব্রহ্মচারী বাস করতেন নিকটে, পণ্ডিত তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। ব্রহ্মচারী বললেন, এক কাজ কর। গরম ঘৃতে তুলসীপাতা ভিজিয়ে সেই ঘৃত মায়ের দেহে লাগাও। পণ্ডিত এই কাজ করে অনেক আরাম পেলেন। তারপরে ব্রহ্মচারী বললেন, এবারে চন্দনে তুলসী পাতা ভিজিয়ে সেই চন্দন মাখাও মায়ের গায়ে। পণ্ডিত ভাবলেন, মায়ের পাথরের দেহে চন্দন না মাখিয়ে নিজের দেহে মাখালেই তো আরও আরাম হবে। পণ্ডিত এবারে তাই করলেন। ব্রহ্মচারী এ কথা জেনে বললেন, সর্বনাশ! মায়ের দেহ পাথরের, এই তোমার বিশ্বাস হলে কি তুমি আর বাঁচবে! সত্যি সত্যিই পরদিন পণ্ডিতের মৃত্যু হল।

গল্প শুনতে শুনতেই আমি আমার চায়ের ভাঁড় শেষ করেছিলুম। এবারে দেখলুম যে উপর থেকে বেচু মল্লিক নামছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। আমি আর দেরি করলুম না, চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়েই পাহাড়ের নিচে নেমে এলুম।



বিন্ধ্যাচল থেকে আমরা যখন চুনারের দিকে যাত্রা করলুম, আকাশের সূর্য তখন প্রখর হতে আরম্ভ করেছে। এবারে আমরা বিন্ধ্যাচল শহর এড়িয়ে একটা সোজা পথে মির্জাপুরে এলুম, তারপর পুরনো পথে প্রত্যাবর্তন।

অনেকক্ষণ নীরব থাকবার পরে বেচু মল্লিকের স্ত্রী বললেন: কাজটা কিন্তু ভাল করলে না।

ভদ্রলোক নিজেও বোধহয় এই কথাই ভাবছিলেন, বললেন: ঠিক করেছি।

তিনি কোথায় কী করেছিলেন, আমি তা জানতুম না। কিন্তু তাঁদের কথোপকথন শুনেই ব্যাপারটা কিছু অনুমান করতে পারলুম। গুহার ভিতর দেবী দর্শন করে স্ত্রীলোকটিকে দক্ষিণা দেননি, বোধহয় বলেছিলেন যে গুহার বাহিরে এসে কিছু দেবেন। কথার খেলাপ করেছিলেন বলেই মহিলা বললেন: ঠাকুরের সামনে তাহলে বললে কেন।

ভদ্রলোক বললেন: খুচরো না থাকলে কি গোটা টাকা দেব একটা!

মহিলা বললেন: এ তোমার খদ্দের নয় যে ঠকিয়ে লাভ করবে। যা দেবার তা কাশীর গঙ্গায় দিও।

এখন আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার আরও জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা চুনার স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেলুম। এবারে আর সোজা যেতে হল না, রেল লাইন পার হয়ে আমরা অন্য ধারে এলুম। তারপরে এগিয়ে গেলুম একটা মাথা-কাটা পাহাড়ের দিকে।

চুনার দুর্গটি সমতল ভূমির উপরে নয়। ট্রেনে যাবার সময় আমি এই দুর্গ দেখেছি পাহাড়ের উপরে। বিন্ধ্যাচলের দিকে যাবার পথেও তা দেখেছি। এবারে সেই পাহাড় দেখবার আগে পাথরের কারবার দেখতে পেলুম। পাথর কেটে কেটে সব সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এই সব পাথর দিয়ে ঘর বাড়ির দেওয়াল তৈরি হবে। হয়তো বা মেঝেতেও ব্যবহার হবে এই সব পাথব।

চুনারের পাথর, জব্বলপুরের পাথরের মতো নয়। সে পাথরের নাম মার্বল। সাদা ও কালো মাবল পাথরও দেওয়াল ও মেঝের জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেক দাম সে পাথরের। চুনারের পাথর সস্তার জিনিস, তার ব্যবহার ইটের বদলি হিসাবে। এইসব দেখতে দেখতেই আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলুম।

বেচু মল্লিকের স্ত্রী সহসা বলে উঠলেন: এখানেও পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি!

ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন: এ্যাঁ!

তারপরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কী মশাই, চুপ করে আছেন কেন! এখানেও কি শাস্তি আছে নাকি!

আমি সংক্ষেপে বললুম: জানি নে।

জানেন না তো জিজ্ঞেস করছেন না কেন!

বললুম: গাড়ি থামলে নিজের চোখেই দেখতে পাব।

ভদ্রলোক অপ্রসন্ন হলেন আমার উত্তর শুনে, বললেন: পয়সা দিতে হবে বলে কি প্রাণটাও দেব?

এর পরেই দেখলুম যে গাড়ি পাহাড়ের নিচে দাঁড়াল না, পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সুন্দর সড়ক আছে উপরে উঠবার।

পুরাকালে এই দুর্গের নাম ছিল চরণাদ্রিগড়। একটি বিরাট পদচিহ্নের মতো আকার বলেই এই নাম হয়েছে। কোন্ দেবতার পদচিহ্ন তা জানা নেই, তবে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী যাবার পথে কোনও দেবতা এইখানে একটি পা

ফেলেছিলেন। এই দুর্গ নির্মিত হয়েছে সেই পায়েব দাগের উপরেই।

সত্যিই এই দুর্গটি পদচিহ্নের মতো কিনা, তা দেখতে হলে আকাশে উড়তে হবে। পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে, কিংবা উপবে হেঁটে বেড়িয়ে তা বোঝা সম্ভব নয়।

পাহাড়টি যে বেশি উঁচু নয় তা সহজেই বুঝতে পারলুম। অল্প সময়েই আমাদের গাড়ি দুর্গের ভিতরে পৌঁছে গেল। আমরা নেমে পড়লুম।

চুনার দুর্গটি আমি কী রকম দেখব ভেবেছিলুম, সহসা তা মনে পড়ল না। চিতোব গড়েব মতো ভাঙা দুর্গ, না কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের মতো, তা স্থিব করবার আগেই দেখতে পেলুম যে এখানে বন্দুকধারী প্রহরীও আছে, আবার লোকজনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে আমাদের মতো টুরিস্টও আছে। তারা কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে আর হাতে ক্যামেরা নিয়ে পায়ে হেঁটে উপরে উঠেছে।

যে পথে আমরা এলুম, সে পথে পায়ে হেঁটে আমরা কাউকে উঠতে দেখি নি, পায়ে হেঁটে উঠবার পথ অন্য। সে পথ উঠেছে শহরের মাঝখান থেকেই, সংক্ষিপ্ত পথ সেটি। যে পথে আমরা এলুম—তা যান-বাহন চলাচলের পথ। দুর্গের প্রধান তোরণটিও এ পথের উপরে নয়।

কষ্টে সৃষ্টে গাড়ি থেকে নেমেই বেচু মল্লিকের স্ত্রী বললেন: কি দেখবে এখানে?

বেচু মল্লিক তাকালেন আমার মুখের দিকে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দিলুম না। দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন: বলুন না মশাই, কী দেখতে হবে এখানে।

এবারেও আমি সংক্ষেপে বললুম: দুর্গ।

খানিকটা তফাৎ থেকে একটা হাসির শব্দ এল। তাই শুনে আমি সেই দিকেই এগিয়ে গেলুম। বাঙলায় বললুম: তাহলে বলে দিন না কী দেখব।

কে হেসেছিল জানি নে, কিন্তু যে লজ্জা পেয়েছিল সে বলল: সোজা এগিয়ে যান সামনের দিকে। দুর্গে ঢোকবার বড় গেট দেখতে পাবেন। তারই পাশে একটি পাথরের ফলকে এই দুর্গের ইতিহাস লেখা আছে। তারপরে আমাদের মতো ঘুরে ঘুরে দেখুন।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম। বেচু মল্লিক ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করলুম না।

মোটর চলাচলের উপযোগী একটি রাস্তা ডান হাতে দুর্গের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। সেদিকে একটি খোলা ময়দানও আছে। যখন এখানে সৈন্য সামন্ত থাকত, তখন হয় তো কুচকাওয়াজ হত এই ময়দানে। এখনও কিছু পল্টন আছে, কিন্তু তাদের কাজ কী তা জেনে নেবার মতো কোন সুযোগ পেলুম না।

এই দুর্গটির ব্যবহার একালে নানারকমের। কখনও দপ্তর হয়েছে, কখনও কোন মহিলা কল্যাণ আশ্রম, কখনও বন্দী নিবাস বা ইংরেজ সৈন্যের বিশ্রামের শিবির হিসাবেও এই দুর্গের ব্যবহারের কথা শোনা যায়। এই দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করে সঠিক কোন ধারণা হল না।

আমি যেদিকে এগিয়ে গেলুম সেই দিকেই দুর্গের প্রধান তোরণ। পাথর দিয়ে বাঁধানো পথঘাট ও প্রাচীর দেখে দুর্গ বলে মনে হচ্ছে। যাত্রীরা যাতায়াত করছে একটি ছোট দরজা দিয়ে, বিরাট দরজার একপাশে একটি মানুষের যাতায়াতের উপযোগী এই পথ। তার-পরে আর সমতল নয়, বাঁধানো পথ ঢালু হয়ে শহরের দিকে নেমে গেছে। আমি খানিকটা নেমে গিয়েছিলুম, তারপরে ফিরে এসে অন্য একটি পথ ধরে পাহাড়ের অন্য ধারটাও দেখে এলুম। দুর্গের পদস্থ কর্মচারীর বাসগৃহ আছে সেদিকে।

ফেরার সময় সেই পাথরের ফলকটির উপর চোখ পড়ল। মির্জাপুরের কালেকটর কটন সাহেব এই ফলকটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন। পাথরের গায়েই তা লেখা আছে। আর যা

লেখা আছে তা মূল্যবান গবেষণার কথা। সংক্ষেপে এই দুর্গের ইতিহাস তিনি লিখে রেখে গেছেন। গভীর মনোযোগে আমি আদ্যোপান্ত পড়ে নিলুম।

বিস্ময়ে অভিভূত হলুম এই কথা পড়ে যে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নামও এই দুর্গের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। খ্রীষ্টের জন্মের ছাপ্পান্ন বৎসর আগে তিনি এই দুর্গে ছিলেন। সহসা আমার একটি পুরনো কথা মনে পড়ল। অনেক দিন আগে আমি সেই কথা কোন বইএ পড়েছিলুম। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তৃহরি নাকি এইখানে এসে যোগমার্গ অবলম্বন করে তপস্যা করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজা এইখানে তাঁর বাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।

ইতিহাসে ভর্তৃহরি একটি অপরূপ চরিত্র। রাজাবলীতে দেখি যে তিনি গন্ধর্ব সেনের পুত্র, এক দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম। বত্রিশ সিংহাসনে তিনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা, ভর্তৃহরির মা ছিলেন বিক্রমাদিত্যের মায়ের সখী। বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তিনি তাঁর মাতামহের রাজসিংহাসন পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন নি, সিংহাসন পরিত্যাগ করে তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন। স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, লোকে তাই তাঁকে স্ত্রৈণ বলত। এই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন, আর সন্ন্যাস গ্রহণ করে যোগসাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন।

শুধু এই ঘটনার জন্যেই ভর্তৃহরিকে আমরা সম্মান করি না, তিনি অমর হয়েছেন তাঁর কাব্য ও ব্যাকরণের জন্য। শৃঙ্গার শতক নীতি শতক ও বৈরাগ্য শতক নামে তিনখানি কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, আর বাক্যপদীয় বা হরিকারিকা সূত্র নামে পাণিনির মতো একখানি অমূল্য ব্যাকরণ। এ ছাড়াও লিখেছেন মহাভাষ্য দীপিকা ও মহাভাষ্য ত্রিপদী ব্যাখ্যা নামে দুইখানি গ্রন্থ। অনেকে ভট্টিকাব্যও তাঁর রচনা বলে

মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ভর্তৃহরি ছিলেন বলভীরাজ শ্রীধর সেনের সভাকবি।

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরির সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাঁর কাব্য শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও আদৃত হয়েছে। প্রায় তিনশো বছর আগে তাঁর কাব্যগুলি প্রথমে ফরাসী ভাষায় ও পরে ল্যাটিন জর্মন ও ইংরেজী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। দু হাজার বছর আগের এক ভারতীয় কবির এই সম্মান কি বিস্ময়ের নয়!

একটি মর্মান্তিক প্রবাদ আমি শুনেছি। সন্ন্যাসী ভর্তৃহরিকে হত্যা করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য নিজে। কিন্তু এই দুষ্কর্মের কোন কারণ না থাকায় এ প্রবাদ সত্য বলে মনে হয় না। আরও একটি প্রবাদ মালবে প্রচলিত আছে। তার থেকে জানা যায় যে মালবের রাজা ছিলেন ভর্তৃহরি এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য তাঁর পিতার নিকট রাজ্যের কোন অধিকার পান নি। রাজা ভর্তৃহরির সঙ্গে মনোমালিন্য হবার পরে তিনি দীনদরিদ্রের মতো নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তার পরে স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ভর্তৃহরি রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেলে বিক্রমাদিত্য এসে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন যে ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

গাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আমি এই সব কথা ভাবছিলুম। কাছাকাছি এসে দেখলুম যে বেচু মল্লিক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ফিরে আসছেন অন্য ধার থেকে। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন: ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন? যা দেখবার তা তো এই দিকে! দেখে আসুন তাড়াতাড়ি।

তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক সগৌরবে বললেন: সোনোয়ামণ্ডপ আর ভর্তৃহরির সমাধিটা দেখে আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি।

ভর্তৃহরির সমাধির কথা আমি জানতুম না। তাঁর কথা শুনে আমি সেই দিকেই ছুটে গেলুম।

প্রথমেই দেখলুম একটি লাল রঙের বাড়ি। একতলা ও চারকোণা। এই বাড়িটিরই নাম সোনোয়া মণ্ডপ। যে ভদ্রলোক ছবি তুলছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই গৃহটি ঐতিহাসিক এবং এ অঞ্চলের একখানি প্রিয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই স্থানটি কেন্দ্র করে। কতকটা পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার মতো গল্প। সোনোয়া নামে এক রাজকন্যাকে তার গরিব প্রেমিক এই বিবাহ-মণ্ডপ থেকে এসে হরণ করে নিয়ে যায়। ছোটখাট একটি রক্তের গঙ্গা এখানে বয়ে গিয়েছিল। পাশের আর একটি গৃহের সামনে দিয়ে আমি ভর্তৃহরির সমাধির দিকে চলে গেলুম। অন্য আর একটি গৃহের ভিতরে সেই সমাধি, জনকয়েক সাধু এই সমাধির দ্বার রক্ষা করছেন।

ভর্তৃহরি যোগী সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ল। রাজা ভর্তৃহরি নিজে কোন যোগীর শিষ্য হয়েছিলেন, রাজার শিষ্যরাও তাই যোগী নামে পরিচিত। এঁরা গেরুয়া পরেন ও হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাজা ভর্তৃহরির গুণ কীর্তন করে বেড়ান। বারাণসীতে এঁদের প্রধান কেন্দ্র।

আমি যে ঘরে প্রবেশ করলুম সেই ঘরেই সাধুরা সাধন ভজন করছেন। ভর্তৃহরির সমাধি তার পাশের ঘরে। একজন সাধু আমাকে সেই সমাধি দেখালেন। সুসজ্জিত সমাধির উপরে নিত্য পূজার আয়োজন আছে দেখলুম। এই যোগী সম্প্রদায় যে শবদেহ সমাধিস্থ করেন সে কথা আমার বিশ্বাস হল। রাজর্ষি ভর্তৃহরিকে প্রণাম করে আমি বেরিয়ে এলুম।

৭

গাড়ির কাছে ফিরে আসবার আগে আমি দুর্গের প্রাচীরের কাছে এসে একবার দাঁড়ালুম। শক্ত চওড়া প্রাচীর দিয়ে সমস্ত দুর্গটি ঘেরা। আর পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একটি সুন্দর নদী ধীর মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে। এ কোন্ নদী?

সহসা আমার গঙ্গার কথা মনে পড়ল। গঙ্গাই তো। বিন্ধ্যাচলে তাকে দেখেছি। বেনারসে তাকে দেখব, আর এখানেও সেই গঙ্গাকেই দেখতে পেলুম। বিন্ধ্যাচলে বালির চর দেখেছি বিস্তীর্ণ, কিছুদিন আগেই হয়তো কূলে কূলে ভরা ছিল। এখানে চর নেই, শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের মাঝে এই অপ্রশস্ত নদীকে যেন গঙ্গা বলে মনে হচ্ছে না। গঙ্গার নামে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঁধানো ঘাটে ঘাটে অসংখ্য নর নারীর স্নানের দৃশ্য। এ না হলে যেন মানায় না, গঙ্গাকে গঙ্গা বলে মনে হয় না।

আমি আর বেশি দেরি করলুম না। তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম গাড়ির কাছে। বেচু মল্লিক ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী বসে ছিলেন গাড়ির ভিতরে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক বলে উঠলেন: ড্রাইভারের কাণ্ড দেখেছেন মশাই!

আমি কোন প্রশ্ন না করে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন: কাউকে না বলে কোথায় সরে পড়েছে।

আমি তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্যে বললুম: কাছেই কোথাও আছে।

কোথাও নেই। চারিদিক আমি দেখেছি।

ঠিক এই সময়ে একটা গাড়ির শব্দ পেয়ে আমরা দুজনেই এক

সঙ্গে ফিরে তাকালুম। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে আমাদেরই ড্রাইভার তার গাড়ির মুখ ঘোরাচ্ছে। বেচু মল্লিক আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না, ছুটে গেলেন গাড়ির দিকে, থামতেই দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন, তারপরে আমাকে ডাকলেন: চলে আসুন।

আমি ধীবে সুস্থে এসে গাড়িতে উঠলুম। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। পুরনো পথ ধরে নামতে লাগল পাহাড় থেকে।

পিছন থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন: কী পাজী লোক দেখলেন তো মশাই! আমাদের ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছিল!

আমি তাঁর কথা শুনে হাসলুম। কিন্তু ভদ্রলোক চটে উঠলেন, বললেন: হাসছেন আপনি! কিন্তু চলে গেলে কী করতেন!

এ কথার উত্তর দিলেন তাঁর স্ত্রী, রাসভারি কণ্ঠে বললেন: যেতে দিলে তো!

লাল সুরকির সুন্দর রাস্তা ধরে গাড়ি আমাদের গড় গড় করে নেমে এল। এই রাস্তাটি বোধহয় শেরশাহর তৈরি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজপথ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তিনিই নির্মাণ করেছিলেন, আর নিজের দুর্গে উঠবার এই পথটি কি নির্মাণ করেন নি! তবে দুর্গটি তাঁর নিজের ছিল না, তিনি এই দুর্গের অধিকার পেয়েছিলেন মালিকা নামে এক বিধবাকে বিবাহ করে। দুর্গটি কেমন করে এই বিধবার হস্তগত হয়েছিল সে কথা আমার জানা নেই। কটন সাহেবের প্রস্তর ফলকে এই বিধবার নাম নেই। নাম আছে মোগল বাদশাহ বাবরের। এক বছর পরে শেরশাহ এই দুর্গের মালিক হয়েছিলেন।

এর পূর্বের ইতিহাসও আমার মনে আছে। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পর বারো শো বছরের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দুর্গ ছিল পৃথ্বীরাজ রায় পিথোরার অধীনে। অনেকে বলেন যে পৃথ্বীরাজই এখানে দুর্গ নির্মাণ করে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই শতাব্দীরই শেষের দিকে শাহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরি

এই দুর্গ অধিকার করেন। তারপর স্বামীরাজা এই দুর্গ উদ্ধার করেন ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কটন সাহেব এই দুর্গের ইতিহাসে আর দুটি নাম লিখেছেন। ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের মুহম্মদ শাহর নাম, আর সিকান্দার লোদীর নাম ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে, মোগল বাদশাহ বাবরের সতেরো বছর আগে। এঁদের উত্থান পতনের গল্প আমার জানা নেই। জানা আছে শেরশাহর সঙ্গে হুমায়ুনের সংঘর্ষের কথা।

সসারামের একজন পাঠান জায়গীরদারের পুত্র শেরশাহ কী করে মোগল বাদশাহ হুমায়ুনেব সঙ্গে লড়াই করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, সে এক আশ্চর্য কাহিনী। তাঁর নাম ছিল ফরিদ। তেত্রিশ বছর বয়সে জীবিকার জন্য তাঁকে পথে বেরতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি গিয়েছিলেন আগ্রায়, তারপরে বাহারখানের অধীনে একটা চাকরি পেয়ে ফিরে এসেছিলেন বিহারে। একদিন এই বাহারখানের সঙ্গে শিকারে গিয়ে একটা বাঘ মেরে উপাধি পেলেন শের খান। চল্লিশ বছর বয়সে শের খাঁ মুঘল বাদশাহ বাবরের অধীনে চাকরি পেয়েছিলেন। আর তাঁরই অনুগ্রহে সসারামের পৈতৃক জায়গীর উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা তখন নাবালক, তিনি তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। আর এই সময়েই মালিকাকে বিবাহ করে চুনার দুর্গের অধিকার লাভ করেন।

বাবরের মৃত্যুর পরে পাঠান সামন্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। হুমায়ুন তাদের পরাস্ত করেন। শেরশাহ বিদ্রোহে যোগ দেননি, তথাপি হুমায়ুন এসে চুনার দুর্গ অবরোধ করলেন। এই অবরোধ চলেছিল দীর্ঘ চারমাস ব্যাপী, তারপরে শেরশাহ বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু এই পাঠান নায়ককে বেশি দিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহর মতো পূর্বাঞ্চলে শের খাঁও হুমায়ুনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিলেন।

হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহর প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল বক্সারের নিকট

চৌসায়। হুমায়ুন যখন চুনার দুর্গ অবরোধ করে বসে আছেন, শেরশাহ তখন বোটাস দুর্গ জয় করে গৌড় অধিকার করে ফেলেছেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার করে যখন গৌড়ে পৌঁছলেন, শেরশাহ তখন চুনার পুনরধিকার করে ও বিহার বারাণসী জয় করে জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন। আগ্রা হাতছাড়া হবার ভয়ে হুমায়ুন দ্রুত এগিয়ে এলেন, আর শেরশাহ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন চৌসায়। চৌসার ময়দানে যুদ্ধ হল একদিন প্রভাতে, অতর্কিতে আক্রমণ করে শেরশাহ হুমায়ুনকে বিশ্রী ভাবে পরাস্ত করলেন। আত্মরক্ষার জন্য হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। একজন ভিস্তি তাঁর দুরবস্থা দেখে তাঁকে রক্ষা করল, জল বইবার মশক হাওয়ায় ফুলিয়ে তারই সাহায্যে বাদশাহকে গঙ্গা পার করে দিল। এই ভিস্তিকে হুমায়ুন একদিনের জন্য দিল্লীর বাদশাহ করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার দুজনের যুদ্ধ হয়েছিল কনৌজের নিকট। হুমায়ুন হেরে গিয়ে লাহোরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শের খাঁ তাঁকে অনুসরণ করে এই দেশ থেকেই তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিপ্পান্ন বছর বয়সে পাঠান নায়ক শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন শেরশাহ নামে। কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। পাঁচ বছর পরেই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের পরাজয়ের ব্যাপারে একটি কৌতুকের কথা শুনেছি। একজন বলেছিলেন :

ঘোড়ে পর হাওদা আওর হাতি পর জিন,
লড়াইসে ভাগে বাদশাহ হুমায়িন।

মিলের খাতিরে হুমায়ুনকে হুমায়িন করতে হয়েছে, না যিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি ভুল করেছেন কিছু, তা বলতে পারব না। অর্থবোধে কোন অসুবিধা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সময় বাদশাহর সৈন্যরা প্রাণভয়ে এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, যে

তাড়াতাড়িতে হাতির পিঠে হাওদা না চাপিয়ে চাপাল ঘোড়ার উপরে, আর জিন চাপাল হাতির পিঠে। হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে হুমায়ুন বাদশাহ সসৈন্যে পালিয়ে গেলেন।

রৌদ্রের উত্তাপ এখন বেড়েছে। মধ্যাহ্নের সূর্য উঠেছে মাথার উপরে। আমাদের চলার বিরাম নেই। উর্ধ্বশ্বাসে আমরা ফিরে চলেছি।

বেচু মল্লিকের স্ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

বেচু মল্লিক উত্তর দিলেন : মোগলসরাই।

মহিলা বললেন : সেখানে কি আবার ট্রেনে উঠতে হবে !

ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু মনে হল যে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মোগলসরাই না গিয়ে যে কাশীতেও যাওয়া যায়, সে কথা আমি তাঁকে বললুম না। আমার মন তখনও ইতিহাসের কথাতেই ডুবে ছিল। এ ইতিহাস বই-পড়া ইতিহাস নয়, কটন সাহেবের লেখা কয়েকটি নাম আর তারিখ।

শেরশাহর পরে তাঁর পুত্র ইসলাম শাহর নাম ১৫৪৫ থেকে ১৫৫২ পর্যন্ত। তারপরেই আকবর বাদশাহর নাম ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

চুনার দুর্গে অযোধ্যার নবাব মনসুর আলি খান সফদর জঙ্গের নাম দেখি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ইংরেজ ঢুকেছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অল্প সময়ের জন্য। সেই বছরই অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা এসে দুর্গ অধিকার করেন। আর একবার ইংরেজ ঢুকেছিল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করেছিলেন প্রথম ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস। গঙ্গার তীরে এই পার্বত্য দুর্গটি হেষ্টিংসের ভাল লেগেছিল। দুর্গের ভিতরে সবচেয়ে ভাল সৌধটি ছিল তাঁর আবাস ভবন, সবচেয়ে উঁচু জায়গায় নাকি এটি অবস্থিত।

দুর্গের ভিতরে কোন গাইড নেই, নেই কোন সাইন বোর্ড। তাই আমরা কোন দ্রষ্টব্যই ভাল করে দেখতে পেলুম না। ভারতের

ইতিহাসে কুখ্যাত ও ইংবেজজাতি কর্তৃক নিন্দিত ওয়াবেন হেষ্টিংস কোন্ গৃহে থেকে কাশীব বাজা চৈৎসিংহ ও অযোধ্যাব বেগমদেব উপবে অকথ্য অত্যাচাব কবেছিলেন, তা দেখতে পেলুম না। যাত্রীদেব যখন বিনা অনুমতিতে দুর্গ প্রবেশেব অধিকাব আছে, তখন কয়েকটি সাইন বোর্ড লাগিয়ে তাদেব সুবিধাবিধান কবলে কী ক্ষতি হত বুঝি নে।

ওয়াবেন হেষ্টিংস শখ কবে এই দুর্গে বেড়াতে আসেন নি। তিনি আত্মবক্ষাব জন্য এই দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি কাশীতে গিয়েছিলেন কাশীব বাজা চৈৎসিংহকে শাস্তিবিধানেব জন্য, সসৈন্যে বাস কবেছিলেন মধুদাসেব বাগানে। চৈৎসিংহেব সৈন্য সামন্ত তাকে আক্রমণ কববে শুনেই চুনাবে পালিয়ে এসেছিলেন ভয়ে। এই দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তিনি বাজাব বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেম।

ইংবেজ ভক্ত বাজা ছিলেন চৈৎসিংহ। তিনি সাহসী ছিলেন, অভিজ্ঞ ছিলেন বাজনীতিতে, প্রজাবৎসলও ছিলেন। কিন্তু ইংবেজেব সঙ্গে কোনদিন বিবাদ কবেন নি। দিল্লীব মোগল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হবাব আগে তাঁব পিতামহ মনসাবাম বাজা উপাধি পান বাদশাহ মুহম্মদ শাহব কাছে। মনসাবামেব পুত্র বলবন্ত সিংহেব আসনে অযোধ্যাব নবাব এই প্রদেশ অধিকাব কবেন। এই নবাবেব সঙ্গে যখন ইংবেজেব বিবাদ বাধে তখন বলবন্ত সিংহ ইংবেজেব পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধিব শর্ত অনুসাবে আবাব তাঁকে অযোধ্যাব নবাবেব অধীনেই ফিবে যেতে হয়।

বলবন্ত সিংহেব মৃত্যুব পবে তাঁব পুত্র চেৎসিংহ বিপদে পড়লেন। অযোধ্যাব নবাব তাকে সম্মান দিতে অস্বীকাব কবলেন। তাঁর সমস্ত অনুনয় বিনয় যখন ব্যর্থ হল, তখন তিনি ইংবেজেব সাহায্য নিলেন। ওয়াবেন হেষ্টিংসেব অনুবোধেই নবাব সুজা উদ্দৌলা চেৎসিংহকে তাঁব কাশীরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। সেই থেকেই চেৎসিংহ ইংরেজকে সম্মান কবেছেন, শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাচবণ করেন নি।

তবু কেন বিরোধ বাধল সেই কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এ চেৎসিংহের কোন অপরাধের জন্য নয়, ওয়ারেন হেষ্টিংসের অর্থ-লালসাই এই বিরোধের কারণ।

অযোধ্যার নবাবের অধিকার থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কাশীরাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, এবং চেৎ সিংহও ইংরেজের রাজস্ব নিয়মিত দিচ্ছিলেন। হেস্টিংস্ পাঁচ লক্ষ টাকা বেশি দাবী করলেন, চেৎ সিংহ নির্বিবাদে তা দিয়ে দিলেন। তারপর হেস্টিংস্ একদল অশ্বারোহী সেনা দাবী করলেন এবং চেৎ সিংহ তা দিতে না পারায় চল্লিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করলেন আর এই টাকা আদায়ের জন্যেই এলেন কাশীতে।

লোকে বলে যে ওয়ারেন হেস্টিংসের এ একটা ছল। আসলে তিনি অযোধ্যার নবাবের কাছে কাশীরাজ্য বিক্রি করতে চেয়েছিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকায়। এ খবর জানতে পেরে চেৎ সিংহ নাকি কুড়ি থেকে বাইশ লক্ষ টাকা হেস্টিংসকে দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও বড়লাটের মন ওঠে নি।

চেৎ সিংহ তখন কাশীর শিবালয় ঘাটের প্রাসাদে বাস করছিলেন। হেস্টিংস দু'শো সৈন্য পাঠিয়ে রাজাকে তাঁর প্রাসাদেই বন্দী করলেন। এই ঘটনা রাষ্ট্র হবার পরেই কাশীতে বিপ্লব বাধল। রাজা তাঁর সকল প্রজার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁর সৈন্য সামন্তরাই তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এল। রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে ইংরেজের সৈন্য বধ করে তারা বিজয়ী হল। বড়লাট নূতন সৈন্য পাঠালেন, এরা তাদেরও দিল হটিয়ে। তারপরে বড়লাটকেই আক্রমণের জন্য তৈরি হল। ভয় পেয়ে বড়লাট নিজেই চুনারে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু চেৎ সিংহ এই বিপ্লবের পিছনে ছিলেন না। গোলমালের সময় তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বর্ষাকাল, গঙ্গার জল ফুলে উঠে প্রাসাদের অনেক দূর পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছিল। চেৎ সিংহ তাঁর মাথার পাগড়ি কোমরে বেঁধে জানালা দিয়ে

নিচে নামলেন। জলে নৌকো বাঁধা ছিল, সেই নৌকোয় চেপে তিনি নিজেও পালিয়ে গিয়েছিলেন।

কাশীর বিদ্রোহ তখন অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে এই বিদ্রোহ দমন করলেন।

হতভাগ্য চেৎ সিংহ আর দেশে ফিরতে পারেন নি। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল আর তার উনত্রিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল গোয়ালিয়রে। হেস্টিংস তাঁর আঠারো বছরের ভাগনে মহীনারায়ণকে কাশীর রাজা করেছিলেন।

কাশীর রাজা এখন রামনগরের রাজা বলে পরিচিত। গঙ্গার ওপারে কাশী, এপারে রামনগর। চেৎ সিংহের দুর্গ ছিল রামনগরে, একশো বছর পরে সেই দুর্গকেই রাজপ্রাসাদে পরিণত করা হয়েছে। কাশী দেখতে যারা আসে, তারা রামনগরেও যায় রাজবাড়ি দেখতে। চেৎ সিংহের স্মৃতিবিজড়িত এই প্রাসাদ আজও সকলকে আকর্ষণ করে।

আমাদের গাড়ির গতি একটু মন্থর হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে আমরা একটি লোকালয়ের নিকটে আসছি। সহসা আমি একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। একটি মন্দিরের সাদা চূড়া নীল আকাশের গায়ে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন উঁচু যে সমস্ত গাছপালার উপর দিয়ে চূড়াটি দেখা যাচ্ছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়া এ নয়, কাশীর আর কোন অট্টালিকাও নয়। পরে জেনেছিলুম যে এটি নূতন বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই মন্দিরটি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে।

মল্লিক দম্পতি কিছুক্ষণ থেকে কথা কইছিলেন। আমার মনোযোগ এবারে সেইদিকে গেল। মহিলা বললেন: তোমার বুদ্ধি শুদ্ধিই এইরকম।

বেচু মল্লিক বললেন: তোমার তো ও বস্তু একেবারেই নেই।

তাঁর স্ত্রী বললেন: অমন বুদ্ধি থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

ভদ্রলোক এবারে আমাকে আক্রমণ করলেন, বললেন: কী মশাই, আপনি যাবেন কোথায়?

আমরা তখন রামনগরের সদর রাস্তা ধরে চলেছি। সহসা এই প্রশ্ন শুনে বলে ফেললুম: রামনগর।

অ্যাঁ!

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, বললেন: রামনগর আবার কোথায়?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম: সামনের চৌমাথায় আমি নামব।

তারপর?

তারপর নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে যাব কাশী।

বেচু মল্লিক পরম বিস্ময়ে তাকালেন তাঁর গৃহিণীর দিকে। তিনি ধমকে বললেন: তুমিও কি নৌকোয় উঠবে নাকি!

আমি তাঁদের সমস্যার কথা জানি। তাই বললুম: আপনারা এই গাড়িতেই কাশী চলে যান না।

ভদ্রলোক করুণ ভাবে বললেন: ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত যে অন্য রকম। হতভাগা কি শুনবে!

আমি বললুম: বললেই শুনবে।

তারপরেই ড্রাইভারকে থামতে বললুম। রামনগরের চৌমাথায় আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম।

গাড়ি থামল। পাঁচ টাকার একখানি নোট বার করতেই বেচু মল্লিক ছোঁ মেরে তা নিয়ে নিলেন, বললেন: ড্রাইভারের হাতে দেবেন না যেন।

আমি হেসে ড্রাইভারকে বললুম: এঁদের তুমি বেনারসে পৌঁছে দিও।

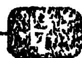
মাথা নেড়ে ড্রাইভার সম্মতি জানাল। তারপর আমি নেমে পড়তেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

হাঁ-হাঁ করে বেচু মল্লিক গাড়ি থামালেন, হাত জোড় করে নমস্কার করলেন আমাকে। বললেন : এই গাড়ি কি আপনার নাকি !

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : কেন বলুন তো !

আপনার কথা যে লক্ষ্মী ছেলের মতো মেনে নিল !

আমি হেসে বললুম : এখান থেকে মোগলসরাই যত দূর, কাশীও ততো দূর। আপত্তির ওর কোন কারণ নেই।



বেলা তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। রামনগরের একটা খাবার দোকানে কিছু খেয়ে নিলুম। তারপরে রাস্তায় নেমে ভাবলুম বেড়াবার কথা। এই দুপুর রোদে গঙ্গা পার হবার আগ্রহ আমার ছিল না। তাছাড়া রামনগরেও কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে বলে শুনেছি। কাশীর তীর্থযাত্রী রামনগর না দেখে ফেরে না।

যে চৌমাথায় আমি নেমেছিলুম, সেটি রামনগরের কেন্দ্রস্থল। এক দিকে অল্প একটু এগোলেই রাজবাড়ি, তারই পিছনে গঙ্গা। অন্য দিকে বাজার। সদর রাস্তায় সোজা এগিয়ে গেলে আমরা পড়াওএর তিন মাথা পেতুম। ডান দিকে মোগলসরাই, আর বাঁ দিকের পথ উঁচু হয়ে গঙ্গার পুলের উপর উঠেছে। এই পুলেরই নাম মালব্য ব্রিজ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নামে। নিচে রেলের পথ, উপরে অন্য যানবাহন। পুলের উপর থেকে কাশীর দৃশ্য নাকি অপরূপ, গঙ্গার ধারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি শহর দেখে আনন্দে মন দুলে ওঠে।

মনোরঞ্জনের কথা আমার মনে পড়ল। সে এখন কোথায় কী করছে জানিনে। বোধহয় কাশীতে কোন ধর্মশালায় উঠেছে, আর ভৃগুর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তার সহযাত্রীদের কথাও আমি ভুলতে পারি নি। মনে মনে দুর্ভাবনাও আছে খানিকটা। তাই বোধহয় তার অজ্ঞাতসারে পাটনায় নেমে পড়ে খানিকটা আরাম পেয়েছিলুম।

এখান থেকে যদি আমি কাশীতে যাই, হয়তো আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। গঙ্গার ঘাটে কিংবা বিশ্বনাথ গলিতে। ধর্মশালাতেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে কি আমি এখান থেকেই ফিরে যাব!

উত্তপ্ত পথ ধরে খানিকটা চলতেই মনে আমার বল এল। ভাবলুম, ভয় পাবার আমার কী আছে! স্বাতিকে কি আমি ভয় পাই, না তার মতো মেয়ের প্রতি আমার কোন দুর্বলতা আছে! আমি দেশ দেখতে বেরিয়েছি, দুচোখ ভরে দেখব, তারপর ফিরে যাব নিজের দেশে। মনোরঞ্জনকে আমার দরকার নেই, দরকার নেই আর কোন সহযাত্রীর। আমি একাই সবকিছু দেখে শুনে ফিরতে পারব।

মোড়ের কাছে খানকয়েক সাইকেল রিক্স ছিল দাঁড়িয়ে।

আইয়ে।

বলে তাদের একজন এগিয়ে এল।

হিন্দীতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় নিয়ে যাবে?

সে আমার কাঁধে ঝোলা দেখেই বোধহয় টুরিস্ট বলে সন্দেহ করেছিল। বলল: চলুন দুর্গাবাড়িতে।

আমি আর কোন প্রশ্ন করলুম না। যাতায়াতের ভাড়া ঠিক করে তার গাড়িতে বসলুম।

ছোট শহর। স্কুল কলেজ থানা সেনা নিবাসও আছে। খানিকটা এগিয়ে একটা পথ ধরে আমরা দুর্গাবাড়ির দিকে চললুম। পথ বাঁধানো, কিন্তু তেমন প্রশস্ত নয়। রিক্সওয়ালা বলল: দুর্গাবাড়ি যাতায়াতের এই একটিই পথ। রাজা নিজেও এই পথে নিত্য যাতায়াত করেন।

তারপরেই সে বলল: যাঁরা পড়াওএর দিক থেকে আসেন, তাঁরা এ পথে আসেন না। বড় রাস্তা থেকে একটা মেঠো পথ বেরিয়েছে, ভুট্টার ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রিক্সওয়ালারা চলে আসে, তারপরে এই পথ ধরে ব্যাস কাশী দেখতে যায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: ব্যাস কাশী কি এই দিকে নাকি!

রিক্সওয়ালা বলল: এই দিকেই তো। বড় ছোট দুটো ব্যাস কাশীই এই দিকে।

আমি আরও আশ্চর্য হলুম।

রিক্সওয়ালা এবারে আমাকে বুঝিয়ে বলল : বড় ব্যাস কাশী এখান থেকে অনেকটা দূরে। পথঘাটও ভাল নয় বলে সেদিকে যাত্রীরা আজকাল যায় না। কাশী থেকে সবাই আসে ছোট ব্যাস কাশী দেখতে। রাজবাড়ির ভিতরে সেই ছোট ব্যাস কাশী। নৌকোয় করেও যাওয়া যায়।

আমি ব্যাস কাশীর পৌরাণিক কাহিনী জানি, কিন্তু তা যে দুটো আছে তা এই প্রথম শুনলুম। ইচ্ছা ছিল যে আরও কিছু খবর এই লোকটার কাছে জেনে নিই, কিন্তু তার সুযোগ পেলুম না। একটা বিরাট বাঁধানো পুকুরের পারে এসে পৌঁছে গেলুম। চারিধারে সিঁড়ি বাঁধানো, জল অনেক নিচে নেমে গেছে। যে পারে আমরা পৌঁছেছিলুম তার অপর পারে মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। এরই নাম যে দুর্গাবাড়ি তাতে আমার সন্দেহ রইল না। রিক্সওয়ালা থেমে পড়েনি, পুকুরটি পরিক্রমা করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলুম যে পথ এইখানেই শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক দূরে চলে গেছে। রিক্সওয়ালা বলল : এই পথই গেছে বড় ব্যাস কাশীর দিকে।

বললুম : ব্যাস কাশী তো গঙ্গার ধারে শুনেছি!

রিক্সওয়ালা বলল : গঙ্গা তো আগে ঐখান দিয়েই বইত।

এখন?

এখন অনেক দূরে সরে গেছে।

এ কথা সত্য কিনা আমি জানি নে, জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব এমন লোকও নিকটে দেখলুম না।

রিক্স এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। আমি নেমে পড়লুম। মস্ত বড় একটি বাগানবাড়ির মধ্যে এই মন্দিরটি দেখে বিস্মিত হতে হয়। এমন সুন্দর একটি মন্দির সত্যিই কম আছে। কাল বুদ্ধগয়ায় যে মন্দির দেখেছি তার রূপের কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এ মন্দির অনাদৃত হলেও অপরূপ, এরও স্থাপত্যকলা যাত্রীদের মুগ্ধ করে।

নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমি মন্দিরটি দেখলুম। খাজুরাহোর মতো অনেক উঁচু ভিত্তির উপরে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। সিঁড়ি সামনে নয়, দুধার থেকে ধাপ উঠেছে উপরে, পাশে কারুকার্য করা রেলিঙ। এই রকমের সুন্দর রেলিঙ দিয়ে মন্দিরের চারি ধারটি ঘেরা। খাজুরাহোর মন্দিরে ঠিক এমনটি নেই, সেখানকার সমস্ত মন্দিরের ভিৎ নেড়া।

খালি পায়ে আমি উপরে উঠেছিলুম, তাই উত্তাপে পা জ্বলে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে পালিয়ে এসে মন্দিরের স্থাপত্য কর্ম দেখবার চেষ্টা করলুম। প্রথমেই যা চোখে পড়ল তা হল একটা বৈশিষ্ট্য। এ দেশের অনেক মন্দির তো দেখেছি, কিন্তু ঠিক এই রকম কারুকার্য আর কোথাও নেই। কোন মন্দিরের সঙ্গেই যেন এর তুলনা হয় না। মন্দির গাত্রের অলঙ্করণ অপর্যাপ্ত নয়। সারি সারি প্যানেল তৈরি করে নানা রকমের মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। সবচেয়ে নিচের দু সারিতে হাতি ও অন্য জন্তু। উপরের তিন সারিতে নানা দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্তি। সকলের উপরে এক সারি মূর্তি উপরের ছাদটি যেন ধারণ করে আছে। মন্দিরের গায়ের মূর্তিগুলি দূর থেকে মনে হবে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, ফ্রেমগুলিও নানা কারুকার্যমণ্ডিত।

মন্দিরের দরজা আমি বন্ধ দেখলুম। চারি দিকেই চারটি দরজা আছে, কিন্তু এই দরজা বিকেলের আগে খুলবে না। দেবী এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

এ সময় কোন যাত্রীও নেই। যাত্রীর ভিড় এখানে হয় কিনা জানি না। কোথা থেকে এই যাত্রীরা আসবে তাও জানি না। রামনগর তো কোন তীর্থস্থান নয়, কাশীর যাত্রীরা ছোট ব্যাস কাশী দেখেই ফিরে যায় শুনেছি। এ মন্দির দর্শনে হয় তো অনেকেই আসে না।

দেবী দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটল না, ক্ষুণ্ণ মনে আমি উপর থেকে নেমে এলুম।

জন কয়েক লোক নিচের একটি ঘরের মধ্যে কলরব করছিল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দু একটা কথা জেনে নিলুম। এই মন্দির চেৎ সিংহের দুর্গা মন্দির নামে পরিচিত, দেবী চতুর্ভুজা। রামনগরের রাজা এই মন্দিরের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁরা ধার্মিক, আজও তাঁরা নিয়মিত দেবীর পূজার্চনা করেন। নবরাত্রির রামলীলা এ অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট উৎসব। মন্দিরের সামনে পুষ্করিণীর ধারে যে বিরাট ময়দান আছে, সেইখানেই রামলীলা হয়। তখন এই স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

ফিরে যাবার আগে আমি মন্দিরের চূড়ার দিকে আর একবার তাকালুম। এই চূড়া মসৃণ নয় অনেক মন্দিরের মতো, কারুকার্যও কোন প্রচলিত পদ্ধতির নয়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে যে জ্যামিতিক কারুকার্য আছে তা সরল ও গম্ভীর, মন্দিরের আয়তনের সঙ্গে তা এমন মানিয়েছে যে আলো ছায়ার খেলায় তা মায়াময় হয়ে ওঠে। এই মন্দিরের চূড়া কারুকার্যে কণ্টকিত। এক রকমের উঁচু নিচু খাঁজ-কাটা নক্সায় সৌন্দর্য বড় উগ্র হয়ে উঠেছে।

তবু এই মন্দিরটি আমার ভাল লাগল। মনে হল যে এই রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে আমি তার সত্য রূপটি দেখতে পেলুম না। তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হত। অপরাহ্ণে যখন মন্দিরের দ্বার খোলা হত, যাত্রী আসত দলে দলে, বাদ্যে ও ঘণ্টা ধ্বনিতে মুখর হত মন্দির প্রাঙ্গণ, তখন এই দুর্গামন্দির তার আপন রূপে উদ্ভাসিত হত। নিশ্চয়ই তখন তার শিখরে আমি জ্যামিতির নক্সা দেখতুম না, দেখতুম এক স্বপ্নময় ইন্দ্রজাল। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে এই অনাদৃত মন্দিরটিও ভারতের অনেক মন্দিরের মতো অক্ষয় হয়ে থাকত।

দুর্গামন্দির থেকে ফিরে এসে আমি রাজপ্রাসাদের সামনে নামলুম। পয়সা মিটিয়ে বিদায় দিলুম রিক্সওয়ালাকে। তারপরে একটি চায়ের দোকানের ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম। জনকয়েক লোক

এই দোকানে জটলা করে চা খাচ্ছে। তারা স্থানীয় লোক, আমার মতো যাত্রী একজনও নেই।

রাজবাড়ির বিরাট গেটে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে যাত্রীদের জন্য দ্বার অবারিত। ভিতরে দ্রষ্টব্য বস্তুও আছে, চেৎ সিংহের অস্ত্রাগার ও কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখতে হলে এক টাকার টিকিট কাটতে হয়। বেলা তিনটেয় সেই জাদুঘরটি খুলবে। তিনটে বাজতে বেশি দেরি ছিল না, কিন্তু রাজবাড়ি দেখবার বাসনা আমার হল না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : গঙ্গা এখান থেকে কত দূর ?

একজন উত্তর দিল : রাজবাড়ির পিছনেই তো গঙ্গা। ভিতর দিয়ে যেতে পারেন, ঘুরেও যেতে পারেন এই রাস্তা দিয়ে।

বলে ডান হাতের রাস্তাটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

আর একজন বললেন : ব্যাস কাশী অবশ্যই দেখবেন।

সে কোন্ দিকে ?

ব্যাস কাশীর অবস্থান তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। গঙ্গার ধারে রাজবাড়ির এলাকার মধ্যেই এই মন্দির। এধার থেকে হেঁটেও যাওয়া যায়, আবার খেয়া ঘাট থেকে নৌকোতেও যাওয়া চলে।

আমি বললুম : নৌকোতেই যাব।

ডান হাতের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকের পথ ধরতে হল। রাজবাড়ির পাশে পাশে এই পথটিই গঙ্গার ঘাটে এসেছে। অসংখ্য নৌকো আছে ঘাটে বাঁধা। মাথা পিছু আনা পাঁচেক পয়সা নিয়ে ওপারে কাশীর ঘাটে পৌঁছে দিচ্ছে। বাসে যাতায়াতের চেয়ে নৌকোয় যাতায়াতই বোধহয় সুবিধাজনক। সময় কম লাগে। আরামও বেশি, গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতেই ওপারের যে কোন ঘাটে পৌঁছনো যায়।

আমাকে দেখতে পেয়েই একজন মাঝি এগিয়ে এল, বলল : কাশী ?

আমি বললুম ঃ না।

ব্যাস কাশী?

আমি হাঁ বললুম।

আসুন এই দিকে।

-বলে সে আমাকে ঘাটের অন্য ধারে নিয়ে এল। এদিকের নৌকোগুলি বোধহয় গঙ্গা পারাপারের জন্য নয়। তারই একটায় আমাকে উঠতে বলল। আমি বললুম ঃ কত ভাড়া লাগবে?

মাঝি বলল ঃ দেড় টাকা।

বোধহয় ভেবেছিল যে এক টাকায় বফা হবে। কিন্তু আমি আট আনা বললুন। এবং শেষ পর্যন্ত আট আনাতেই রফা হল।

আকাশের সূর্য তখনও নির্দয় ভাবে অগ্নি বর্ষণ কবছেন। কিন্তু গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়ায় কোন কষ্ট হচ্ছে না। নদীর পার ঘেঁষে আমরা এগুতে লাগলুম।

রাজবাড়ির এ দিকটা ঠিক দুর্গের মতো। কঠিন প্রাচীর উঠেছে গঙ্গার জলের ভিতর থেকেই। বিরাট প্রাসাদ, এক সঙ্গে সমস্ত প্রাসাদটা দেখা যায় না। তা দেখতে হলে বোধহয় গঙ্গার মাঝখানে যেতে হবে।

পারের কাছে নানা ধরণের নৌকো বাধা আছে। ময়ূরপঙ্খী নৌকো শৌখিন বজরা আধুনিক মোটর লঞ্চ আছে। অন্তঃপুরিকাদের স্নানের ব্যবস্থাও আছে! এই সব দেখতে দেখতেই আমি ব্যাস কাশীর ঘাটে এসে পৌছলুম।

এখানেও অনেক নৌকো প্রাসাদের ছায়ায় আছে বাঁধা। কিন্তু মানুষ জন নেই। আমার নৌকোওয়ালাব সঙ্গে আমি ঘাটের সিঁড়িতে নামলুম। তারপরে উঠে গেলুম উপরে। অনেকগুলি সিঁড়ি উঠবার পরে একটি সুড়ঙ্গ পথ। এই পথ দুভাগ হয়ে দুধারে উঠেছে। ডান দিকের পথ প্রাসাদের ভিতরে যাবার জন্যে, আর ব্যাসকাশীর যাত্রীদের জন্যে বাঁ দিকের পথ। খানিকটা উঠেই আমরা খোলা আকাশের

নিচে পৌঁছে গেলুম। মূল প্রাসাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এই অংশে কয়েকটি দেবালয় আছে। নৌকোর মাঝি এই পর্যন্ত এসে একজন ব্রাহ্মণের হাতে আমাকে সমর্পণ করল। সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সবকিছু দেখিয়ে দিলেন।

ব্যাস কাশীর মূল মন্দিরটি দেখেই আমি বেশি বিস্মিত হলুম। মন্দিরের মধ্যে বড় বড় তিনটি লিঙ্গ মূর্তি তামার মতো ঝকঝক করছে। পাথরের নয়, ব্রাহ্মণ বললেন যে অষ্টধাতুর এই সব লিঙ্গ মূর্তি। মাঝখানে সবচেয়ে বড়টি ব্যাসদেব, তাঁর ত্বধারে শুকদেব ও বিশ্বনাথ। মন্দিরের দেওয়ালে একখানি আড়াই শো বছরের প্রাচীন তৈলচিত্র আছে, কালক্রমে কালো হয়ে গেছে সেটি। মানুষকে আর চেনা যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণ বললেন, ছবিটিও ব্যাসদেবের। ত্ব পাশের ছবি ত্ব খানি হল রামনগরের রাজাদের।

ব্যাসদেবের মন্দির এটি, রামনগরের রাজাদের খরচে তাঁর নিত্যপূজা হয় এইখানে। এরই নাম ব্যাস কাশী। অগণিত যাত্রীর পূজায় এই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

ফেরার পথে আমার মনে পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কথা। বশিষ্ঠের প্রপৌত্র তিনি, পরাশরের পুত্র, মৎস্যগন্ধা সত্যবতী তাঁর মাতা। কুমারী কন্যা সত্যবতী প্রয়োজন হলে যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়া নৌকো বাইত। এমনি করেই একদিন ঋষি পরাশরের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল, আর বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল একটি দ্বীপে। কালো ছেলে দ্বীপে জন্মাল, তাই তাঁর নাম হল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। উত্তরজীবনে মহা পণ্ডিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করে বেদব্যাস নামে পরিচিত হলেন।

ব্যাসকাশীর গল্প আছে স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে। বেদব্যাস তখন কাশীবাস করছিলেন। প্রতি দিন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাশীর মহিমা কীর্তন করে শোনাতেন। একদিন মহাদেবের ইচ্ছা হল

বেদব্যাসকে পরীক্ষা করবার। তিনি অন্নপূর্ণাকে বললেন যে আজ যেন বেদব্যাসকে কেউ ভিক্ষা না দেয়। অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাই হল। সে দিন সারা দিন ঘুরে বেদব্যাস এক মুঠো ভিক্ষাও পেলেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শাপ দিলেন, মুক্তির গর্বেই তো কাশীবাসীরা ভিক্ষা দেয় না, ত্রৈপুরুষী মুক্তি তাদের হবে না। রাগে দুঃখে তিনি ভিক্ষার পাত্র ছুঁড়ে ফেলে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন সময় ছদ্মবেশে অন্নপূর্ণা এসে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, বললেন, অতিথি সৎকার না করে আমার স্বামী খান না, আজ আপনি আমার অতিথি হন।

বেদব্যাস একা নন, সশিষ্যে তার অতিথি হলেন। সৎকারের পর অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করলেন, স্বার্থ সিদ্ধি না হবার জন্যে যে শাপ দেয়, সে শাপ কাকে লাগে?

বেদব্যাস বললেন, তা শাপদাতারই প্রাপ্য।

তখন বিশ্বেশ্বর বললেন, অকারণে তুমি কাশীবাসীকে শাপ দিয়েছ, তুমি এস্থানে থাকবার যোগ্য নও। কাশী তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

অন্নপূর্ণার মধ্যস্থতায় ব্যাসদেব রক্ষা পেলেন। অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে তিনি কাশী প্রবেশের অনুমতি পেলেন।

এই ঘটনার পরেই ব্যাসদেব গঙ্গার পরপারে এলেন চলে, এই রামনগরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। লোকে এই জায়গার নাম দিল ব্যাসকাশী। লোকে বলে, কাশীতে মরলে যেমন মুক্তি হয়, তেমনি ব্যাসকাশীতে মরলে পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মায়। এর সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে।

কাশী থেকে বার করে দেবার পরে ব্যাসদেব এ পারে এসে ভেবেছিলেন যে তিনিও একটা। কাশী তৈরি করবেন। সে কাশী শিবের কাশীর চেয়েও ভাল হবে। অন্য জায়গায় পাপ করে শিবের কাশীতে এসে মরলে মুক্তি আছে, কিন্তু শিবের কাশীতে পাপ করলে মুক্তি নেই। ব্যাসদেব বললেন যে তিনি এমন কাশী তৈরি

করবেন যে সকলেরই মুক্তি হবে। যারা পাপ করে এসে কাশীতে মরবে তাদের তো হবেই, যারা তাঁর কাশীতে বসে পাপ করবে তাদেরও মুক্তি হবে। ব্যাসদেবের এই সংকল্পের কথা জানতে পেরে শিব দুর্ভাবনায় পড়লেন। অন্নপূর্ণা বললেন, ভাবছ কেন, আমি এর ব্যবস্থা করে আসছি।

এই কথা বলেই তিনি এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করলেন। হাতে লাঠি নিয়ে ঠকঠক করতে করতে গেলেন ব্যাসদেবের কাছে। বললেন : তুমি এখানে কী করছ বাবা ?

ব্যাসদেব বললেন নতুন কাশী তৈরি করছি। এখানে মরলে সবার মুক্তি হবে। যারা অন্যত্র পাপ করে এখানে মরতে এসেছে তাদের, আর যারা এখানে বাস করেও পাপ করবে তাদেরও মুক্তি হবে।

তা বেশ বেশ।

বলে বুড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু খানিকটা গিয়েই আবার এলেন ফিরে। বললেন, কী বললে বাবা, এখানে মরলে কী হয় ?

ব্যাসদেব বললেন, মুক্তি হয়।

তারপরে ব্যাপারটি আরও বুঝিয়ে বললেন।

মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ি কিছু দূর এগিয়ে গেলেন। তারপরে আবার এলেন ফিরে। বললেন, কানে কম শুনি বাবা, ঠিক বুঝতে পারলুম না। এখানে মরলে কী হয় বললে ?

ব্যাসদেব এবারে রেগে গেলেন, চেঁচিয়ে বললেন, গাধা হয়। এখানে মরলে সবাই গাধা হবে।

বুড়ি এবারে সহাস্যে বললেন, তথাস্তু।

তারপর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ব্যাসদেব বুঝতে পারলেন যে শিবের সোনার কাশী রক্ষা করবার জন্যে অন্নপূর্ণা নিজে এসেছিলেন ছলনা করতে।

নৌকো ঠেলে আমরা খেয়া ঘাটের দিকে আসছিলুম। চোখের সামনে এখনও ব্যাসদেবের মন্দিরটি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম। একই মন্দিরের ভিতরে পাশাপাশি তিনটি লিঙ্গমূর্তি। তিনটিই অষ্ট ধাতুর তৈরি। ধাতুনির্মিত লিঙ্গমূর্তি আমি এর আগে কখনও দেখিনি। আর পাশাপাশিও ঠিক এমনটি দেখিনি। তাছাড়া লিঙ্গমূর্তি বলতে আমরা শিবলিঙ্গই বুঝি। ব্যাসদেব বা শুকদেব বুঝি না, বুঝি ব্যাসদেব বা শুকদেব প্রতিষ্ঠিত শিব লিঙ্গ, নাম ব্যাসদেবেশ্বর বা শুকদেবেশ্বর। পূজারী ব্রাহ্মণকে আমি কোন প্রশ্ন করিনি। এ কথা জেনে নিলে যে ভাল হত তা এখন বুঝতে পারছি।

শুকদেবের মূর্তি এখানে কেন প্রতিষ্ঠিত হল সে প্রশ্নও আমার মনে এল। শুকদেব ছিলেন ব্যাসদেবের পুত্র, আজন্ম ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ছিলেন তিনি। একদা বেদব্যাস যখন তার পুত্রের সাধনস্থলে বসে ধ্যান করছেন, তখন তিনি মন্দাকিনী তারে নগ্ন অপ্সরাদের দেখে বিস্মিত হলেন। তারা অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাবে ক্রীড়া করছিল। সহসা এই বৃদ্ধ মহর্ষিকে দেখে তারা ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠল। কেউ জলে লীন হল, কেউ গুল্মের আড়ালে লুকোলো, কেউ বা তার বসনের জন্য ত্বরান্বিত হল। বেদব্যাস যুগপৎ লজ্জিত ও প্রীত হলেন। তাঁর যুবক পুত্র কত নির্বিকার ছিল যে এই অপ্সরাগণ কোন দিন তার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করেনি, অথচ তাঁর মতো বৃদ্ধকে দেখে এরা লজ্জা পাচ্ছে।

বেদব্যাস তাঁর পুত্রকে সংসারী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শুকদেব নারদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ভাবলেন যে বিদ্যার্জনে যেমন বহু শ্রম তেমনই স্ত্রীপুত্র পালনেও অনেক কষ্ট। তার চেয়ে কম আয়াসে কোন শাশ্বত স্থান লাভ করাই বাঞ্ছনীয়। তিনি স্থির করলেন যে যোগবলে দেহত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবেন। করলেনও তাই। কৈলাসে গিয়ে তিনি যোগবলে সূর্যের দিকে যাত্রা করলেন, এবং আকাশেই ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন।

স্নেহকাতর বেদব্যাস পুত্রের অনুসরণ করে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। শূন্য থেকে শুকদেব ভোঃ বলে উত্তর দিলেন। পাহাড়ে গিরি গহ্বরে তার প্রতিধ্বনি জাগল। মহাদেব এসে শোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন, তোমাদের পিতাপুত্রের কীর্তি অক্ষয় হবে। আমার প্রসাদে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখবে সর্বত্র।

আজও আমরা আকাশে শুকতারা দেখি, আর পাহাড়ে শুনি তাঁর উত্তরের প্রতিধ্বনি। বেদব্যাসও অমর হয়েছেন অদ্বিতীয় লেখক রূপে।

মহাদেবের আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

৯

গঙ্গার অপর পারে পবিত্র শহর বারাণসী। সামনেই একটি শাদা মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাচ্ছি, আকাশ ছোঁয়া মন্দির। এই মন্দিরই যে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বনাথ মন্দির, পরে তা জেনেছিলুম। কাশী শহর এখান থেকে অনেকটা দূরে, গঙ্গা পার হয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিন্ধ্যাচলে যে গঙ্গা দেখে এলুম, আর চুনার দুর্গের পাদদেশে যে গঙ্গা দেখলুম, তার সঙ্গে এ গঙ্গার যেন কোন মিল নেই। এ গঙ্গার মেজাজ যেন অভিজাত, তার স্ফীত প্রশস্ত বক্ষ গাম্ভীর্যে ভরা। চটুল আবর্ত নেই, নেই কোন আতঙ্ক ও ভয়। নৌকো থেকে নামবার ইচ্ছা আমার হল না। তাই মাঝিকে বললুম কাশীতে পৌঁছে দিতে।

মাঝি আপত্তি জানাল, বলল : তার উপায় নেই।

- বেশ, কত পয়সা চাই?

মাঝি বলল : পয়সা বেশি দিলেও তার উপায় নেই। তাতে বিশ্বাসভঙ্গের জন্য তার শাস্তি হবে।

তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম, তারপরে জেনে নিলুম সব কথা। খেয়া ঘাটেও 'কিউ' আছে, কাশী যাবার নৌকোগুলি একটার পর একটা লেগে আছে। কোনও মাঝির আগে পরে যাওয়া চলবে না। যার পালা যখন তখনই সে যেতে পাবে। এ নিয়ম না মানলে এ ঘাট থেকে তার অন্ন উঠে যাবে।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। এ তাদের স্বরাজ্যের নিয়ম, নিজেরাই তারা এ নিয়ম করেছে। এতে তাদেরও সুবিধে, যাত্রীদেরও কোন অসুবিধে নেই। তাই আমি আর কোন আপত্তি করলুম না॥

মাঝি আমাকে আর একখানি নৌকোর ধারে পৌছে দিল, সে নৌকোয় জন কয়েক যাত্রী বসে ছিল। মাঝি গল্প করছিল খানিকটা দূরে। তাকে ডেকে আমার নৌকোর মাঝি বলল ' এই বাবু বাকি পয়সা দেবে।

বেশি নয়, আমাকে মাত্র একটি টাকা দিতে হবে। তাহলে আর অন্য যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এ সর্তেই আমরা যাত্রা করলুম।

দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে এই রকমের ছোট ছোট খেয়া-নৌকো সারাক্ষণ যাত্রী পারাপার করছে। গঙ্গা এখন কূলে কূলে ভরা নয়, জল কিছুটা নেমে গেছে। তবু তার দুকূল ভরাই বলব। গঙ্গা নামের মধ্যেই যেন একটা অপরিসীম সাহস আছে, তাই কোন ভয় জাগে না মনে। অন্য কোন নদী হলে কি এমন করে পার হবার সাহস পেতুম।

কাঠের পাটাতনের উপরে চেপে বসে আমি মাঝির কৌশল লক্ষ্য করছিলুম। ছোট নৌকোটি সে এখন মাঝগঙ্গার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কোন উদ্বেগ আতঙ্ক নেই, স্বচ্ছন্দে সে তার কাজ করছে। যাত্রীদের দিকেও তাকিয়ে দেখলুম। পরিচিতরা কথা কইছে, আর একজন তার মাথার গামছা নৌকোর খোলে বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। গঙ্গার শীতল হাওয়ায় সে বুঝি এখনই ঘুমিয়ে পড়বে।

আমার কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত বোধ হল না। গঙ্গার ঘোলাটে জলের টান দেখে এক অদ্ভুত ভাবনা আমার মনে এল। এই হাল্কা নৌকোটি যদি এখন স্রোতের টানে উল্টে যায়, যদি ডুবে যায় নদীর মাঝখানে, তাহলে কি আমরা ওপারে গিয়ে পৌছতে পারব! মনে হয় পারব না, ভেসে থাকবার জন্যে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করে তলিয়ে যাব অতলে। কেউ আমাদের কথা জানবে না। যে পার থেকে এসেছি সে পারের লোক আর আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, যে পারে যাব তারাও দেখতে পায় নি আমাদের।

কেউ জানবে না যে আমরা ডুবে গেছি, শেষ হয়ে গেছে আমাদের জীবনের খেলা। লাস যদি কোন দিন কোনখানে ভেসে ওঠে, দূরের কোন চরে গিয়ে ঠেকে, তবে সে লাস দেখে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না।

আমার এই সঙ্গীদের কথা হয়তো আলাদা। তাদের ঘরের লোক হয়তো খোঁজ করতে বেরবে। এই মাঝির পরিবারের লোক নানা সন্দেহ নিয়ে গঙ্গার ধারে খুঁজতে আসবে। কিন্তু আমার কথা কে জানবে, কে খোঁজ করবে আমার! এমনি করে একদিন হঠাৎ হারিয়ে গেলে কেউ কি তা জানতেই পারবে!

সমস্ত আত্মীয় বন্ধুর কথা আমার মনে এক নিমেষে চমকে উঠল বিদ্যুতের মতো। সবাইকে দেখতে পেলুম, সবাই মিলিয়ে গেল দেখতে না দেখতেই। শুধু একজনের ছবি জেগে রইল। সে আমার আত্মীয়, না বন্ধু, তা জানি না। আত্মীয় নয়, বন্ধুও তাকে বলা চলে না। তবু মনে হচ্ছে যে একদিন তাকে সকলের চেয়ে আপন ভেবেছিলুম। সে ভাবনা কি এখন আমার মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে!

এই তো কয়েক মাস আগের কথা। গত বড় দিনের সময় তার বিয়ের খবর পেয়েছিলুম। মামা চিঠি দিয়েছিলেন অফিসের ঠিকানায়। লিখেছিলেন যে জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়ে ঠিক হয়েছে, মাঘ মাসেই বিয়ে হবে। বড় দিনের ছুটিতে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। আশীর্বাদ প্রভৃতি পাকা ব্যবস্থাগুলি যথাসম্ভব সত্বর করতে হবে। তার জন্যে আমার সাহায্য চাই। তাঁর বয়স হয়েছে। সবচেয়ে নিকট বলতে একমাত্র আমিই আছি। সম্বন্ধ নকল হলেও তিনি আমাকে নকল ভাবছেন না। কোমর বেঁধে আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াব, এই তাঁর একান্ত বিশ্বাস।

জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিবাহ কেন স্থির হয়েছিল, সে কথা আমি আজও ভেবে পাই নি। জো রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল ওখার পথে। দ্বারকায় যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় মামারা

উঠেছিলেন, সাহেবি পোষাকে জো রায় সেই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। অযাচিত ভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন, মামা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে।

গাড়িতেই জো রায়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একটা ফার্মের বড় অফিসার। হেড কোয়ার্টার্স বম্বেতে, কাজের এলাকা কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র। বিলেত ঘুরে এসে পিতৃদত্ত জনার্দন নাম জো হয়েছে, কথায় ও কাজে পুরোদস্তুর সাহেবিআনা। মিঠাপুরে তাঁর কাজ ছিল, কিন্তু নামতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গে ওখা গেলেন, ওখা থেকে বেট দ্বারকা। ফেরার পথেও তাঁর মিঠাপুরে নামা হল না। আমাদের সঙ্গে তিনিও সোমনাথে যেতেন। কিন্তু স্বাতির কথায় তা হল না। ভদ্রলোককে নেমে যেতেই হল।

জো রায়কে মামীর ভাল লেগেছিল। চুপি চুপি মামাকে বলেছিলেন : বেশ ছেলেটি, তাই না।

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন : হুঁ।

এতবড় চাকরি, অথচ অহঙ্কার নেই এতটুকু।

মামা এ কথার উত্তর দেন নি। কিন্তু মামী পরামর্শ দিয়েছিলেন : ওর ঠিকানাটা লিখে রাখ। ঐ সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

গাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পরে জো রায় বলেছিলেন যে সোমনাথ তাঁর আজও দেখা হয়নি। মামী বলেছিলেন : বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত দুটো কচলে জো রায় বলেছিলেন : ছি ছি, আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন : সত্যিই তো, তুমি তো আমাদের ছেলেরই মতো।

তারপরেই আমি মামীকে খুশী করবার জন্যে বলেছিলুম : এবারে আমি পাশের গাড়িতে যাই।

কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। বুঝতে

পেরেছিলুম সে অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : সোমনাথ আপনার পরে দেখলে চলবে না ?

মামী রুখে উঠেছিলেন : পরে কেন ?

কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে !

স্বাতির এই উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না। বরং আরও নম্র আরও মিষ্টি শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ব্যস্ত ভাবে জো রায় বলেছিলেন : সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এ দিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে গিয়েছিলেন পাশের গাড়িতে। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। সে দিন স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয়নি।

সোমনাথে আমি মূর্খের মতো ভেবেছিলুম যে জো রায়কে বুঝি তাড়িয়ে দিতে পেরেছি। মামীর ব্যবহারেই তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, পরে তা বুঝেছি। এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে রাজনীতিতে, সমাজ চেতনায় হয় নি। আজও ভারতের অস্থিতে মজ্জাতে পরাধীন সত্তার গ্লানি আছে লেগে। আজও আমরা মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি না, বিচার করি তার অর্থ সামর্থ্যে, তার সরকারী প্রতিপত্তিতে। এ দেশ আরও অনেক দিন চাঁদির পূজো করবে।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম মামার কথা ভেবে। জো রায়কে তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর কথাবার্তাতেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। জো রায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি কী করে রাজী হলেন! তবে কি স্বাতি নিজেই রাজী হল! সেও কি সম্ভব! দুনিয়ায় কী সম্ভব আর কী নয়, তা কি কেউ জানে!

জো রায়ের সঙ্গে যে বম্বেতে আবার দেখা হয়ে যাবে, সে কথা আমরা কেউই ভাবি নি। অপরাহ্ণে আমরা মালাবার হিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মামা মামী একটা বেঞ্চিতে বসলেন। স্বাতির সঙ্গে

আমি নেমে এলুম পাহাড়ের পূব দিকের একটা পথ ধরে। পছন্দ মতো একটা স্থান বেছে নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসলুম। মেরিন ড্রাইভ এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেলা শেষের স্তিমিত রৌদ্রে অর্ধচন্দ্রের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্র নয় তরঙ্গসঙ্কুল, স্থিরও নয়, ছলছল করে প্রাণের আবেগে উচ্ছল হয়ে আছে। এই সময় অন্ধকার নামবে, কিন্তু এ দৃশ্য একেবারে মুছে যাবে না। আলোর মালায় আরও রমণীয় হয়ে উঠবে।

সহাস্যে স্বাতি বলল তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে না তো!

আমিও হেসে বললুম অতীতের চর্চা করে কি লাভ!

নিজেকে হঠাৎ ধনী ভাবছ কেন?

ধন পেয়েছি বলে।

সে কি আজ নতুন পেয়েছ!

বললুম না।

তবে?

ভয় ছিল দস্যুতে কেড়ে নেবার।

আজ বুঝি সে ভয় আর নেই?

নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলার অবকাশ পেলুম না। অদূরে কোন পরিচিত মানুষের সন্ধান পেলুম। উপর থেকে নিচে নামছে। যাকে চেনা মানুষ ভাবছি, তাকে আড়াল করে আছে একটি পার্সি মেয়ে, তন্বী সুন্দরী। তার পায়ের ছন্দে আর মুখের হাসিতে একটা প্রাণবন্ত জীবনের ঘোষণা দেখছি। পুরুষটিকে চিনতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। যাকে সন্দেহ করেছিলুম, সেই জো রায়কে দেখেই নিঃসন্দেহ হলুম।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে তার দৃষ্টি অন্য ধারে। জো রায়কে সে বোধহয় দেখে নি, দেখলে এমন নির্বিকারে বসে থাকত না। কিন্তু তার পরের কথায় সন্দেহ জেগেছিল। সে বলেছিল: আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

আমি বলেছিলুম : আর ভাল লাগছে না বুঝি?

বাবা মা অপেক্ষা করছেন কি না, তাই বলছি।

অন্যত্র স্বাতি নিজে এ কথা ভাবে নি, আমাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে। তাইতেই প্রস্তাবটা কেমন বিসদৃশ মনে হল। বললুম : এমন জায়গা যদি ভাল না লাগে তো কোথায় লাগবে জানি নে।

স্বাতি বলল : এদিকেটার গুহা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : পৃথিবীটা কি তোমার ছোট হয়ে আসছে।

স্বাতি হেসে বলল : নিজের একটা জগৎ গড়বার চেষ্টা করছি সেখানে জনতা থাকবে না।

তুমি ছাড়া আর একজন থাকবে তো?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : ভেবে দেখব।

তাহলে আজই আমার আরজি পেশ করে রাখলুম।

স্বাতি এ কথার উত্তর দেয় নি, কিন্তু জো রায় আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। সেই পার্সি মেয়েকে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমাদের ঠিকানা নিয়ে বলেছিলেন : কাল সকাল বেলাতেই আপনাদের হোটেলে এসে জুটব। বম্বে দেখাবার ভার আমি নিলুম।

কিন্তু সকালে স্বাতি জো রায়ের জন্যে অপেক্ষা করে নি। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা সে ওলোট পালোট করে দিয়েছিল। সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠেছিল পুণার ট্রেনে।

তার পরের দিনও সে পালিয়ে ছিল। মামা মামীকে ক্লান্ত দেখে আমাকেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। জো রায়ের পাশে দাঁড়াতে আমাকে দেয় নি, সে নিজেও তার সামনে দাঁড়ায় নি। আমার মনে হয়েছিল যে এই ব্যবহারে তার ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। মালাবার হিলের পার্সি মেয়েটাকে সে নিশ্চয়ই দেখেছিল।

জো রায় যে নাছোড়বান্দা তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি জানতুম যে সকাল বেলায় হোটেলে আমাদের না দেখে তিনি দমবেন না, আবার আসবেন। যতবার ধরা না যায়, ততবার আসবেন। সোমনাথের পথে স্বাতি যে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল, সে কথা হয় তো ভুলেই গেছেন। মনে থাকলেও গায়ে কোন অপমান মেখে রাখেন নি। পুরুষকে ধরা দেবার জন্যই তো বারে বারে নারী তাকে ফিরিয়ে দেয়, প্রেমের পরীক্ষা হয় এই ফেরানোর খেলায়।

সত্যিই জো রায় আমাদের ধরে ফেলেছিলেন। স্বাতির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েও নিষ্কৃতি পাই নি। চৌপাটিতে বালির উপরে আমরা বসে ছিলুম। স্বাতিকে বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, বলল: সারাদিন আজ আমি এইখানেই শুয়ে থাকব।

ক্ষিদে পেলে?

উঠব না।

বালি তেতে উঠলে?

উঠব না।

পরক্ষণেই বলল: একটা কথা জানতে চাইলে তুমি রাগ করবে না?

বললুম: খুশী হব।

তবে তোমার ছেলেবেলার কথা বল।

আমার শৈশবের কথা কোন দিন কেউ জানতে চায় নি, স্বপ্নেও ভাবি নি যে কেউ কোন দিন তা জানতে চাইবে। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। তবু আমি অসঙ্কোচে সব কথা বলেছিলুম।

জো রায় আমাদের এইখানে আবিষ্কার করেছিলেন। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন: আপনারা এইখানে! আমি সমস্ত বোম্বাই শহর আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর তাঁরই নিমন্ত্রণে একটা বড় হোটেলে লাঞ্চ খেলুম, বোম্বাই শহর দেখলুম তাঁরই সঙ্গে। শুধু আমি আর স্বাতি নয়, মামা মামীও সঙ্গে ছিলেন।

জো রায়কে যতই দেখছিলুম, ততই আমার ভয় বাড়ছিল। এই ভয় আমার আগে ছিল না, এই ভয় আমার নতুন দেখা দিয়েছে। যার কিছু নেই, তার আবার হারাবার ভয় কি! আমি কি কিছু পেয়েছি যে হারাবার ভয় আজ নতুন জেগেছে! বুকের ভিতরে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা টনটন করে উঠেছিল।

আমার সম্বন্ধে স্বাতির দুর্বলতার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার বিরাগের ইঙ্গিত। গির্নারের পাহাড়ের উপরে উঠে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করেছিল: এমন হাল্কা ভাবে আর কতকাল কাটাবে?

বলেছিল: বড় অপমান বোধ হয়। আমি কি খেলার জিনিস, না বাজারের পণ্য!

সেই সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিল: তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না?

তারপর নিজেই বলেছিল: এ যুগের বিচারে তোমার সত্যিই কোন দাম নেই।

আমি বলেছিলুম: এ যুগ এক দিন বদলাবে, আর এতেই আমার সান্ত্বনা।

স্বাতির দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখেছিলুম। তাই তাকে বলেছিলুম: জান স্বাতি, স্বাধীনতা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। বুকের রক্ত ঢেলে আদায় করি নি বলেই স্বাধীনতার মর্ম আমরা বুঝি না। কিছুদিন যাক। চূড়ান্ত দুর্দশার ভিতর হাবুডুবু খেয়ে সবই আমরা বুঝতে পারব।

শান্ত গলায় স্বাতি বলেছিল: সেদিন আমি আর ঝগড়া করতে আসব না।

তারপরেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসি। বলেছিল: তুমি কী বোকা গোপালদা!

তার সেদিনের আচরণ আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে ছিল। তারপর মনে হয়েছিল, এ হেঁয়ালি নয়। এইটেই বুঝি তার সত্য রূপ। ছলনা সমস্ত নারীরই প্রকৃতি। স্বাতি তো এই প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নারীর খণ্ড রূপকেই সে একটা সম্পূর্ণতা লাভে সাহায্য করেছে। নারী মায়াবিনী চিরকাল।

তা না হলে যেদিন সে আমার অসহায় শৈশবের কথা শুনল, সে দিনই সে আমায় ফিরে যেতে বলবে কেন? জো রায় স্বাতিকে বলেছিলেন: আপনি বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস।

স্বাতি বলল: গোপালদার মতো নই।

তাই নাকি!

আজ গোপালদা এখানে, কাল শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে শুয়ে ঘুমচ্ছেন।

বলেন কী!

তাই না গোপালদা?

বলে আমার দিকে স্বাতি ফিরে তাকাল।

আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে। একটু আগে আমারও এই কথা মনে হয়েছে। আমি চলে গেলে মামী নিশ্চিন্ত হবেন, খুশী হবেন জো রায়। স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। এবারে বলে ফেললুম: সেই কথাই ভাবছি।

স্বাতি বলল: আজই ফিরবে?

আমি চমকে উঠেছিলুম। বুকের ভিতরটা বুঝি মুচড়ে উঠেছিল। কেন এমন হয়, সে কথা ভেবে দেখবার সময় পেলুম না। বললুম: আজই।

তারপর আবার সে সমস্ত গোলমাল করে দিল। ভিক্টোরিয়া

টার্মিনাস স্টেশনের জনবহুল প্ল্যাটফর্মে মামা মামী দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্তে আমি তাঁদের প্রণাম করলুম। স্বাতি আমার পাশে পাশে এগিয়ে এসে গাড়িতে তুলে দিল। তারপর প্রণাম করল আমার পায়ে হাত দিয়ে। সসঙ্কোচে আমি সরে দাঁড়িয়েছিলুম। মুখ তুলে স্বাতি একটু হাসল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গেল। বড় অসহায় দরিদ্র মনে হল নিজেকে।

ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে। গার্ডের বাঁশি বাজল। সেই সঙ্গে স্বাতির কথাও শুনতে পেলুম: নিজের ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জান না, তাই এমন ভয় পাও। তুমি তো আমায় কিনে নিয়েছ।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, স্বাতিও সরে দাঁড়িয়েছে, বিস্ময়ে আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অতীত আর বর্তমানে একটা কঠিন জট পাকিয়ে ভবিষ্যৎকে চেপে ধরতে চাইল। স্বাতির কথা আমি নিশ্চয়ই ভুল শুনি নি।

সেদিন মনে হয়েছিল যে আর আমার কোন ভয় নেই। জো রায়ের সঙ্গে সে যতেচ্ছ ঘুরে বেড়াক, তার মন আছে আমার মনে বাঁধা। জগতের সেরা সম্পদ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। হোক কথা, হোক কল্পনা, জীবনের চেয়ে স্বপ্নেই যে সুখ বেশি। সে সুখ আমি পেয়েছি। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে এসেছি।

এর পরে অনেক দিন তাদের খবর পাই নি। চিঠি লেখার অভ্যাস নেই স্বাতির, আমার কাছেও চিঠির প্রত্যাশা বেশি করে না। হঠাৎ মামার চিঠিতে স্বাতির বিয়ের খবর পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। জো রায়কে যে মামা দেখতে পারতেন না তা তাঁর কথা বার্তাতেই প্রকাশ পেয়েছে। কী করে তিনি এই বিয়েতে রাজী হলেন! তবে কী স্বাতির ইচ্ছাতেই এ বিয়ে হচ্ছে! না মামী জোর

করে রাজী করেছেন দুজনকে! এই ভেবে আমি বেশি আশ্চর্য হয়েছি যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে সামান্য আভাষও কেউ আমাকে দেন নি। স্বাতির কি একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল না! সে খেলা করছে কার সঙ্গে। আমার সঙ্গে, না তার নিজের সঙ্গে! জো রায়ের সম্বন্ধে তো তার মনের কথা আমি জানি। তবে কি সে তারই সঙ্গে খেলা করছে।

সহসা একবার গঙ্গার জল ছলছল করে উঠল। নৌকো আমাদের স্রোতের টানে পড়েছে। পারের কাছে থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আর একটুখানি এগোতে পারলে ওপারের কাছে এসে পড়ব। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাশীর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অপরূপ দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে আমি অতীতের কথা ভুলে গেলুম।

আকাশের সূর্য তখন সামনের ঘর বাড়ির পিছনে হারিয়ে গেছে।

১০

কাশী হিন্দুর পরম তীর্থ।

বেদে আমরা যে সব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ পাই, তার মধ্যে গৃৎসমদ দিবোদাস ধন্বন্তরি প্রভৃতি রাজর্ষিরও নাম পাই। দিবোদাস ও ধন্বন্তরি ছিলেন কাশীর রাজা।

অতঃ কাশয়োঽগ্নিনা দত্তং, যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।

শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে আমরা কাশী শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখি। সেকালে কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ও পবিত্র যজ্ঞভূমিরূপে পরিচিত ছিল।

কাশীর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে। কাশীর কোন রাজা অজাতশত্রু মহর্ষি গার্গ্যকে দুঃখ করে বলছেন: কী অপরিসীম ক্ষোভের বিষয় বলুন। জনক আমাদের জনক স্থানীয় বলে আমার প্রজারা এ রাজ্য ছেড়ে রাজর্ষি জনকের রাজ্য বিদেহে চলে যাচ্ছে। রাজর্ষি জনক যে বিদ্যার অনুরাগী ও বিদ্বজ্জনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা আমরা জানি, কিন্তু কাশীর রাজা অজাতশত্রুও যে বিদ্বানের সমাদর করতেন তাতে সন্দেহ নেই। তাই তিনি নিজের প্রজা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তি।

কর্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে। —জীব এখানে কর্মক্ষয় করে মুক্তি লাভে সমর্থ হয় বলেই এই স্থানের নাম কাশী। পৌরাণিকেরা বলেন যে পুরূরবার বংশে রাজা কাশ, কাশের পুত্র কাশ্য বা কাশী রাজ। ভাগবত মতে কাশ্যের পুত্র কাশী। সম্ভবত এই কাশীরাজের নামেই রাজ্যের নাম হয়েছিল কাশী।

কিন্তু কাশী ছিল রাজ্যের নাম, নগরের নাম ছিল কাশীপুরী বা বারাণসী। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে আমরা এই দুটি নামই দেখতে পাই। রামায়ণে আমরা দেখি যে কাশী রাজ্য প্রতিষ্ঠান নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান প্রয়াগের নামই ছিল প্রতিষ্ঠান নগর। মৎস্যপুরাণে কাশীক্ষেত্রের বিস্তৃতি পাওয়া যায় পূর্ব-পশ্চিমে দুই যোজন ও উত্তর-দক্ষিণে অর্ধ যোজন। শিবপুরাণের মতে বারাণসী পঞ্চক্রোশী, প্রাসাদাদি উপকরণ-শোভিত সুন্দর নগরী। জগতে যখন কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নি, কাশী নামের এই পুণ্যক্ষেত্র তখনও ছিল। প্রকৃতি-পুরুষ যখন তপস্যার জন্যে একটি স্থান অন্বেষণ করছিলেন, নির্গুণ শিব তখন তার ত্রিশূলের অগ্রভাগে এই পঞ্চকোশী কাশীকে ধারণ করে রেখেছিলেন। এ যে কতকাল আগের কথা, কে তা বলতে পারে!

বারাণসীর কথা আছে বামন পুরাণে। ভগবান বলছেন যে, তাঁর অংশসম্ভূত এক অব্যয়পুরুষ পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে নিত্য যোগশায়ী আছেন। তার দক্ষিণপদ থেকে বরণা নদী প্রবাহিত হচ্ছে, আর অসি নদীর উৎস তাঁর বাম পদে। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রেই তিনি অবস্থান করছেন। আর তারই নিকটে বারাণসী। বারাণসীর সমৃদ্ধির কথাও আছে বামন পুরাণে।

কাশীখণ্ডে বারাণসীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থের মতে বরণা ও অসির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলেই নগরীর বারাণসী নাম।—

অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্রবক্ষা কৃতৌ কৃতে॥
বরণাসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥

কাশীক্ষেত্রকে রক্ষা করবার জন্যই অসি ও বরণা নদীর জন্ম। তারই সঙ্গম হয়ে কাশীকে বারাণসী নামে বিখ্যাত করেছে।

জাবালোপনিষদে অসি নদীকে নাশী বলা হয়েছে। সর্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি। সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ

নাশ করে বলে নাশী নাম। আর সর্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষ নিবারণ করে বলেই নদীর নাম বরণা হয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণে আবার এক কাশীরাজ বব-ারের বিবরণ আছে। কাশীতে তিনি বারাণসী নামে এক দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন যে, এই ববণার প্রতিষ্ঠিত দেবীব নামে কাশীর বারাণসী নাম হয়েছে।

মাঝি একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল : কোন্ ঘাটে নামবে?

আশ্চর্য হয়ে আমি দেখলুম যে এই প্রশ্ন করবাব সত্যিই সময় হয়েছে। বেলাশেষের রঙীন আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে বারাণসীকে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম তীরে যতদূর দেখা যাচ্ছে তত দূব দেখছি একটার পর আর একটা ঘাট পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। দুর্গের মতো উঁচু ঘরবাড়ি মাথা তুলেছে ঘাটের উপর থেকেই। নানা আকার ও আকৃতির মন্দিরের চূড়ো এমনভাবে উঠেছে যে, কোন্‌টা মন্দির আব কোন্‌টা বাসের গৃহ তাও বোঝা যাচ্ছে না। নৌকোও নানা আকার ও আকৃতিব, ঘাটের কাছে বাঁধা আছে। তারপরেই বড় বড় ছাতাব চারিধারে যাত্রীসাধারণের জটলা। এখন স্নানের সময় নয়, তবু দু-চারজন স্নান করছে। এখন বেড়াবারও সময় হয় নি, তবু কয়েকজন বেড়াচ্ছে। এখনও কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ আরম্ভ হয় নি, তবু মানুষের কলরব শুনতে পাচ্ছি। একটা কথা শুনেছিলুম শৈশবে যে পৃথিবী জাগবার আগেই গঙ্গা জাগে। এখন দেখছি যে, গঙ্গা কখনও বিশ্রাম করে না।

যে যাত্রীটিকে মাঝি জিজ্ঞাসা করেছিল কোথায় নামবে, সে বলল : কাঁহি উতার দেও।

তার কতকটা নির্লিপ্ত ভাব আমার মতো, যেন গন্তব্যস্থানের কোন ঠিক নেই। বিরক্তভাবে একজন যাত্রী বলল : চল দশাশ্বমেধ।

দশাশ্বমেধ ঘাটের নাম আমি শুনেছি। এই ঘাটই বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। বিশ্বনাথের মন্দিরও বোধ হয় এই ঘাটের কাছে। ভাবলুম, আমিও এই ঘাটে নামব।

কিন্তু তারপর!

তার পরের কথা ভাবতে গিয়ে খানিকটা দুর্ভাবনা জাগল। এই অপরিচিত শহরে কোথায় গিয়ে উঠব জানি নে। হোটেলে ওঠার কথা ভাবলে ভয় করে। বড় দিনের সময় পুরীতে সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোন হোটেলে উঠলে এইখান থেকেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

ধর্মশালার কথাও আমার মনে এল। দু তিন দিন কোনমতে সেখানে কাটানো যায়। পয়সা বেশি লাগে না বলে নানারকমের অসুবিধাও মনে নেওয়া যায়। কিন্তু এই ঘাট থেকে ধর্মশালা কত দূর, আমার তা জানা নেই। নিশ্চয়ই এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে।

আর একটি থাকবার জায়গা আছে। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বিনি পয়সায় থাকা যায়। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ডর্মিটরি আছে বলে শুনেছি। একটা লম্বা ঘরে পাশাপাশি অনেকগুলি খাট। ভাড়া মাথা পিছু দেড় টাকা। কিন্তু স্টেশনে থাকতে হলে রেলের লোকেরা টিকিট দেখতে চায়।

কাঁধের উপরে হাত দিয়ে দেখলুম যে ঝোলাটি আমার ঠিক আছে। নৌকো এসে ঘাটের কাছে ঠেকেছে। এইবারে আমাকে নামতে হবে। আশে পাশের নৌকোর ভিড় বাঁচিয়ে মানুষজনের ফাঁক দিয়ে আমি নেমে পড়লুম, তারপর মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগলুম।

ঘাটের উপরে রোদ আর নেই, বড় বড় ঘরবাড়ির পিছনে সূর্য হয়েছে অন্তর্হিত। বড় গাছটার ছায়ায় লোকজন জটলা করছে, যাত্রীরা আনাগোনা করছে আবারে। আমি কোন দিকে তাকালুম না, সিঁড়ির উপরে পৌঁছে সোজা এগিয়ে গেলুম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পথ ডান দিকে হেলে বড় রাস্তার দিকে গেছে। বিশ্বনাথ গলি ঐ দিকেই। ঐ গলির কাছাকাছি আসতেই ব্রাহ্মণেরা আমার পিছু নিল। তারা ধরেই নিয়েছে যে আমি বিশ্বনাথ দর্শনে এসেছি, কাজেই তাদের অনুসরণ না করে আমার আর অন্য গতি নেই।

তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আমি বললুম : না, আমি এখন বিশ্বনাথ দর্শন করব না।

একজন বলল : মন্দিরে এখন ভিড় কম আছে, দর্শনের খুব সুবিধে।

যে গলির মধ্যে তারা আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, সেইটেই যে বিশ্বনাথ গলি তাতে আমার সন্দেহ রইল না। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আমি চারিদিকে তাকালুম। তারপর চকিতে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললুম। পাশেই একটি খাবারের দোকানে চা তৈরি হচ্ছে। আমি আর দেরি না করে সেই খাবারের দোকানেই ঢুকে পড়লুম।

দোকানটি তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। ছোট ছোট কাঠের টেবিল আর বসবার চৌকি। ছোট ছেলেরা ফরমাস মতো জিনিস এনে দিচ্ছে। আমি বসে পড়তেই একজন আমার কাছেও এল। আমার কিছু খাবার ইচ্ছা ছিল না, আমি শুধু চা চাইলুম। আর বাহিরের দিকে চেয়ে দেখলুম যে ব্রাহ্মণেরা বিদায় নিয়েছে।

এখানে আজ আমার বড় অসহায় মনে হচ্ছে। এমন করে একা আমি কখনও বেড়াতে বার হই নি। পুরীতে তো পালিয়ে গিয়েছিলুম আত্মগোপনের জন্যে। তা না হলে দু পাঁচ জনে মিলে আমরা দেশ দেখতে বেরুই। নতুন জায়গার নানা সমস্যার সমাধান তাহলে একজনকে করতে হয় না। আমোদের সঙ্গে অস্বাচ্ছন্দ্যটুকুও সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়া যায়।

এবারেও আমি কলকাতা ছেড়ে একা বেরুই নি। বন্ধু মনোরঞ্জনের সঙ্গে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলুম। শীলার অনুরোধে পাটনায় নেমে

না পড়লে আজ আমি এমন নিঃসঙ্গ হতুম না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় তপস্যা করা যায়, শিল্প ও সাহিত্যের সাধনাও করা চলে। কিন্তু নতুন দেশ দেখার উৎসাহ পাওয়া যায় না। ভ্রমণে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন অপরিহার্য।

কতক্ষণ আমি এই সব কথা ভাবছিলুম জানি নে। চা আসছিল না দেখে তাড়া দিলুম। আমার কথা বোধহয় তারা ভুলেই গিয়েছিল। ব্যস্ত ছিল ভালমন্দ খাইয়েদের নিয়ে। নিতান্ত অবহেলায় এবারে এক পেয়ালা চা এনে নামিয়ে দিল।

আমি সেই চা খেয়ে চায়ের দাম দিয়ে যখন দোকান থেকে নামছিলুম, তখন অতর্কিতে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলুম। বাবা বিশ্বনাথকে সামনে দেখলেও বোধহয় এমন চমকাতুম না। মনোরঞ্জন কোথায় লুকিয়ে ছিল জানি নে, ফুটপাথে পা দিতেই সে আমার হাত চেপে ধরল। আর সেই মুহূর্তেই একটি বালক হেসে উঠল। উচ্চ কণ্ঠে।

বালকটিকে আমার চেনা চেনা মনে হল। আর এদের সঙ্গে আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে কোথায় দেখেছি সহসা মনে করতে পারলুম না। কিন্তু আমাকে দেখে যে তিনি খুশী হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম।

মনোরঞ্জন একটা স্বগতোক্তি করল: ডেঞ্জারাস ক্রীচার।

বলে আমার হাত ধরে সামনের দিকে টানল।

ভদ্রলোক বললেন: না না, অমন করে বলবেন না। নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে গিয়েছিলেন।

এবারে আমি ভদ্রলোককে চিনে ফেলেছি। তাই একটা নমস্কার করে বললুম: আমাকে ক্ষমা করবেন।

তারপরেই বালকটির দিকে চেয়ে বললুম: আমাকে চিনতে পারছ পাঁচু?

সগৌরবে পাঁচু বলল: আমিই তো সবাইকে ডেকে আনলাম।

বলে চারি ধারটা একবার দেখে নিল।

তারাপদবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : সাবিত্রী কোথায় ?

পাঁচু বলল : এই দোকানটা দেখিয়ে দিয়েই তো দিদি পালিয়ে গেল।

ঘটনাটা আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে। তাই আরও কিছু জানবার উদ্দেশ্যে পাঁচুকে বললুম : কে আগে আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ?

পাঁচু বলল না যে সে আগে দেখেছে, আবার এ কথাও বলল না যে সে পরে দেখেছে। বলল : দিদি আপনাকে চিনতে পারে নি। আপনাকে নৌকোর ওপরে দেখে আমাকে বলেছিল, দেখ তো পাঁচু, চেনা লোক বলে মনে হচ্ছে না! আমি তো একবার তাকিয়েই আপনাকে চিনে ফেললাম, আর দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনলাম সবাইকে।

বুঝতে আমার অসুবিধা হল না যে পাঁচুকে পাঠিয়ে দিয়ে সাবিত্রী আমার উপরে নজর রেখেছিল। তারপর আমাকে দেখিয়ে দিয়েই সে নিজে পালিয়ে গেছে। বললুম : গঙ্গার ঘাটে তোমরা কী করছিলে ?

পাঁচু ভয়ে ভয়ে তাকাল তার বাবার দিকে, তারপর আমাকে বলল : দিদি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

পুরীতে এই পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কয়েক মাস আগে। চন্দননগরে এঁরা মনোরঞ্জনের প্রতিবেশী। স্বাতীর বিয়ের খবর পেয়ে আমি পালিয়ে পুরী যাচ্ছি শুনে সে বলেছিল : আমাদের পাড়ার মুখুজ্জেরাও পুরী যাচ্ছে। তাদের মেয়েটি ভাল।

সে আরও বলেছিল : সমস্যার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া পুরুষের ধর্ম নয়।

কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি আমি করতে পারি!

মনোরঞ্জন বলেছিল : চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

আমি বলেছিলুম : এ থিওরির কথা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তুমি তোমার ঐ কাঠের চেয়ার থেকে উঠে ভিতরের গদির চেয়ারে বসতে পার না। হাজার বা লাখে একজন পারে কিনা সন্দেহ। যে পারে সে নিশ্চয়ই তার চেষ্টা দিয়ে পাবে না। তুমি তো ভাগ্য গণনা কর, ভাগ্যে তোমার বিশ্বাস নেই?

মনোরঞ্জন বলেছিল : ভাগ্যে বিশ্বাস করি বলেই হাত গুটিয়ে বসে থাকব, আজকের যুগে এ যুক্তি অচল।

সমাজের দাঁড়ি-পাল্লায় এ যুগে অর্থেরই যে ওজন বেশি। সিঁদ কাটব, না ভিক্ষে চাইব?

মনোরঞ্জন বলেছিল : জবরদস্তি দখল করতে পার না?

নিষ্প্রাণ কোন বস্তু হলে হয়তো তাই করতুম।

প্রাণ থাকলে তো এত দিনে সাড়া পেতে।

এ কথায় আমি চমকে উঠেছিলুম। সরাসরি প্রশ্ন করে স্বাতির মনের কথা আমি আজও জেনে নিই নি। তাতে হয়তো হ্যাংলামির পরিচয়ই দেওয়া হত, কিংবা সে ভাবত আমি তার কৃপাপ্রার্থী।

মনোরঞ্জন আমাকে নীরব দেখে বলল : মনটা এবারে স্থির করে ফেল। হয় তুমি পুরুষের মতো তোমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত কর, নয় তোমার নায়িকা বদল করে নিশ্চিন্ত হও।

কিন্তু তাতেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে! আবার হয়তো প্রয়োজন হবে নায়িকা বদলাবার।

তবু লাভ আছে। স্রোত তোমার আটকে গেল না, বইতে লাগল। সমুদ্রের সন্ধান না থাক, হারিয়ে যাবার দুঃখকে এড়ানো যাবে।

এই প্রসঙ্গেই সে বলেছিল : আমাদের পাড়ার মুখুজ্জেরাও পুরী যাচ্ছে। তাদের মেয়েটি ভাল।

এর পরে আমি আর কোন কথা বলি নি।

নিঃশব্দে আমি মনোরঞ্জনের সঙ্গে চলছিলুম, আর এই পরিবারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা আমার মনে পড়ছিল।

সেদিন আমি সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন জায়গায় বসেছিলুম। সামনে অকূল সমুদ্র, দাম্ভিক উদ্ধত, সারাক্ষণ আপনার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। ঢেউএর আঘাতে পৃথিবীকে নিপীড়িত করছে, আর গম্ভীর গর্জনে ঘোষণা করছে আপনার জয়ধ্বনি। মনে হচ্ছিল যে এই গর্বিত সমুদ্রও আমাকে বিদ্রূপ করছে।

এক সময় আমি নিজের কথা ভুলে গেলুম, নিজের ভাবনা ও বেদনার কথা। বৃহতের সামনে এসে মানুষ বোধহয় ক্ষুদ্রতাকে ভুলতে পারে সহজে।

সমুদ্রের জলে যে আমার পায়ের চটি ভিজে যাচ্ছিল, সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথায় আমি চমকে উঠলুম। পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন: আপনার কাপড় যে ভিজে যাচ্ছে।

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলুম: সমুদ্র এত বড় হলে কী হবে, আমার মতো ছোটর সঙ্গেও খেলা করতে ভালবাসে।

ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসে বললেন: বেশ বলেছেন কথাটা।

বললুম: মানুষ হলে বোধহয় এমন করত না। নিজের সম্মানের জন্যেই একটু দূরত্ব বজায় রাখত।

ভদ্রলোক বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: আপনি খুব অদ্ভুত কথা বলতে পারেন।

এর পরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন: আপনি কি উতোর পাড়ায় থাকেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম: আপনি জানলেন কী করে!

গর্বিত ভাবে ভদ্রলোক বলেছিলেন: আপনার নাম তো গোপালবাবু।

ঠিক কথা। কিন্তু—

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন: আরে শুনছ, তোমরা চলে যাচ্ছ কেন।

তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকটা তফাতে। সঙ্গে তাঁর পুত্র ও কন্যা। কন্যাটি বড়। ভদ্রলোক আমাকে যখন তাঁর হোটেলে গিয়ে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন, আমার মন তখন এই পরিবারকে আবিষ্কারের চেষ্টায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। চলতে চলতেই বললুম: আপনাদের বাড়ি কি চন্দননগরে?

তিনি হ্যাঁ বলতেই আমি বললুম. মিস্টার মুখার্জি আপনার নাম।

ভদ্রলোক বললেন: তারাপদ মুখুজ্জে।

হোটেলে পৌঁছে তিনি বললেন: মনোরঞ্জনবাবুর গণনা খুবই ভাল। আমাকে বলেছিলেন যে লক্ষ লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে বার করা শক্ত হবে না।

কী করে?

সমুদ্রের দিকে চেয়ে আপনি বালির ওপরে বসে থাকবেন। ঢেউএর জলে জামা কাপড় ভিজে গেলেও আপনার মন সেদিকে যাবে না। এখন তাঁর গণনা একেবারে নির্ভুল দেখছি।

পাঁচু তাঁদের ছেলের নাম আর মেয়ের নাম সাবিত্রী। তারাপদ বাবু বলেছিলেন: সাবিত্রী খুব ভাল মেয়ে।

আর আমি ভয় পেয়েছিলুম এই কথা শুনে। বলেছিলুম: মনোরঞ্জনের গণনার প্রশংসা আমি আর করি না।

কেন?

বলেছিল, এই চাকরিতেই আমার উন্নতি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকতেই তো পারলুম না।

বিস্ফারিত চোখে ভদ্রলোক বলেছিলেন: চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি!

বলেছিলুম: ওরাই ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বললেন: বুঝতে পেরেছি, অন্যত্র কোন ভাল চাকরি পেয়েছেন।

তা নয়।

তবে নিশ্চয়ই ব্যবসায় নামবার ইচ্ছে।

মূলধন নেই।

তবে কি পুরোপুরি সাহিত্য করতে চান?

তাতে শুনেছি একজনের পেটই ভরে না।

চিন্তিত ভাবে মিসেস মুখার্জি বলেছিলেন: তবে?

আমি বলেছিলুম: সমুদ্রের ধারে বসে সেই কথাই তো ভাবি।

ভদ্রলোক বলেছিলেন: না না, আপনি বোধহয় অকারণে এসব কথা ভাবছেন। মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন, আপনার উন্নতির দিন আসছে। তখন আপনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন।

হাসতে হাসতেই আমি বলে এসেছিলুম: মনোরঞ্জন আজকাল বাজে কথা বেশি বলে।

মুখার্জি দম্পতি সেদিন হাসতে পারেন নি। তাঁদের মুখের হাসি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। আর নিজের সাফল্যে আমি আরও একবার হেসেছিলুম।

পথ চলতে চলতে মনোরঞ্জন আমার হাত ধরে টানল, বলল: দাঁড়াও। এই ধর্মশালায় আমরা উঠেছি।

এবারে আমি বন্দী হয়েছি শক্ত লোকের হাতে।



ধর্মশালার একটা ঘরে দেখা হল সাবিত্রী ও তার মায়ের সঙ্গে। তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বারান্দায় আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে মিসেস মুখার্জি দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে একটা নমস্কার করলুম।

প্রতিনমস্কার করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কেমন আছেন?

আমি বললুম: ভাল।

তারাপদ বাবু বললেন: সেদিন ট্রেনে আপনাকে দেখতে না পেয়ে কী দুর্ভাবনাই যে হয়েছিল। একজন যাত্রী আপনাকে পাটনায় নামতে দেখেছিলেন বললেন, কিন্তু তাঁর কথা আমাদের বিশ্বাস হয় নি।

মিসেস মুখার্জি বললেন: পুরীতেও আপনি এইরকম করেছিলেন। কবে যে পালিয়ে গেলেন আমরা তা জানতেও পারি নি।

মনোরঞ্জন এ সব কথায় যোগ দিল না, বলল: ভাল করে একটু চা খাওয়ান বৌদি, আমরা পাশের ঘরে বসছি।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখতে পেলুম যে এই ধর্মশালায় দুটি ঘর তাঁরা দখল করেছেন। মেয়েরা এঘরে নেই, একটি মাত্র বিছানা এখন গোটানো আছে। সেইটে বিছিয়ে দিয়ে মনোরঞ্জন বলল: বোস।

আমি জানতুম যে মনোরঞ্জন এখন আমার কাছে কোন কাজের জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে না, যা বলবার আছে তা বলবে একান্তে। অনেক কঠিন অপ্রিয় কথাও যে বলবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন সে আমার কাঁধ থেকে ঝোলাটা সংগ্রহ করে দেওয়ালের একটা

হুকে টাঙিয়ে রাখল। বলল: তোমার অভাবে কাশী দেখা আমাদের জমছে না।

কেন?

এখানকার পাণ্ডারা বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা জ্ঞানবাপী দেখাতে পারে, কিন্তু কাশী দেখাতে পারে না। গত দুতিন দিনে আমরা ঠাকুর দেবতাই দেখেছি, কাশী দেখি নি।

তারাপদবাবু বললেন: কথাটা কি, কাশীর সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের এখনও হয় নি।

আমি বললুম: ভাল করে দেখলেই একটা ধারণা হবে। হবে না পাঁচু?

বলে আমি পাঁচুর দিকে তাকালুম।

পাঁচু সগৌরবে বলল: এরই মধ্যে আমি অনেক রাস্তা চিনে ফেলেছি।

সত্যি নাকি!

সোৎসাহে পাঁচু বলল: একা আমি গঙ্গার ঘাটে যেতে পারি, বিশ্বনাথ গলি যেতে পারি, আর—

আর কোথায়?

পাঁচু এবারে মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: আর কোথায় যেতে পারি কাকাবাবু?

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

আরও কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী এল দুখানা রেকাবি হাতে, মনোরঞ্জন ও আমার সামনে রাখল সে দুখানা। গরম ফুলকো লুচি আর আলুর ছেঁচ্‌কি। জিজ্ঞাসা করল: তুমি খাবে বাবা?

তারাপদ বাবু বলে উঠলেন: না মা, আমাকে নয়। দুপুরের খাবারই আমার এখনও হজম হয় নি। আমাকে শুধু এক কাপ চা।

আয় পাঁচু।

বলে সাবিত্রী বেরিয়ে গেল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে আরও বড় হয়েছে; আরও লাজুক হয়েছে যেন। মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইল না, নিঃশব্দে শুধু তার কর্তব্য করে গেল।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মিসেস মুখার্জি নিজে এলেন। আমাদের সঙ্গে নিজেও চা খেতে বসলেন। বললেন: সেবারে সমুদ্রের ধারে আপনাকে আর দেখতে না পেয়ে আমরা আপনার হোটেলে গিয়েছিলুন খোঁজ করতে। হোটেলের ম্যানেজার বললেন যে আপনি কোন্ বোর্ডারের ভয়ে নাকি পালিয়ে গেছেন।

আমি বললুম না যে পালিয়ে থাকার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল বলেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম। বললুম: আর দেরি করলে চাকরিটা আমার থাকত না।

সহাস্যে মিসেস মুখার্জি বললেন: আপনি তো আমাদের চাকরি গেছে বলেই ভয় দেখিয়েছিলেন।

আমার চাকরি না থাকলে ভয়টা আমারই, আর কারও নয়। আমার চাকরি গেলে সংসারে কারও ভাবনা হবে বলেও আমার মনে হয় না। কিন্তু এই অপ্রিয় উত্তর না দিয়ে আমি মনোরঞ্জনের দিকে তাকালুম।

সে বলল: কোম্পানি ওকে অনেক বার সতর্ক করেছে। প্রতি-বারেই বলে, এর পরের বারে ঠিক ছাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ছাড়িয়ে দিলে কি ওর মতো আর কাউকে পাবে!

তারাপদ বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন: তা বটে।

এ প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে আমি বললুম: আপনারা কি বরাবর ট্রেনেই এলেন, না মোগলসরাইএ নেমে বাসে এলেন এখানে?

উত্তর দিল মনোরঞ্জন, বলল: ট্রেনে এসে ঠকেছি। সময় ও পয়সা দুইই বেশি লেগেছে।

তারপরে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। মোগলসরাই থেকে কাশীর

দূরত্ব মাইল দশেক। গঙ্গাব এপার আর ওপার। পাঞ্জাব মেলে বসে তারা ভেবেছিল যে দশ মিনিটেই পৌঁছে যাবে, কিন্তু মোগলসরাইতেই ট্রেন আধঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে রইল। তারপবে পুল পেরিয়ে দাঁড়াল কাশী স্টেশনে। বেশিক্ষণ নয়, মিনিট ছয়েক। সেখানে ছোট বড় দুলাইনেব গাড়িই আসে। কিন্তু সাধারণ যাত্রীরা কাশীতে না নেমে বেনাবস ক্যাণ্টন্মেট স্টেশনে নামে। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সয় গোধূলিয়া।

মনোরঞ্জন বলল : এক ঝাঁক মৌমাছিব মতো বিক্সওয়ালাবা তোমাকে ছেঁকে ধববে। তাবপব দবাদবি কর। একা হলে আট দশ আনায় বফা হবে, কিন্তু সঙ্গে লটবহব থাকলে এক টাকাব কম কথাই কইবে না। অথচ মোগলসবাইতে বাস ধর। মাথা পিছু পঞ্চান্ন পয়সায় গোধূলিয়া, সময়ও লাগবে এক ঘণ্টা। তাতে ট্রেন ভাড়াও বাঁচল, সময়ও কম লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আজ তোমাদেব প্রোগ্রাম কী?

মনোবঞ্জন বলল : বৌদি আজ বাবা বিশ্বনাথের আরতি দেখবেন।

পাঁচু বলে উঠল : এখন আমরা আপনার কাছে গল্প শুনব। কাকাবাবু বলেছেন যে আপনি খুব ভাল গল্প বলতে পাবেন।

মনোরঞ্জন বলল : এখনই বের হচ্ছি না, বল না কিছু। রামায়ণ মহাভারতে কাশীব কী পবিচয় আছে, ইতিহাসে কী পড়েছ—

তারাপদ বাবু ও তাঁব স্ত্রী সাগ্রহে আমাব মুখের দিকে তাকালেন। সাবিত্রীও একবাব মুখ তুলে তখনি নামিয়ে নিল। আর পাঁচু বলল : বলুন না গল্প।

এবারে এই বিরক্তিকর কাজটি করতে হবে না বলে ভেবেছিলুম। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় রইল না। কিছু আমাকে বলতেই হল।

কাশীর উল্লেখ আছে রামায়ণের নানা স্থানে। রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় কাশীর রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। অযোধ্যাপতির কুলগুরু বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, সৌম্য শান্ত

প্রিয়বাদী দেবতুল্য চরিত্রের কাশীরাজ ও অন্যান্য রাজাকে তুমি সৎকার করে নিজে এখানে নিয়ে এস। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে কাশীরাজ তখন দশরথের মিত্র ছিলেন। রামের বনবাসের পরেও এই মিত্রতা নষ্ট হয় নি। রাবণ বধের পরে যখন অযোধ্যায় তাঁর রাজ্যাভিষেক হচ্ছে, তখনও কাশীরাজ এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রাজা প্রতর্দন তখন কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁকে বিদায় দেবার সময় রামচন্দ্র তাকে আলিঙ্গন করে বলছেন, আপনি যে আমার ভাই ভরতকে যুদ্ধে সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাতে আমার প্রতি আপনার পরমপ্রীতি ও মিত্রতা প্রকাশ পেয়েছে। যে বারাণসী আপনি সুন্দর প্রাকার ও তোরণে সুরক্ষিত রেখেছেন, সেখানে আপনি এখন ফিরে যেতে পারেন।

প্রয়াগ বা প্রতিষ্ঠান নগর পর্যন্ত যে কাশীরাজ্য বিস্তৃত ছিল, তার বিবরণও রামায়ণে আছে। সেখানে দেখি যে মহাযশা পুরু কাশীরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর প্রতিষ্ঠানে রাজ্য-শাসন করেছিলেন।

মহাভারতেও আমরা কাশীরাজ্যের উল্লেখ পাই। কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা ছিলেন অপ্সরার মতো সুন্দর। রাজা তাদের জন্য স্বয়ংবরের আয়োজন করেছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজ-পরিবারের সঙ্গে তার মিত্রতা নিশ্চয়ই ছিল না, তাই মাতা সত্যবতীর আদেশে ভীষ্ম এই তিন কন্যাকে তাঁর ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য সবলে হরণ করেন। তারপরে যখন তিনি শুনলেন যে মনে মনে অম্বা শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন, তখন তিনি সসম্মানে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে হরণ করেছেন বলে শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। ভীষ্মকে বরণ করতে অম্বা রাজী ছিলেন, কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকবেন বলে ভীষ্ম তাঁর পিতা শান্তনুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বলে তিনিও অম্বাকে বিবাহ করতে পারলেন না। ক্ষোভে দুঃখে অম্বা আগুনে প্রবেশ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে, সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এই গল্প শুনছে। পাঁচুও আছে আমার দিকে চেয়ে। বললুম: মহাভারতের গল্প তোমাব মনে নেই? বিচিত্রবীর্যেব সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অম্বিকা ও অম্বালিকাব। অম্বিকার ছেলেব নাম ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু অম্বালিকার ছেলে।

এদের জন্ম যে বিচিত্রবীর্যেব মৃত্যুর পবে, সে কথা আব বললুম না, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে এঁদের জনক সে কথাও গোপন কবলুম। সে যুগে প্রচলিত সামাজিক রীতিকে অসম্মান কবাব কোন কারণ ঘটে নি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কাশীব কথা আছে। তাতে দেখি যে কাশীরাজেব বন্ধু করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক কৃষ্ণেব বেশ ধাবণ কবে নিজেকে বাসুদেব বলে প্রচাব করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণকে দ্বারকায় বলে পাঠালেন যে তিনিই আসল বাসুদেব এবং দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণকে তাঁব ছদ্মবেশ ত্যাগ করতে হবে। এই আদেশ অমান্য করলে যুদ্ধ অনিবার্য। পৌণ্ড্রকেব দূতকে কৃষ্ণ বললেন, বেশ, আমি নিজে গিয়ে এর বিহিত করছি।

পৌণ্ড্রক তখন কাশীতে ছিলেন বন্ধুর কাছে। কৃষ্ণ এসে কাশী আক্রমণ করলেন। অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দুই বন্ধু বেরলেন যুদ্ধ করতে। প্রবল যুদ্ধ হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার হল পৌণ্ড্রকেব। চক্র দিয়ে কৃষ্ণ তাঁর হাতী ঘোড়া রথ ও সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস করে তাঁব মাথাও কাটলেন। কাশীরাজও এই যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। কৃষ্ণ তাঁরও মাথা কেটে কাশীপুরীর দ্বারে নিক্ষেপ করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

কিন্তু বিবাদ এইখানেই মিটল না। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য শিবের আরাধনা করলেন। শিব তাঁকে বললেন, দক্ষিণ নামে যজ্ঞাগ্নির অভিচার-বিধানে পুজো কর, অব্রহ্মণ্যের প্রতি প্রযুক্ত হলে সেই আগুন তোমার বাসনা পূর্ণ করবে।

সুদক্ষিণ সেই কাজই করলেন। ঋত্বিকদের কাজ শেষ হতেই আগুনের লেলিহান শিখা দ্বারকার দিকে ছুটল। ভয় পেল দ্বারকাবাসী। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করলেন। চক্র সেই অগ্নিকে কাশীতে ফিরিয়ে আনল, দগ্ধ হল সমস্ত কাশীপুরী। রাজা সুদক্ষিণ ও তাঁর ঋত্বিকেরাও ধ্বংস হয়ে গেলেন।

পরম বিস্ময়ে পাঁচু প্রশ্ন করল: সুদর্শন চক্রের কী হল?

হেসে বললুম: চক্র তার কাজ শেষ করে কৃষ্ণের কাছে ফিরে গেল।

রাজা দিবোদাসের একটি কাহিনী আমার মনে পড়ল। স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে এই কাহিনী পড়েছিলুম। রামচন্দ্রের সময়ে কাশীরাজ ছিলেন প্রতর্দন, তাঁরই পিতার নাম দিবোদাস। অবশ্য ঋগ্বেদেও আমরা এক কাশীরাজ দিবোদাসের নাম পাই। ব্রহ্মার কথায় দেবাদিদেব মহাদেব কাশী পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন মন্দর পর্বতে। সমস্ত দেবতাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কাশীতে তখন রাজা দিবোদাসের শাসন। ধার্মিক রাজা, তপস্যার প্রভাবে মহা বলী। মন্দর পর্বতে মহাদেবের ভাল লাগছিল না, অথচ দিবোদাসকে না সরালে কাশীতে ফেরার উপায় নেই। কিন্তু কে তাড়াবে দিবোদাসকে?

মহাদেব প্রথমে চৌষট্টি যোগিনীকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়ে মণিকর্ণিকার সামনে রয়ে গেলেন। তারপরে এলেন সূর্য। কাশীর মায়ায় সূর্যও বন্দী হলেন। এর পরে মহাদেব গণধরদের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরাও কিছু করতে না পেরে কাশীতেই বসবাস করতে লাগলেন। তারপরে গণেশ এলেন বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশে। প্রথমে পুরবাসীদের বিশ্বাসভাজন হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ পেলেন। সকলের শেষে এলেন রাজার কাছে। গণনায় সন্তুষ্ট করে রাজাকে বললেন যে, উত্তর দেশ থেকে যে ব্রাহ্মণ আসছেন, তিনি আপনার সিদ্ধির উপায় বলবেন।

এ দিকে গণেশের দেরি দেখে মহাদেব বিষ্ণুকে পাঠালেন। বাজা দিবোদাসের তখন বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে দেখে তিনি তাঁর পরামর্শ চাইলেন। বিষ্ণু বললেন, বিশ্বনাথকে নির্বাসিত করা তোমার দোষ হয়েছে। যদি পাপমুক্ত হতে চাও তো একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর।

দিবোদাস শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পুত্র সঞ্জয়ের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করলেন। তারপর শিবদূতের আনা রথে আরোহণ করে স্বর্গে গমন করলেন।

এই কাহিনীটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, কাশীতে চিরকাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে কিংবা তার পরে এখান থেকে হিন্দুধর্ম নির্বাসিত হয়। সারনাথ তার প্রমাণ। তারপরে দিবোদাস নামে কোন রাজার রাজত্বকালে হিন্দু আধিপত্য ক্রমে ক্রমে ফিরে আসে। এই দিবোদাস যে রামচন্দ্রের সমসাময়িক প্রতর্দনের পিতা নন, তাতে সন্দেহ নেই। কাহিনীটি একটি সুন্দর রূপক। বৌদ্ধ অধিকৃত বারাণসীতে যে একে একে শাক্ত সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব ও শৈবরা এসে প্রাধান্য পেল, তারই বর্ণনা করা হয়েছে।

মনোরঞ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কাশীর কোন্ রাজা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন?

বললুম: ব্রহ্মার আদেশে রাজা দিবোদাসই দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এখন যেখানে দশাশ্বমেধ ঘাট, পুরাকালে সেইখানেই ছিল রুদ্রসরোবর। রুদ্রসরোবরের তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ হবার পরে তার নাম দশাশ্বমেধ হয়েছে। ব্রহ্মা তারপরে এখানে দুটি শিব স্থাপন করেন। তাঁদের নাম দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর। গঙ্গার দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে এখন দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

পাঁচু বলে উঠল: কাল আমরা তো দশাশ্বমেধ ঘাটেই স্নান করলাম. তাই না কাকাবাবু? মনোরঞ্জন বলল: ঠিক তাই।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: কোন আধ্যাত্মিক ফল পেয়েছি কিনা জানি না, শরীর আমাদের শীতল ও সুস্থ হয়েছিল। পথশ্রমের গ্লানি আমাদের দূর হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর দুটি নাম আমার মনে পড়ল। রাজা প্রতর্দনেব পুত্র বৎস ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞানী পত্নী মদালসার কথা। বৎসের অন্য নাম ঋতধ্বজ বা কুবলায়শ্ব। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমি এঁদের কথা পড়েছি। তবে ঋতধ্বজ সেখানে রাজা শত্রুজিতের পুত্র।

মনোরঞ্জন বলল: এ গল্পটি আমাদেব বলবে না?

বললুম: সতেরোটি অধ্যায়ে বিবৃত বিরাট গল্প, আজ থাক।

মনোরঞ্জন জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে একবার তাকাল। দিনের আলো তখন নিভে গেছে, অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। তাই মিসেস মুখার্জিব দিকে তাকিয়ে বলল: এবাবে তাহলে তৈরি হয়ে নিন বৌদি, আর দেরি করবেন না।

সেই ভাল।

বলে মিসেস মুখার্জি সাবিত্রীকে নিয়ে উঠে পড়লেন। কিন্তু তারাপদ বাবু বসে রইলেন। বললেন: এত নাম ধাম আপনি মনে রেখেছেন কী করে!

এ কথার উত্তর দিল মনোরঞ্জন, বলল, কাশীর পৌরাণিক ইতিহাস কি শেব হয়ে গেল!

বললুম: আর একটি নাম না করলে তা সম্পূর্ণ হবে না। ধন্বন্তরিও ছিলেন কাশীর একজন রাজা।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বলল: কী রকম? দেববৈদ্য ধন্বন্তরি তো শুনেছি সমুদ্র-মন্থনের সময় অমৃত কুম্ভ হাতে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন।

বললুম: ঠিকই শুনেছ। এই কথা আছে বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, মহাভারত ও ভাগবতেও আছে। কিন্তু হরিবংশে

আরও কিছু আছে। বিষ্ণুব কৃপায় ধন্বন্তরিব দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল কাশীরাজের পুত্র রূপে। মহর্ষি ভবদ্বাজের কাছে তিনি আয়ুর্বেদ শিখে এই শাস্ত্রকে আট ভাগে বিভক্ত কবেন।

মনোবঞ্জন বলল : এখন আমবা চিকিৎসকদেব প্রতি অবজ্ঞায় এই নাম কবি। ডাক্তাব তো নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তবি। এ কালেব ধন্বন্তবিব ব্যাগে ইনজেকসন আছে, অমৃত নেই এতটুকু।

১২

মন্দিরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে মিসেস মুখার্জি বারান্দায় বেরিয়েছিলেন। ডাকলেন ঃ ঠাকুরপো!

মনোরঞ্জন এই ডাক শুনে লাফিয়ে উঠল, বলল ঃ চল, চল, আর দেরি ক'রো না।

আমি আশ্চর্য হলুম সাবিত্রীকে দেখে। তার সাজটা বড় চোখে ঠেকছে। আমারই খানিকটা লজ্জা হল। কিন্তু সাবিত্রী নিজে লজ্জা পাচ্ছিল বেশি, তার সঙ্কোচে আমি এই লজ্জা দেখতে পাচ্ছিলুম। মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল।

গোধূলিয়ার মোড়ে এলে আমার শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার কথা মনে হয়। নানাদিক থেকে রাস্তা এসে এইখানে মিলেছে। বড় বড় বাস আসছে আর চলে যাচ্ছে। মোগলসরাইএর দিক থেকে স্টেশন ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে বাস আসে। যত ট্যাক্সি তত সাইকেল রিক্স। অসংখ্য দোকানপাট, লোকে লোকারণ্য। কোন্ পথটা যে গঙ্গার দিকে যাবে তাও বুঝতে কষ্ট হয়। অনেকে তাই বাস থেকে নেমে রিক্সয় যাচ্ছেন। পনের কুড়ি পয়সাতেই দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে দেবে। তাতে ঠেলাঠেলি এড়ানো যায়, পথ হারাবার ভয় থাকে না। তীর্থযাত্রীর পক্ষে এইটেই নিরাপদ।

সংখ্যায় আমরা অনেক বলে রিক্সয় উঠি নি, মনোরঞ্জনকে অনুসরণ করেছি! দূরত্ব সামান্যই। কয়েক গজ এগোতেই বাঁ হাতে বিশ্বনাথ গলি, কাশীর প্রাণ। সোজা পথ গঙ্গার ঘাটে পৌঁছেছে, এই ঘাটের নাম ঘোড়া ঘাট। তার ডানপাশেই দশাশ্বমেধ ঘাট। বড়

রাস্তার ডান দিক থেকে একটা পথ বেরিয়ে বাঁয়ে গেলে একটি কালী মন্দির ছাড়িয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছেছে।

যানবাহনে চেপে গঙ্গাব ঘাটে পৌঁছতে হলে শহবের মাঝখানে এই একটি পথই ছিল। অন্যান্য ঘাটে পৌঁছতে হত সংকীর্ণ গলিপথে। হরিশ্চন্দ্র বোড পবে তৈবি হয়েছে, এই পথে কাশীব দ্বিতীয় শ্মশান হবিশ্চন্দ্র ঘাটে পৌঁছনো যায়।

পাঁচু আমাব পাশে পাশে চলছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ কদিনে তোমবা সবই দেখে ফেলেছ নিশ্চয়ই।

গর্বিত ভাবে পাঁচু বলল: সব দেখেছি। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দুর্গা গণেশ সাক্ষী বিনাযক শনি মহাবাজ—

তবে তো সবই দেখা হয়ে গেছে।

পাঁচু বলল: আসুন না আমাব সঙ্গে, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।

বলেই পাঁচু থেমে পডল, বলল: এইটেই বিশ্বনাথ গলি নয কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন বলল: এ পথে গেলে মন্দিবেব পিছনে মসজিদে গিয়ে পৌঁছবে, তাবপব জ্ঞানবাপীব ভিতব দিয়ে মন্দিরে আসতে হবে।

পাঁচু ভয়ে ভয়ে বলে উঠল: না না, ও পথে যাব না। বড বড ষাঁড় গলির ভিতব দাঁড়িয়ে থাকে।

বড় বিচিত্র পথ কাশীব বিশ্বনাথ গলি। সারা ভাবতে এমন আব একটি গলি আছে কিনা আমি জানি নে। অত্যন্ত সংকীর্ণ পথেব দুধারে জমজমাট দোকানপাট। আলোয় এখন চারিদিক ঝকমক করছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে পরিবেশ। কত রকমের পণ্য তাব শেষ নেই। বাসনের দোকান ও কাঠের রঙীন খেলার দোকান অনেকগুলি। বাসন শুধু পিতলের নয়, রূপো ও জার্মান সিলভারের নানা প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস। বেনারসী শাড়ী ও জামা কাপড়ের দোকান। কত পানের মসলার দোকান,

বেশির ভাগই কাশীর নিজস্ব জিনিস, বাহিরের জিনিসও অনেক আছে।

দুধারে তাকাতে তাকাতে আমরা চলেছিলুম। হঠাৎ একটি শাড়ির দোকান থেকে একজন বলে উঠল : এই যে বড়দিদি।

মিসেস মুখার্জি তার দিকে তাকাতেই বলল : দেখাব দু একখানা শাড়ি ?

মিসেস মুখার্জি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে মনোরঞ্জনকে বললেন : ফেরার পথে দেখা যাবে, কী বলেন ঠাকুরপো ?

তারাপদবাবু বললেন : বেনারসী শাড়ি !

মিসেস মুখার্জি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন : অমন ভয় পাচ্ছ কেন ?

ভয় পাব কেন !

তবে ?

ভাবছিলুম, এই বয়সে তোমাকে—

মিসেস মুখার্জি মুখ ফিরিয়ে বললেন : কেন, তোমার কি মেয়ে নেই নাকি ! মেয়েব বিয়ের কথা ভাবতে হবে না !

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মামীর কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় তিনিও মাদ্রাজে শাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন। কাঞ্চীপুরমেব একখানা শাড়ি কিনেছিলেন নিজের জন্যে, সাদা সিল্কের উপরে জরির পাড় আর আচল। বলেছিলেন : অগ্রাণে স্বাতির বিয়ে। এই শাড়ি পরে জামাই বরণ করব।

রেশমি কাপড় যে কত মোলায়েম ও মজবুত হতে পারে, তা সেই প্রথম দেখেছিলুম। দুনিয়ার সমস্ত রঙ একত্র করেছে শাড়ির বাজারে। জরির ভারি আচলে বেঁধে রেখেছে এক অতীত দিনের ঐতিহ্যকে। মনে পড়েছিল পুরাকালের দেবদাসীদের কথা। অনেক যুগ আগে এমনি শাড়ির আচল দুলিয়ে মন্দিরে মন্দিরে তারা নাচত। তাই এত রঙের

চটক ও সোনার ছড়াছড়ি। স্বাতির কিন্তু একখানা শাড়িও পছন্দ হয় নি। বলেছিল: অমন গাঢ় রঙ আর ফাঁপা ফোলা শাড়ি কলকাতায় একেবারে অচল।

বেনারসী শাড়ির বিচিত্র রূপ! আকাশের রামধনু তো মাত্র সাত রঙের, পৃথিবীর সব রঙ দেখা যায় বেনারসী শাড়ির বাজারে। কাঞ্চীর মতো শুধু গাঢ় রঙ নয়, কোন হাল্কা রঙই এখানে বাদ পড়ে না। শুধু রঙ নয়, পাড় আচল ও জরির কত বৈচিত্র্য! কত দাম! শুধু রাজা মহারাজার অন্তঃপুরে নয়, গরীবের কুটীরেও বেনারসীর অবাধ অধিকার। বেনারসী না হলে কন্যার বিবাহ হয় না, একখানা অন্তত চাই। মেয়ে সেই বেনারসী পরে আল্পনা আঁকা পিঁড়িতে বসবে, শুভদৃষ্টি হবে বেনারসীর ওড়নার তলায়, নতুন বর কনের লজ্জানত মুখ দেখবে। তারপর সেই বেনারসী বাক্সে তোলা থাকবে, অন্যের বিবাহে যাবে সেই বেনারসী পরে, কিংবা প্রতি বছর নিজের বিয়ের দিনটি স্মরণ করবে লুকিয়ে সেই বেনারসী পরে। কিছু দিন আগেও বিবাহে শুধু লাল বেনারসীর চল ছিল। এখন অনেকে লালের বদলে গোলাপী কিনছে, হলদে কিনছে, কিন্তু কিনছে বেনারসী। বেনারসীর বদলে মাদ্রাজী কিংবা বোম্বাই শাড়ি কিনছে না। বেনারসী পরা অসংখ্য মেয়ের মাঝখানে আমরা নতুন কনে চিনি কপালে চন্দনের ফোঁটা দেখে। সাবিত্রীও বড় হয়েছে, তার বিবাহ দিতে হবে। বেনারসে এসে মিসেস মুখার্জির তাই বেনারসী শাড়ির কথা মনে পড়ছে।

তারাপদবাবু তাঁর স্ত্রীর কথায় থতমত খেয়ে বললেন: তা বটে, তা বটে।

পাঁচু আমার হাত ধরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ আমার হাত টেনে ধরে বলল: এই তো ঢুণ্ডি গণেশ, প্রণাম করুন এইখানে।

কোন মন্দির নয়, কোন আড়াল আবডাল নেই। পথের ধারেই খানিকটা উঁচুতে গণেশের মূর্তি অসংখ্য যাত্রীর পূজায় ও প্রণামে জীবন্ত

হয়ে আছে। গণেশের লাল দেহ, আর রূপোর হাত পা কান আর শুঁড়।

আমি প্রণাম করতেই পাঁচু বলল : উপরে অন্নপূর্ণার মন্দির দেখবেন আসুন। চটি খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে কিন্তু। দিদি, তুমি আমাদের জুতো দেখবে।

বলে আমাকে অন্নপূর্ণার মন্দিরের ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

আমি বললুম : সাক্ষী বিনায়কের মন্দির দেখালে না পাঁচু?

পাঁচু এই প্রশ্ন শুনে মনোরঞ্জনের দিকে তাকাল করুণ ভাবে। মনোরঞ্জন বলল : ঠিক আছে, ফেরার পথে আমরা সাক্ষী বিনায়ক দেখব।

আমি বললুম : বিনাযক মানেও তো গণেশ, কিন্তু লক্ষ্মী বিনায়ক কেন বলে?

পাঁচু বলল : কেন বলে কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন বলল : ওকেই জিজ্ঞেস কর।

পাঁচু আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : কাশীতে এসে যে যাত্রীরা পঞ্চ ক্রোশ পরিক্রমা করে, তারই সাক্ষী ঐ গণেশ। কাশীতে যাঁরা আগে আসতেন তাঁরা সমস্ত কাশী শহরটাকে পায়ে হেঁটে ঘুরে এসে এই গণেশকে সে কথা জানিয়ে একটা সার্টিফিকেট নিতেন। সেইটেই হল বিশ্বনাথ দর্শনের ছাড়পত্র। ঐ ছোট্ট মন্দিরটি নাকি একজন মারাঠা তৈরি করে দিয়েছেন প্রায় দুশো বছর আগে, লোকে এখন তাঁর নামও ভুলে গেছে।

তারাপদবাবু বললেন : আশ্চর্য। কাশীতে পা দিতে না দিতেই এ সব আপনি জেনে ফেলেছেন!

মনোরঞ্জন বলল : কাশীতে পা দেবার আগে থেকেই এ সব ও জানে।

এইবারে আমরা অন্নপূর্ণার মন্দিরটি দেখলুম ঘুরে ঘুরে। পথের উপরেই চটি জুতো খুলে দরজা পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়।

নানা বয়সের ভিখিরি মেয়েরা বাহিরে বসে আছে, বললে তারাই জুতোর উপরে নজর রাখে। পাঁচটি নতুন পয়সা পেলেই তারা খুশী। জুতো দেখতে না বললেও তারা হাত পাতবে ফেরার সময়। দেবদর্শন করে ধন্য হবার পরে তীর্থ স্থানেব ভিখিরিরা যাত্রীদেব কাছে হাত পাতে, এটাই নিয়ম।

এই মন্দিরটি মহারাষ্ট্রেব পেশোয়া প্রথম বাজীবাও তৈরী করে দিয়েছিলেন ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাঙ্গণের চারিধারে দোতলা অট্টালিকা, মাঝখানে একটি ছোট মন্দির অন্নপূর্ণাব। সুন্দর কারুকার্য করা কয়েকটি স্তম্ভের উপরে গম্বুজাকৃতি ছাদ নাটমন্দিরের মতো দেখতে, তারই সঙ্গে সংলগ্ন গর্ভগৃহে অন্নপূর্ণার মূর্তি। বিশ্বেশ্বরের আদেশে মা অন্নপূর্ণা সমস্ত কাশীবাসীকে অন্নদান করছেন। অন্নাভাবে কাশীতে কারও মৃত্যু হয় না।

মিসেস মুখার্জি বললেন: অন্নকূটেব সময় একবার কাশীতে আসবার ইচ্ছা আছে।

তারাপদবাবু বললেন: শুনেছি যে আগেব জাঁকজমক আব নেই।

কী রকম?

আগে তো পাহাড় হত ভোগের, চিরকাল হত। আর অন্নকূটের প্রসাদ সারা ভাবতবর্ষে পাঠানো হত। এখন কাশীব লোকেরাই প্রসাদ পায় না।

আমি বললুম: উৎসবটা তবু তো হয়।

তারাপদবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তা হয়।

তারপরে দোতলার একটা ঘর দেখিয়ে বললেন: ঐ ঘরে আছেন সোনার অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণার মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে আরও চারটি মন্দির আছে। গৌরীশঙ্কর সূর্য গণেশ ও হনুমানের মন্দির। এই মন্দিরগুলি দেখবার সময় পাঁচু চেঁচিয়ে উঠল: এই যা, সেই মন্দিরটা তো

আপনাকে দেখানো হল না। রাম সীতা, আর সব কী ঠাকুর কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন বললঃ ফেরার পথে দেখিয়ে দিও।

বিশ্বনাথের মন্দিরে পৌঁছবার আগে আমরা শনৈশ্চরের মন্দিরও দেখলুম। কয়েকটি পয়সা দিয়ে মিসেস মুখার্জি একটি প্রদীপ নিবেদন করলেন। যাত্রীরা সবাই তাই করছেন আর প্রণাম করছেন শনিকে। অমঙ্গল দূর কর, মনে মনে এই প্রার্থনাই সবাই করছেন।

শুক্রেশ্বরের মন্দিরও নাকি খুব কাছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজো করতেন বলে নাম শুক্রেশ্বর। কিন্তু সেখানে না গিয়ে আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। গলিপথ এখানেও সংকীর্ণ, মন্দিরের চূড়ো দেখা যায় না এখান থেকে। প্রাচীর ও দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

মন্দিরের চূড়ো দেখবার জন্য আমাদের দিনের বেলায় একটা বাড়ির দোতলায় উঠতে হয়েছিল। কাশীতে আরও অনেক মন্দির দেখবার পরে পাঁচু বলেছিলঃ বিশ্বনাথের মন্দির তো আমরা দেখিনি!

তারাপদ বাবু বললেনঃ এ কথা আবার কে বলল!

পাঁচু বললঃ মা বলেছিলেন, বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়ো সোনায় মোড়া। সোনার মন্দির তো আমরা একটাও দেখি নি।

শেষ পর্যন্ত তাকে এই বিশ্বনাথের মন্দির দেখাবার জন্য একজন পাণ্ডার শরণ নিতে হয়েছিল। মন্দিরের দরজার কাছাকাছি গলির একটা বাড়ির দোতালার বারান্দায় উঠে আমরা সেই বিচিত্র কারুকার্যময় স্বর্ণশিখর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। দক্ষিণ ভারতের গোপুরমের মতো তা বিশাল নয়, পুরী ভুবনেশ্বরের দেউলের মতোও বিরাট নয়। এ একেবারে অন্য ধরণের। পাশাপাশি দুটি শিখরের মাঝখানে একটি গম্বুজ। সব চেয়ে বাঁ ধারের যেটি, সেটি মহাদেব মন্দিরের শিখর, পাশের গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া, বিশ্বনাথের

মন্দিরের শিখরটিও সোনার। এটি মাত্র একান্ন ফুট উঁচু। অনেক-গুলি ছোট ছোট সূক্ষ্মাগ্র শিখর মূল শিখরটিকে বেষ্টন করে আছে। সবই সুবর্ণমণ্ডিত। পাণ্ডা বললেনঃ ত্বশো বছব আগে এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ, আর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়ো তামার পাতের উপরে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। এই সোনার ওজন হবে বাইশ মণ।

মন্দিরের দরজাটি কিন্তু সোনাব নয়, পিতলের উপবে অমন সুন্দব কারুকার্য দেখেই সোনার বলে মনে হয়।

বিশ্বেশ্বর ও মহাদেবেব মন্দিরেব মাঝখানে ন'টি ঘণ্টা ঝুলছে। তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ঘণ্টাটি পাওয়া গেছে নেপালের মহা-রাজার কাছে। ভারতবর্ষেব প্রায় সমস্ত মন্দিবে তিনি এমন এক একটি ঘণ্টা দান কবেছেন।

আর একটি অদ্ভুত কথা পড়েছিলুম একখানা ইংরেজী বইএ। এই মন্দিবের নহবৎ খানাটি নাকি ওয়াবেন হেস্টিংস নির্মাণ করে দিয়েছেন নিজের খরচে। কাশীতে তিনি অনেকদিন কাটিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু হিন্দু দেবতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা জেনে বিস্মিত হতে হয়।

বিশ্বনাথের শৃঙ্গার আরতি আরম্ভ হতে তখনও দেরি ছিল। মিসেস মুখার্জি বললেনঃ আব ফিরে যাব না, ফিরে গেলে আর আসা হবে না।

মনোরঞ্জন বলল: ফেরবার তো দরকার নেই। এই অবসরে গোপালকে সব দেখিয়ে দেওয়া যাক। আপনারা অপেক্ষা করুন এইখানে, তা না হলে পরে আর জায়গা পাবেন না।

তারাপদবাবু এ কথা শুনে খুশী হলেন, বললেনঃ সেই ভাল।

বিশ্বনাথের মন্দিরে শুধু বিশ্বনাথ নন, আরও অনেক দেবদেবী আছেন। মূল মন্দিরের ভিতর বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্তি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। বাবার শৃঙ্গার আরতির সময় হচ্ছে। সেখানে

না দাঁড়িয়ে আমরা অন্যান্য দেবদেবী দেখলুম ঘুরে ঘুরে। মহাদেবের মন্দিরের সামনে অনেকগুলি লিঙ্গ ও মূর্তি আছে দেওয়ালের গায়ে। এগুলি পুরনো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ছিল বলে সকলের বিশ্বাস। বর্তমান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এর উপরে যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তার পিছনে এখনও কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যিই এই বিশ্বনাথের উপর দিয়ে অনেক অত্যাচার গেছে। হিউএন চাঙ এখানে এসে বিশ্বেশ্বরের যে লিঙ্গ দেখেছিলেন, তা একশো হাত উচু তাম্রময় লিঙ্গ। শাহাবুদ্দিন ঘোরি যখন কাশী লুণ্ঠন করেন, তখন তা বিধ্বস্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না বিশ্বেশ্বরের সব চেয়ে বড় ক্ষতি করেছিলেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব মন্দিরটি ধ্বংস করে তারই উপরে মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন মন্দিরের সুন্দর উপাদান দিয়ে। তিনি এই বারাণসীর নাম বদলে মুহম্মদাবাদ রেখেছিলেন। তারপর আর একজন বাদশাহ মুহম্মদ শাহ এই মুহম্মদাবাদ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বলে হিন্দুরাজাকে দান করেন। কাশীতে তখন রাজা কেউ ছিলেন না, তাই গঙ্গাপুরের জমিদার মনসারামকে রাজা উপাধি দিয়ে তাঁকে এই তীর্থস্থানটি দান করেন। এঁরাই হলেন বাদশাহ।

বর্তমান মন্দিরের পিছনে জ্ঞানবাপী দেখতে গিয়ে আমরা ঔরঙ্গজেবের মসজিদটিও দেখতে পেলুম। মসজিদে প্রবেশের পথ অন্য দিকে, সেদিকে প্রশস্ত রাস্তা আছে, পাশেও আছে, বড় রাস্তা থেকে সরাসরি সেখানে আসা যায়। আবার জ্ঞানবাপীতেও আসা যায় সে দিক থেকে, তারপরে সংকীর্ণ গলিপথে আসতে হয় বিশ্বনাথের গলিতে।

জ্ঞানবাপী একটি কূপ। আটচল্লিশটি পাথরের থামের উপরে একটি মণ্ডপ, তারই নিচে পাথরের উঁচু জালি দিয়ে ঘেরা এই কুয়োটি খুবই পবিত্র বলে পরিচিত। এই জ্ঞানবাপীর সম্বন্ধে কাশী

খণ্ডে একটি কাহিনী আছে। রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে এই কুণ্ড খনন করেছিলেন। কুণ্ডের জলে পৃথিবী আবৃত হলে ঈশান সহস্র কলস জলে বিশ্বেশ্বরের স্নান করালেন। প্রসন্ন হয়ে বিশ্বেশ্বর বর দিলেন যে শিব অর্থাৎ জ্ঞান জলরূপে এই বাপীতে বিদ্যমান থাকবেন। শোনা যায় যে কালাপাহাড় যখন কাশীতে এসেছিলেন মন্দির ধ্বংসের অভিযানে, বিশ্বেশ্বর তখন এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। যাত্রীরা আজও এই কূপের জলপান করবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁদের ধারণা যে এই জলপানে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

জ্ঞানবাপীর এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া দৌলত রাওএর বিধবা রাণী বৈজা বাঈ। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছে। কিছু দিন আগেও যাত্রীরা এই কূপের মধ্যে পূজার উপচার যথেচ্ছ নিক্ষেপ করত। এখন তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

সাত ফুট উঁচু একটি নন্দী আছে এই মণ্ডপে, আর ছোট ছোট কয়েকটি মন্দিরও আছে। একটি ঘণ্টাও ঝুলছে দেখলুম, কিন্তু সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার সময় পেলুম না। তার আগেই একটি আকস্মিক ধাক্কায় আমি হতচেতন হয়ে গেলুম। না, ধাক্কা নয়, ভিড়ের ভিতর একজন আমাকে জাপটে ধরেছে। সরু সরু কটকটে হাত, কিন্তু শক্তি আছে অনেক। কোন ভিখিরি নিশ্চয়ই নয়, ভিখিরির গায়ে এত জোর থাকবার কথা নয়।

পিছন থেকে আমাকে জাপটে ধরেছিলেন বলেই, বেচু মল্লিককে আমি চিনতে পারি নি, গলার স্বর শুনেই আমি তাঁকে চিনে ফেললুম। ব্যাকুল ভাবে বেচু মল্লিক বলে উঠলেন: বাঁচান আমাদের।

আমি তাঁর কঠিন আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বললুম: কী হয়েছে?

আর্তনাদের সুরে বেচু মল্লিক বললেন: আমার সর্বস্ব খোয়া গেছে।

প্রথমেই আমার মনে এল তাঁব স্ত্রীর কথা। বললুম: মিসেস মল্লিক কোথায়?

কাঁদ কাঁদ ভাবে বেচু মল্লিক বললেন: দোকানদারেরা তাঁকে আটক কবেছে।

আটক!

কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না তাঁকে।

আমি আশ্চয হলুম তাঁব কথা শুনে, বললুম: সে আবার কী!

ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাড়িয়েছিলেন, বললেন: সত্যি বলছি আপনাকে, জোর কবেই তাকে ধরে বেখেছে।

তবে আপনি তাকে ছেড়ে এলেন কেন?

ইচ্ছে কবে কি এসেছি! এই দেখুন না এদের।

বলে অসহায় ভাবে তাকালেন দু তিন জন ব্রাহ্মণের দিকে। মনোরঞ্জনও আমার দিকে তাকিয়েছিল বিহ্বল ভাবে। সেও ফিবে তাকাল। ব্রাহ্মণদেব কাবও হাতে ফুল বেলপাতা, গঙ্গাজল বইছেন কেউ, আব কেউ মন্ত্র পড়াচ্ছেন। একজন তাড়া দিয়ে বললেন: চলে আসুন তাড়াতাড়ি, বাবাব আরতি এখনই শুরু হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক তাঁদের দিকে তাকাতেই একজন বলে উঠলেন: রাস্তা ছাড়, রাস্তা ছাড়—

অন্য একজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে দু একটা ফুল বেলপাতা তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন, বললেন: হাত জোড় করুন এইখানে—প্রণাম করুণ—দিন দাক্ষণা। পাঁচ টাকাব কম এখানে দিতে নেই, অকল্যাণ হয় পরিবারের।

বেচু মল্লিক করুণ ভাবে তাঁর পকেটে হাত দিলেন, বললেন: আর একটা পয়সাও নেই পকেটে।

আমার দুঃখ হল তাঁর দুর্দশা দেখে, মনোবঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণদের কিছু না বলে আমি বেচু মল্লিককেই বললুম: আপনার নিজ মূর্তি ধরুন না কেন, আপনি ভয় পান কাকে!

অ্যাঁ! আমায় নিজ মূর্তি ধরতে বলছেন!

আমি বললুম ঃ খ্যাংরাপটির বেচু মল্লিক না আপনি!

মুহূর্তে ভদ্রলোক পাণ্ডাদের দিকে রুখে দাঁড়ালেন, তারপর চিৎকার করে উঠলেন ঃ আমার সঙ্গে গুণ্ডামি! পুলিশে দেব সবাইকে।

ব্রাহ্মণেরা ছিটকে সবে গেলেন।

ভদ্রলোক এবারে আমাব হাত ধরে বললেন ঃ আসুন তো আমার সঙ্গে।

বলে গটমট কবে বেরিয়ে এলেন জ্ঞানবাপী থেকে। মন্দিরের ভিতর দিয়ে চলে এলেন বিশ্বনাথ গলিতে। ব্রাহ্মণেরা পিছনে ছিলেন, কিন্তু আব এগোবার সাহস পেলেন না। বেচু মল্লিকের বীর দর্প দেখে তাঁরা সত্যিই ভয় পেয়েছেন।

চলতে চলতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ আপনাব সব টাকা-কড়ি এরা লুটে নিয়েছে নাকি?

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন ঃ বলবেন না কাউকে।

তারপরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন ঃ টাকাকড়ি আমার স্ত্রীর কাছে কোমরে গোঁজা আছে।

বলতে বলতেই বেচু মল্লিক আমার গায়ের কাছে ঘেঁষে এলেন। বললেন ঃ কী বিশ্রী জায়গা মশাই!

নতুন কী উৎপাত এল তা দেখবার চেষ্টা করতেই একটা বিরাট ষাঁড় দেখতে পেলুম। মানুষ জন ঠেলে মাথা নেড়ে যেন তাড়া করে আসছে।

কাণ্ড দেখেছেন!

বলে বেচু মল্লিক আমাকে টেনে নিয়ে গলির দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে গেলেন। কিন্তু ষাঁড়টা যেন তাঁকে লক্ষ্য করেই আসছে। দূর থেকে এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ গলার লাল মালাটা দিয়ে দিন।

আমি তাকিয়ে দেখলুম যে বেচু মল্লিকের গলাতেই আছে একটি

লাল জবা ফুলের মালা। তাড়াতাড়ি সেটি খুলে নিয়ে আমি ষাঁড়ের গলায় ফেলে দিলুম। রক্ষা পেয়ে গেলেন বেচু মল্লিক, ষাঁড়টা তার নিজের গলার মালাই গলাধঃকরণের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেলুম। গম্ভীর ভাবে বেচু মল্লিক বললেন: অসভ্য দেশ!

গলির প্রায় শেষ প্রান্তে এসে আমরা বেচু মল্লিকের স্ত্রীকে দেখতে পেলুম। একটা বেনারসী শাড়ির দোকানে বসে তিনি শাড়ি দেখছেন। সামনে স্তূপীকৃত শাড়ি, তিন চারজন লোক শাড়ি টানাটানি করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মিসেস মল্লিকের দেহ থেকেও ঘাম ঝরছে। বেচু মল্লিককে দেখতে পেয়েই তিনি চিৎকার করে উঠলেন: হল তোমার কাজ?

বেচু মল্লিক একই সুরে উত্তর দিলেন: তোমার কাজ হল?

দোকানের এক ধারে আরও অনেক জিনিসপত্র সংগৃহীত হয়েছে। পানের মসলার কৌটো অনেকগুলি, পানের বাটা, ঠাকুরের সিংহাসন, ইত্যাদি। ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন: গোটান এসব।

একজন জিজ্ঞাসা করল: কোন্‌টা পছন্দ হল?

মহিলা বললেন: ঠাকুরের জোড়খানা বার করুন।

বেনারসী শাড়ির পাহাড়ের নিচে থেকে বেরল একখানি ধুতি চাদরের জোড়, চার আঙ্গুল চওড়া আর এক হাত লম্বা একখানা ধুতি, আর তার উপযুক্ত চাদর।

মনোরঞ্জন আমার হাত ধরে টানল। বিরক্ত ভাবে বলল: চলে এস।

আমি আর অপেক্ষা করলুম না, পিছিয়ে এলুম মন্দিরের দিকে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে তখন আরতির ঘণ্টা বাজছে। আমরা আশা করিনি যে এত অল্প সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণ এমন ভরে যেতে পারে।

তিল ধারণের আর জায়গা নেই। মন্দিরের গর্ভগৃহে কী হচ্ছে তা দেখবার আর উপায়ও নেই। আমরা শুধু বাজনা শুনছি নানা যন্ত্রের। মনে হল যে একসঙ্গে বারোজন ব্রাহ্মণ আরতি করছেন ঘণ্টা নেড়ে। চোখ বন্ধ করে তাঁদের হাতে আমি পঞ্চ প্রদীপের আলো দেখতে পেলুম। দুধ ও গঙ্গাজলে স্নান করবেন বিশ্বনাথ, তারপরে চন্দন মাখবেন। পুরু করে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে ফুলে মালায় সাজানো হবে তাঁকে, তারপরে জরির ঢাকায় ঢেকে দেওয়া হবে। তারপরে ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করবেন উদাত্ত স্বরে।

রামেশ্বরের শয়নারতির কথা আমার মনে পড়ল। সে দৃশ্য আমি আজও ভুলিনি, কোনদিন ভুলব না। শুধু যে আরতির কথাই ভুলব না তা নয়, আরও একটি ঘটনা আমাব মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে আছে। আরতি দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মন্দির প্রাঙ্গণে! ক্লান্ত চোখে কখন ঘুম নেমেছিল জানতে পারিনি। ভুলে গিয়েছিলুম যে স্বাতি আমার সঙ্গে আরতি দেখতে এসেছে। তাকে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরদিন প্রভাতে আমি ধর্মশালায় ফিরেছিলুম কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে। আমার এই দায়িত্বহীনতার জন্য সেদিন আমি লজ্জা পেয়েছিলুম, কিন্তু স্বাতি আমাকে দোষ দেয়নি।

কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার এ ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। আর সেইজন্যেই মামী ভয় পেয়েছিলেন অপরিসীম। আজও তিনি হালদার মশাইকে ভয় পান। কিন্তু সত্যিই কি তিনি আমাদের কোন ক্ষতি করেছেন!

বিশ্বনাথের আরতি হচ্ছে।—

ধিনকত থেঈ থেঈ ধিনকত মৃদঙ্গ বাদয়তে,
শিব, মৃদঙ্গ বাদয়তে।
ক্বণ ক্বণ ললিতা বেণুর্মধুরং বাদয়তে।
ওঁ হর হর মহাদেব॥

তাং তাঁ লুপ চুপ তাং তা লুপ ডমরু বাদয়তে,
শিব, ডমরু বাদয়তে।
অঙ্গুষ্ঠাংগুলি নাহং লাস্য গতং কুরুতে।
ওঁ হব হব মহাদেব ॥

বাড়ি ফেরার পথেও আমার দুকান ভবে আরতির শব্দ ধ্বনিত হতে লাগল।—

জয় গঙ্গাধর হর জয় গিরিজাধীশ,
শিব, জয গিরিজাধীশ।
ত্বং মাঁ পায়ল নিত্যং কৃপয়া জগদীশ।
ওঁ হর হর মহাদেব ॥

১৩

মনোরঞ্জনের ইচ্ছায় আমরা দোকানে খেয়ে ধর্মশালায় ফিরেছিলুম। আরতি দেখতে বেরোবার আগেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। মনোরঞ্জনকে আমি চুপিচুপি বলেছিলুম: আমাকে স্বাধীন ভাবে থাকতে দাও।

উত্তরে মনোরঞ্জন শুধু বলেছিল: আদিখ্যেতা রাখ।

এই ব্যবস্থা যে আমার মনঃপূত হবে না তা সবাই বুঝেছিলেন। মিসেস মুখার্জি আমাকে বলেছিলেন: এখানে আপনার খুবই কষ্ট হবে বুঝি।

কঠিন ভাবে মনোরঞ্জন বলেছিল: কেন?

মিসেস মুখার্জি বলেছিলেন: ভাল হোটেলে থাকা ওঁর অভ্যাস।

এ কথার উত্তর মনোরঞ্জন সংক্ষেপে দিয়েছিল, ভেংচি কেটে বলেছিল: রাজা বাদশাহ মানুষ তো!

অন্য সময় হলে আমি হয়তো প্রসন্ন মনে হাসতুম, কিন্তু তা পারলুম না। এ পরিবারটিকে আমার একটুও ভাল লাগছিল না। পুরীতেও লাগে নি। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল যে টোপ ফেলে এঁরা আমাকে বঁড়শিতে গাঁথতে চাইছেন, আর মনোরঞ্জন এ কাজে তাঁদের সাহায্য করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। টোপের কোন দোষ দিই না, সে একটা জড় পদার্থের মতো কুণ্ঠায় মরে আছে।

মনোরঞ্জন বলেছিল: এ বেলা আমাদের রান্না-বান্না থাক বউদি, আরতি দেখে আমরা কোন হোটেলে খেয়ে ফিরব।

মিসেস মুখার্জি এ প্রস্তাবে খুবই আরাম পেয়েছিলেন, বলেছিলেন: আপনার দাদার কি এ আক্কেল আছে ঠাকুরপো! হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে রাঁধতে বসলেই উনি খুশী হবেন।

রান্না-বান্নার ভাবনা ছিল না বলেই মিসেস মুখার্জি প্রাণ ভরে শাড়ি দেখলেন। দু তিন খানা শাড়িও তাঁর পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু একখানাও কিনলেন না। বললেনঃ আজ থাক।

দোকান থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে বললেনঃ বিয়ের দিন স্থির হলে কেনা যেত।

সাবিত্রীর পছন্দের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নি। জিজ্ঞাসা করলে সে লজ্জায় অবনত হত, কোন উত্তর দিতে পারত না। কিন্তু তারাপদবাবু ভয়ে ভয়ে বললেনঃ তবে দেখলে কেন?

মিসেস মুখার্জি বললেনঃ তুমি বুঝবে কী! আসল জিনিসের দামের একটা ধারণা হল তো, কী বল ঠাকুরপো!

মনোরঞ্জন কোন উত্তর দিল না। আমার মনে হল, আসল জিনিস কি আমরা ন্যায্য দাম দিয়ে কিনি!

রাতে আমি মনোরঞ্জনের পাশেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু চট করে ঘুম এল না। অসংলগ্ন ভাবে অনেক কথাই মনে আসতে লাগল। মনোরঞ্জনও উসখুস করছিল। এক সময় প্রশ্ন করলঃ তোমার এমন সঙ্কোচ কেন বল তো?

সঙ্কোচ!

তাই তো দেখতে পাচ্ছি। ওরা কি তোমাকে গিলে খেলবে, না টপ্ করে টোপর পরিয়ে দেবে মাথায়!

এ কথার আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মনোরঞ্জনই আবার বললঃ তোমার রক্তের চাপও কিছু বেশি হয়েছে বলে সন্দেহ করছি। সামান্য কথাতেই ক্ষেপে উঠবে বলে ভয় হয়।

একটু থেমে বললঃ একটা কথা তোমাকে না বলে পারি না। বামন হয়ে তুমি চাঁদে হাত দিতে চাও। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে চাঁদ মাটির নয়, ও আকাশের জিনিস। বামনের হাত কি ওখানে পৌঁছবে!

এ কথার কোন উত্তর নেই, স্বাতির বিবাহেব খবর পেয়ে আমিও এই কথাই ভেবেছিলুম। মামীকে চিনতে আমাব একটুও ভুল হয় নি, ভুল হয়েছে মামাকে চিনতে। আমি তাঁকে আমার পক্ষে মনে কবে মস্ত ভুল করেছিলুম। আর স্বাতি! সে কি আমাব সঙ্গে ছলনা করেছে! ঋতা যেমন বামানন্দ বাবুকে নিয়ে খেলা করেছে উৎকলে, স্বাতিও কি তেমনি আমাব সঙ্গে এ যাবৎ খেলা কবেছে! আমাব বুদ্ধি কি এমনই স্থূল যে খেলাকে সত্য ভেবে আমি আকাশেব চাঁদেব দিকেই হাত বাড়িয়ে আছি!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবে মনোবঞ্জন বলল চুপ কবে বইলে কেন? উত্তব দাও।

কী উত্তব দেব!

সত্যিই উত্তব নেই। তোমাব আচবণ অসঙ্গত।

আমি এ কথাব প্রতিবাদ কবতে পাবলুম না।

মনোরঞ্জন বলল: তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়েছ যে সমাজেব বর্ণ বৈষম্য সকলের চোখে সমান নয়, সাধাবণ ভাবে এই বিভেদটা বড় স্পষ্ট ও দৃষ্টিকটু হলেও এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষও সমাজে আছে। তার উদাহবণ তুমি তোমাব মামাকে দেখিয়েছ, আব আমি সেদিন অস্বীকার করি নি।

আজ অস্বীকাব কবছ নাকি?

অনেকদিন আগেই আমাব কবা উচিত ছিল।

কেন কর নি?

প্রয়োজন হয় নি বলে।

আজ বুঝি প্রয়োজন হল!

মনোরঞ্জন বলল: সে কথা বলবাব আগে অস্বীকাব কববাব কারণ বলি। তোমাব স্বাতির সঙ্গে জো রায়েব বিবাহটা কে স্থিব করলেন?

জানি নে।

বোধহয় তোমার মামী। ধরে নেওয়া গেল স্বাতি তার স্বাভাবিক লজ্জায় মুখ ফুটে আপত্তি করতে পারে নি। তোমার মামা পারতেন। নিজের আপত্তি থাকলে তো পারতেনই, মেয়ের আপত্তি সন্দেহ করলেও করা উচিত ছিল। কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে তিন জনের একজন নীরব থাকলেও একজনের মত ছিল ও আর একজনের আপত্তি ছিল না।

আমি বললুম ঃ তাতে প্রমাণ কী হচ্ছে?

প্রমাণ এই হচ্ছে যে মেয়ের বিবাহ স্থির করবার সময় তোমার কথা কেউ ভাবেন না। সেটা তোমার সামাজিক বর্ণ বৈষম্যের জন্যেই।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

মনোরঞ্জন খুশী হয়ে বলল ঃ এই জন্যেই আমি বলছি যে আকাশের চাঁদের মায়া ভোল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখ যে চাঁদ শুধু আকাশেই নেই, মাটির ঘরেও চাঁদ আছে। কত বয়স হল তোমার?

হিসেব রাখি নি।

হিসেব করে আপশোষ করবার আগেই আমার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাশ ফিরে শুলুম।

কিন্তু ঘুম আমার এল না। স্বাতির কথাও আমিও ভুলতে পারলুম না। কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সে আমার সঙ্গে কোন দিন খেলা করেছে। এ কথা বিশ্বাস করতে হলে যে পৃথিবীটাই আমার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই আমি পুরীর সমুদ্রবেলায় পৌঁছে গেলুম। প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সমুদ্রের জলে ছায়া পড়েছিল, কিন্তু সায়াহ্নের আকাশে অন্ধকার ঘনায় নি। আর কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র আর আকাশ একাকার হয়ে যাবে। আকাশের তারা দেখা যাবে সমুদ্রের ঢেউএর উপরে। আকাশের মতো সমুদ্রও

জেগে থাকবে। সারারাত ডাকবে। ঢেউএর পর ঢেউ এসে পারের উপর আছড়ে পড়বে, আর উচ্ছল জল কলকল করে কথা কইবে। মানুষের মতো পৃথিবীও ঘুমোয়, কিন্তু সমুদ্র ঘুমোয় না। মানুষ ক্লান্ত হয়, কিন্তু সমুদ্র হয় না। সমুদ্রের কোন ক্লান্তি নেই, আনন্দ নেই, বেদনা নেই। তাই সে সারাক্ষণ ডাকে এক ভাবে।

রাস্তার ধার থেকে মনে হল আমাকেও কেউ ডাকছে। ভাল করে চেয়ে দেখলুম যে তিনি কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। কলকাতা থেকে পুরী এসেছেন বেড়াতে।

প্রথমে তিনি একজন পথচারীর কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে বিড়ি ধরালেন একটা, তারপরে বললেন : আপনি এখানে কী করছেন?

আমি সংক্ষেপে বললুম : তীর্থ করতে এসেছি।

ভদ্রলোক একটা ভেংচি কেটে বললেন : আর ওদিকে যে সব হয়ে যাচ্ছিল। তীর্থ করবার এই সময়ই বটে।

হালদার মশাইকে সেদিন আমার বড় রহস্যময় মনে হয়েছিল। আগেও তাঁকে অনেকবার এই রকম মনে হয়েছে। গল্প বলবার তাঁর একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। আগের কথা পরে বলবেন, আর পরের কথা আগে। কৌতূহল জাগিয়ে মানুষকে পীড়া দেবেন। বিড়িটা শেষ করে বললেন : আপনার সঙ্গে আমার কত দিনের পরিচয়?

বললুম : বছর দেড়েকের।

মাত্র দেড় বছর! কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। দেড় বছরের পরিচিত মানুষের জন্যে কি কারও এমন টান হয়! এখানকার মাটিতে পা দিয়ে অবধি আমি ভাবছিলুম যে গোপালবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মন্দ হত না। অঘোর গোস্বামী দুঃখ করছিলেন কিনা, কাউকে কিছু না বলে ছেলেটা কোথায় চলে গেল!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : দেখা হয়েছিল নাকি তাঁর সঙ্গে!

হালদার মশাই বললেন : শুধু দেখা নয়, কাজও হয়েছে। সব কথা শুনলে হালদারকে খুব খারাপ লোক বলে আর মনে হবে না।

অনেক চেষ্টায় আমি সব কথা জানতে পারলুম। জো রায় তাঁকে একশো টাকা দিয়েছিলেন দ্বারকা থেকে ফেরার পথে। কথা ছিল যে আর চারশো টাকা পরে দেবেন। এ টাকাটা ভদ্রলোকের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ঘুষ। ভেতরের অনেক খবর নাকি তিনি জানেন। কিন্তু চোখের আড়াল হতেই জো রায় এই পাওনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ হালদার মশাই তা ভুলতে পারেন না। কলকাতায় তার বাপের কাছে গিয়েছিলেন ছেলের খোঁজ নিতে। আর সেখানেই তার বিয়ের খবর শুনেছিলেন। জো রায় যে পাত্র খারাপ, অঘোর গোস্বামীর কাছে তা বলা চলে না। তীর্থ স্থানে নাকি শপথ করেছিলেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছেই মেয়ের কথা বললেন। মেয়ে ভাল, কিন্তু—

হালদার মশাই একগাল হেসে বললেন: এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না।

তারপর?

তারপর বললুম বুড়োকে, বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে আসুন অঘোর গোস্বামীকে। সে কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। দুই বুড়োয় কী কথা হল জানি নে ভাই, গোসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম যে বিয়ে ভেঙে গেছে।

বিস্ময়ের আমার অবধি ছিল না।

হালদার মশাই আমার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললেন: এবারে কার পয়সায় এখানে এসেছি, তাও কিছুতে বলব না। শপথ করেছি কিনা!

ভদ্রলোককে সেদিন বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের মতো সুন্দর। আমার উদ্বিগ্ন জীবনটাকে তিনি বোধহয় শান্ত সুন্দর করে দিয়েছিলেন।

এবারে আমার চোখের পাতায় ঘুম নামছে।

১৪

ভোব বেলায় যখন আমাব ঘুম ভাঙল, মনোরঞ্জন তখনও অকাতরে ঘুমচ্ছে। সকালের আলো ঘবেব ভিতবে ছড়িয়ে পড়েনি, স্নিগ্ধ বাতাসে শবীব বেশ শীতল হয়েছে। মনটাও বড় হাল্কা মনে হচ্ছে, বাতারাতি যেন বুকেব উপব থেকে একখানা ভাবি পাথব হঠাৎ নেমে গেছে। চোখ বগড়ে আমি উঠে বসলুম। বন্ধ ঘবেব ভিতবে বসে থাকতে আব ইচ্ছা হল না।

মনোরঞ্জনকে জাগাবাব ইচ্ছা আমাব ছিল না। পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দরজার খিল খুলতেই সে বলে উঠল : কোথায় যাচ্ছ ?

ধবা পড়ে গিয়ে আমি ফিবে এলুম না, বললুম : গঙ্গাব ধারে।

গম্ভীর গলায় মনোবঞ্জন বলল : দাঁড়াও, আমবাও যাব।

তাব কথা শুনে আমার হাসি পেল। সে হয়তো ভেবেছে যে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। তাই বললুম : ভয় নেই তোমার, আমাব সম্পত্তি আমি তোমাব জিম্মাতেই বেখে যাচ্ছি।

তা জানি।

বলে মনোরঞ্জনও তার গায়ের চাদরখানা ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল।

আমি বললুম : বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি !

বলে বাহিবে বারান্দায় বেরিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম। পাশের ঘর থেকে মিসেস মুখার্জি মনোরঞ্জনকে ডেকে বললেন : এত সকালে কোথায় বেরচ্ছেন ঠাকুরপো ?

মনোরঞ্জন বলল : বদ্ধ ঘরে ভায়ার মন টিঁকছে না, গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছে।

মিসেস মুখার্জি বললেন : একটু দেরি করে বেরলে হয় না! চায়ের জল যে স্টোভে চড়াচ্ছি।

বাদানুবাদ না করে দেরি করতেই হল। তারাপদ বাবু উঠলেন, সাবিত্রী ও পাঁচুও উঠল। মুখ হাত ধুয়ে বেড়াতে বেরবার জন্যে সবাই তৈরি হয়ে নিলুম। মিসেস মুখার্জি আমাদের চা খাওয়ালেন। তাঁর তৈরি হতে আরও কিছু সময় লাগল।

পথে নেমে মনোরঞ্জন বলল : গঙ্গার দিকে তো যাচ্ছ! ঘাট দেখে আশ্চর্য হবে। মন্দিরের মতো ঘাটও এখানে অগণিত। বারে বারে দেখেও সমস্ত ঘাটের নাম এখানে মনে রাখা যায় না।

বললুম : ঘাটের দৃশ্য দেখতে হলে নৌকোয় উঠতে হয়। সমস্ত কাশী শহরটাই এক নজরে দেখা যাবে।

পাঁচু লাফিয়ে উঠল : নৌকোয় আমি কোনদিন চড়িনি কাকাবাবু।

তারাপদ বাবু বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন, বললেন : নৌকোয় উঠবেন নাকি!

উত্তর দিলেন মিসেস মুখার্জি, বললেন : কেন, কাশীতে এসেও মরবার ভয় নাকি! এ তো ব্যাসকাশী নয় যে মরে গাধা হবে!

পাঁচু বলল : ব্যাসকাশী কোথায় মা?

মিসেস মুখার্জি মনোরঞ্জনের দিকে তাকালেন, আর মনোরঞ্জন তাকাল আমার মুখের দিকে। বললুম : ব্যাসকাশী গঙ্গার ওপারে রামনগরে।

মনোরঞ্জন বলল : গাধা হবার গল্পটাও শুনিয়ে দাও না।

এই রকমের গল্প শুনিয়ে অতীতে প্রশংসার বদলে কৌতুকের পাত্র হয়েছি। অভ্যাসের দোষে তবু আবার গল্প শোনালুম।

পাঁচু হেসে উঠল। আমি দেখলুম যে সাবিত্রীও হাসছে। তারাপদবাবু বললেন : ছেলেবেলায় এ গল্প শুনেছিলুম বলে মনে পড়ছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। সিঁড়ি দিয়ে মনোরঞ্জনকে নামতে দেখে এক পাল নৌকোওয়ালা তাকে আক্রমণ করল। একখানা খোলা ডিঙ্গি নৌকো ঠিক করে মনোরঞ্জন আমাদের ডাকল ঃ চলে আসুন।

আমরা সবাই গিয়ে সেই নৌকোয় উঠলুম।

মনোরঞ্জন বলল ঃ একেবারে ডাকাত। পাঁচ টাকা থেকে পাঁচ সিকেয় নামিয়েছি, আর একটু কড়া হতে পারলে হয়তো পাঁচ আনায় নামত।

মাঝি বাঙলা বোঝে, বলল ঃ না বাবু, পাঁচ আনার নৌকো জলে ভাসে না।

তাহলে দশ আনা।

নৌকোর মুখ বাঁয়ে ঘুরিয়ে মাঝি বলল ঃ ভাল করে সব দেখিয়ে দিই, খুশী হয়ে বকশিস দেবেন।

মনোরঞ্জন এ কথার উত্তর দিল না, বলল ঃ ঠেলে একটু নদীর মাঝখানে চল, কাশীর রূপটা একবার দেখি। উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপর অর্ধচন্দ্রাকার শহর বলে কত নাম শুনেছি!

মাঝি আবার নৌকোর মুখ সোজা করে ঠেলতে লাগল মাঝ দরিয়ার দিকে। ক্রমে ক্রমে কাশী শহর আমাদের চোখের সামনে উদঘাটিত হল। মন্দিরময় অপরূপ সুন্দর শহর সকালের সূর্যালোকে ঝলমল করছে। সূর্য উঠেছে গঙ্গার পরপারে, আর তার আলো কাশীর ঘাটে ঘাটে সৌধে অট্টালিকায় মন্দিরশিখরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। এক অদ্ভুত আবেশে দেহ মন আমার পুলকিত হয়ে উঠল।

শহরের দুটি প্রান্তই এক সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবাহিনী অসি নদী যেখানে গঙ্গায় পড়েছে, সেইখানেই অসি ঘাট। জন-বিরল। কোন বাঁধানো ঘাট নেই, নেই কোন সমারোহ। রামনগরের দিক থেকে আসবার সময় এই ঘাটই আমি প্রথম দেখেছিলুম।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাবা যাবে, তারা এই ঘাটে নেমেই শহরে যায়। রিক্সা পাওয়া যায় ঘাটের কাছ থেকে কিন্তু এই ঘাটকে কাশীর ঘাট বলে মনে হয় না।

মুখ ফিরিয়ে আমি অন্য দিকে তাকালুম। উত্তরবাহিনী গঙ্গা পূর্ব দিকে হেলেছে। শহর যেখানে শেষ হয়েছে সেই খানেই রেলের পুল। ইংরেজের আমলে এই পুলের নাম ছিল ডাফরিন ব্রিজ। এখন এই পুল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নামে মালব্য পুল নামে পরিচিত। এই পুলের নিচেই রাজঘাট কাশী স্টেশনেরই সংলগ্ন। কাচা মাটির ঘাট। যে যাত্রীরা কাশী স্টেশনে নামে, তারা এই ঘাটে এসে স্নান করে। পাড়ের উপর প্রাচীন কাশীর অনেক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

শহর এই খানেই শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পঞ্চক্রোশী কাশী পরিক্রমার শেষ এখানে নয়। গঙ্গার ধারে ধারে আরও অনেকটা এগিয়ে বরুণা সঙ্গম ঘাট। দক্ষিণমুখী বরুণা এঁকে বেঁকে এসে গঙ্গায় মিলেছে। সেই খানেই পঞ্চতীর্থের শেষ। কাশীর পূর্ব সীমান্ত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অগণিত যাত্রী সেখানে স্নান করতে যায়।

সমগ্র বারাণসী এই গঙ্গার ঘাটে স্পন্দিত হচ্ছে। অবিচ্ছিন্ন শহর ঘাটে ঘাটে সংলগ্ন হয়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের আর কোথাও এমন শহর আছে কিনা জানিনে।

মিসেস মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন: মণিকর্ণিকা ঘাট কোন্‌টা ঠাকুরপো?

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি মাঝিকে বললুম: ধীরে ধীরে ঐদিকেই চল।

মাঝি এবারে ঘাটের দিকে নৌকো ঠেলতে লাগল। বলল: কাশীতে ঘাটের তো শেষ নেই বাবু, সব ঘাটের নাম মনে রাখাও যায় না। তবে আপনাদের সুবিধা আছে, ঘাটের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে তার নাম লেখা আছে।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বলল : সত্যি নাকি !

'আমিও বিস্মিত হয়েছিলুম। কাল যখন অসি ঘাট থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত এসেছি, তখন আমি এ জিনিস লক্ষ্য করি নি। মাঝি এ কথা না বলে দিলে হয় তো আজও আমাদের নজরে কিছু পড়ত না।

আজ আমরা প্রথমে যে ঘাট দেখলুম, তার নাম মানমন্দির ঘাট। মানসিংহ থেকে বোধহয় এ নাম হয় নি, এ নাম হয়েছে মানমন্দির থেকে। বিরাট একটি দুর্গের মতো অট্টালিকা গঙ্গার ধার থেকেই ঠেলে উঠেছে, কয়েকতলার সমান উঁচু কারুকার্যহীন ন্যাড়া বাড়ি। একেবারে উপরের দিকে কয়েকটি অলিন্দ দেখতে পাচ্ছি, রেলিঙ দিয়ে ঘেরা এই অলিন্দে দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখা যাবে অনেক নিচে। সে নিশ্চয়ই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মাঝির কাছে শুনলুম যে এগুলো নাকি ভেঙ্গে গিয়েছিল, পরবর্তী কালে মেরামত করা হয়েছে। এখন শুধু সেকালে তৈরি একটিমাত্র ব্যালকনি আছে। দূর থেকেই তার কারুকার্য দেখা যাচ্ছে, অপরূপ তার শিল্পকলা। মনে হল যেন মোগল আমলে তৈরি আগ্রার কোন অলিন্দ দেখছি। কতকটা তাই। মানসিংহ ছিলেন আকবর বাদশাহের সেনাপতি, কাশীর এই প্রাসাদটি যে তিনি নির্মাণ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছাদের একাংশে যে মানমন্দির, নৌকো থেকে তা দেখা যায় না। ঘাটে নৌকো ঠেকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সড়কের উপরে উঠতে হয়। প্রাসাদের ভিতরে ঢোকবার ফটক আছে সেখানে। তার পরে উঠতে হয় ছাদে। এই মানমন্দিরটি মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সোয়াই রাজা জয়সিংহ যে এটি নির্মাণ করেছিলেন পণ্ডিতদের তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের ইতিহাসে জয়সিংহের জ্যোতির্বিদ্যার খ্যাতি অক্ষয় হয়ে আছে। বিদেশ থেকে তিনি জ্যোতির্বিদ এনেছিলেন। মেনুমেনন নামে এক পর্তুগীজ পাদরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জয়সিংহ তাঁর মুখে পর্তুগালের গল্প শুনলেন,

শুনলেন সে দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রে উন্নতির গল্প। রাজা আর দেরি করলেন না, নিজের কয়েকজন পণ্ডিতকে পাঠালেন পর্তুগালের রাজা ইম্যানুয়েলের কাছে। এঁদের সঙ্গে ভারতে এলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সেভিয়ার-ডি-সিল্‌ভা। সঙ্গে আনলেন ডি-লা-হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক। সেই সমস্ত ফরমূলা আর টেবল নিয়ে জয়সিংহ নিজে গণনা কবলেন দিনের পব দিন। তাবপবে হতাশ হয়ে সবই ফিরিয়ে দিলেন। পাদবী সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ আপনার কাজে লাগল না?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাজা বললেন, না।

তারপব বুঝিয়ে দিলেন সেগুলিব দুর্বলতার কথা। কাগজ কলমে খুবই ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু পবিদর্শনেব সঙ্গে অনেক প্রভেদ দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রেব স্থিতি নির্দেশে অর্ধ অক্ষাংশ ও চন্দ্রসূর্যের গ্রহণে প্রায় পনর পলেব প্রভেদ। এই প্রভেদ যে চন্দ্রের নিকৃষ্ট ব্যাসের জন্য হচ্ছে, তাও বলে দিয়েছিলেন।

জ্যোতির্বিদ টুলুক বেগের খ্যাতি ছিল তুর্কিস্থানে, তাঁরও অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। জয়সিংহ সে সবেবও ভুল বাব করে সবাইকে বিস্মিত কবেছিলেন।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, জয়সিংহ এই জ্যোতির্বিদ্যা বিদ্যাধর নামে এক বাঙালীর কাছে শিখেছিলেন। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যাধর জয়পুর শহরের প্ল্যান তৈরি করেছিলেন, আর দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহর অনুরোধে পঞ্জিকা সংস্কারও করেছিলেন।

এখানকার মানমন্দির সম্বন্ধে কারও কোন কৌতূহল দেখলুম না। আমি একসময় এটি দেখে নিয়েছিলুম। নক্ষত্রের গতি নির্ণয়ের জন্য জয়সিংহ যে সব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে জয় প্রকাশ রাম যন্ত্র ও সম্রাট যন্ত্র প্রধান। সম্রাট যন্ত্রের ব্যাসার্ধ প্রায় বারো হাত। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি হিপার্কাস টলেমি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদের গণনার ভুল ধরেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত আরও অনেক

যন্ত্র দেখেছিলুম—ভিত্তি যন্ত্র চক্র যন্ত্র। কিন্তু কোন্ যন্ত্রের কী ব্যবহার তা জানবার সুযোগ পাই নি।

ললিতা ঘাট পেরিয়েই একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। বড় বড় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের চূড়ো সোনালি রোদে চকচক করে উঠেছিল। এ কোন পাথরের তৈরি মন্দির নয়, সোনার পাতে মোড়া সূক্ষ্মাগ্র মন্দিব। আমি সবিস্ময়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম ঃ ঐ গাছের আড়ালে কি কোন মন্দির আছে?

মাঝি বলেছিল ঃ ওটা নেপালী মন্দির।

যাঁরা দেখতে পাননি, তাঁরা ঐ মন্দির দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। মাঝি তাব নৌকোটি এমন একটি জায়গায় নিয়ে এল যেখান থেকে ঐ মন্দিরটি ভাল দেখা যায়। একেবারে স্বতন্ত্র গড়নের মন্দির, বৌদ্ধ প্যাগোডার মতো মনে হয়। এই রকমের দুটো ছাদওয়ালা মন্দির নাকি চীনে আছে তুষারপাত প্রতিরোধের জন্যে।

অনেকদিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। আমার এক বন্ধু কাশী থেকে ফিরে বোধহয় এই মন্দিরটির কথাই আমাকে বলেছিল। বিদেশী যাত্রীর ভিড় দেখেছিল সে এই মন্দিবে। তারা অজস্র ছবি তুলছিল। মন্দিরের বন্ধ দরজায় কাঠের উপরে সুন্দর কারুকার্য ছিল, কিন্তু সে ছবি তারা নেয়নি। তারা বাহিরে দাঁড়িয়ে উপরের ছবি নিচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে সেও দেখেছিল মূর্তিগুলি। ছাদের কাছাকাছি একসারি মূর্তি আছে খানিকটা দূরে দূরে, সবই অশ্লীল মূর্তি। বিদেশীরা এই সব মূর্তির ছবি প্রচুর আগ্রহ সহকারে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি। দেশে ফিরে এই সব অশ্লীল ছবি বড় করে ছাপে নিজেদের কুরুচি চরিতার্থের জন্য, আর ভারতবাসীকে একটা অসভ্য জাত বলে বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য দেশের সরকার আজকাল এদেরই পুজো করছে।

মন্দির শুনে মিসেস মুখার্জি নামবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মনোরঞ্জন নামতে দিল না। বলল: এখন থাক, অন্য সময়ে এসে দেখে যাব।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা একটি সুন্দর ঘাট চোখের সামনে দেখতে পেলুম। শুধু ঘাটের উপরেই মন্দির নয়, দূরে একটি মন্দির বুঝি জলের মধ্যেই কাৎ হয়ে আছে। পাঁচু বলে উঠল: সামনের ঐ ঘাটে কেন আগুন জ্বলছে কাকাবাবু?

উত্তর দিল নৌকোর মাঝি, বলল: এইটেই মণিকর্ণিকা ঘাট, কাশীর শ্মশান।

দূর দূরান্তর থেকেও নাকি এই ঘাটে শবদাহ করতে আসে। তাই এ ঘাটে কখনও চিতার আগুন নেবে না। শাস্ত্রের বিধানই এই—ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্মশান মণিকর্ণিকায় কোনদিন চিতার আগুন নিববে না।

মণিকর্ণিকা নাম কেন হল, তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। কেউ বলেন, পার্বতীর কর্ণভূষণ এখানে পড়েছিল, কেউ বলেন বিষ্ণুর, আবার কেউ শিবের কর্ণভূষণ বলেন। আমাদের শাস্ত্রেই দুরকম গল্প আছে। স্নানসংহিতায় আছে যে বিষ্ণুর কান থেকে কর্ণভূষণ পড়েছিল। আর কাশীখণ্ডের মতে তা শিবের কান থেকে পড়েছিল। চক্র দিয়ে বিষ্ণু এখানে চক্র পুষ্করিণী খনন করেছিলেন, সেইখানে তাঁর তপস্যা দেখে বিস্ময়ে শিব মাথা দুলিয়েছিলেন। তাইতেই তাঁর কর্ণভূষণ পড়ে এই তীর্থের নাম মণিকর্ণিকা হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে যে মানুষের অন্তিম সময়ে বিশ্বনাথ তার কানে তারক ব্রহ্ম উপদেশ দেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। মতান্তরে এই স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণি ও তাঁর চরণের কর্ণিকা। নাম যে কারণেই হোক মণিকর্ণিকার মতো মহাতীর্থ কাশীতে আর নেই।

সৌরপুরাণ ঠিকই বলেছেন—

নাস্তি গঙ্গা সমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্॥

গঙ্গার মতো তীর্থ নেই, আর বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরেব প্রিয় মণিকর্ণিকাব মতো তীর্থও দুর্লভ।

এই স্থানটিতেই মন্দিরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঘাটের উপরে পাশাপাশি অনেকগুলি মন্দিব। প্রথম বুঝি জলশায়ী ঘাট, তারপরে মণিকর্ণিকা। জলশায়ী ঘাটের উপরে জলশায়ী বিষ্ণুর মন্দির। আর মণিকর্ণিকায় তারকেশ্বরের মন্দির। কাশীবাসীর শেষ সময়ে তাব কানে তারকব্রহ্ম জ্ঞান দেন এই তাবকেশ্বর। তারপবে সিদ্ধ বিনায়কের মন্দির, সেখানে পূজা হয় মূষিকবাহন গণেশের। লাল রঙের যে সুন্দর মন্দিরটি ঘাটের উপবে ঝুঁকে আছে সেটি অযোধ্যার আমেঠি রাজের মন্দির নামে পরিচিত। আর একটি দর্শনীয় স্থান আছে দেখবার, তার নাম চরণপাদুকা। একটি পাথবের উপরে বিষ্ণুর দুপায়ের চিহ্ন। বিষ্ণু নাকি এইখানে দাঁড়িয়ে শিবের তপস্যা করেছিলেন। কার কাছে যেন শুনেছিলুম যে দুএকজন ভাগ্যবানেব শব এই চরণপাদুকার উপরে দাহ করা হয়। সাধারণ মানুষেব শব নানাস্থানে দাহ হচ্ছে। তারই আগুন দেখতে পাচ্ছি কয়েক জায়গায়।

সামনের যে মন্দিরটি জলের ভিতর কাৎ হয়ে আধখানা ডুবে আছে, তার সম্বন্ধেও একটি গল্প শুনেছিলুম। কোন মহিলা নাকি মায়ের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেছিলেন, মা, তোমার ঋণ শোধ করলাম। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মন্দিরটি মাটির নিচে বসে গেল, কাৎ হয়ে গেল তার শিখর। গঙ্গার জলে এখন তার নিচেটা সারাক্ষণ ডুবে থাকে। লোকে তাই বলে, মায়ের ঋণ কি শোধ হয়!

আমরা থামলুম না। ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম।

দত্তাত্রেয় ঘাটে দত্তাত্রেয় মুনির একটি ছোট মন্দির আছে। তারপরে সিন্ধিয়া ঘাট। একদা এই ঘাটটি অনেক সুন্দর করে বড় করে নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু নিজের ভারেই বসে গিয়েছিল। এটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা রানী বৈজা বাঈ এই ঘাটটি নির্মাণ করেছিলেন সোয়া শো বছর আগে। এর দুটো ঘাট পরে ভোসলা ঘাট। কাশীর লোকে ভুল করে বলে ঘোমলা ঘাট। এটি নির্মাণ করেছেন নাগপুরের রাজারা। এটিও একশো বছরের বেশি পুরনো হবে। পরের ঘাটটি নির্মাণ করেছেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও। রাম ঘাট জয়পুরের রাজার তৈরি।

এর পরে বড় ঘাট হল পঞ্চ গঙ্গা ঘাট। এটি নির্মাণ করেছেন অম্বরের রাজা মানসিংহ আকবর বাদশাহর আমলে। একদা নাকি পাঁচটি নদী প্রবাহিত হত এই তীর্থে, তাই এর নাম হয়েছে পঞ্চ গঙ্গা। এখন শুধু গঙ্গা আছে, ধার্মিকেরা বলেন যে যমুনা সরস্বতী কিরণা ও ধূতপাপা প্রবাহিত হচ্ছে অন্তঃসলিলা রূপে। পঞ্চগঙ্গা ঘাট পঞ্চতীর্থের অন্যতম। প্রাচীন বিধানে কাশীযাত্রীকে একদিনে এই পঞ্চতীর্থে স্নান করতে হয়। প্রথমে অসি সঙ্গমে, তারপর দশাশ্বমেধে, বরুণা সঙ্গমে তৃতীয় স্নান করবার পর ফেরার পথে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে, আর সবশেষে স্নান মণিকর্ণিকায়। এসব বিধান আজকাল যাত্রীরা জানে না, মানেও না কেউ।

এই ঘাটের উপরেই ঔরঙ্গজেব বাদশাহর ছোট মসজিদ। কিন্তু মিনারগুলি খুবই উঁচু। নিচের ভিৎ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল বলে জেম্‌স্ প্রিন্সেপ নাকি ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে দিয়েছেন। প্রাচীন পরিব্রাজক টাভার্নিয়ার এখানে এসেছিলেন ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বলেছিলেন যে বিন্দুমাধব নামে বিষ্ণুর মন্দিরের উপরই এই মসজিদটা বাদশাহ নির্মাণ করেছিলেন। এ অঞ্চলের লোকেরা তাই বোধহয় এই মসজিদকে মাধো রায় কি মসজিদ বলে। দেড়শো ফিট উঁচু

এই সব মিনারের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য যে অতি মনোরম দেখাবে তাতে সন্দেহ নেই। মসজিদের ছাদের উপর থেকেও নাকি সারনাথের স্তূপ ও বিন্ধ্যাচলের পাহাড় দেখা যায়।

মাঝি বলল : এইখানেই ছিল বেণীমাধবের ধ্বজা।

তারাপদ বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি নিশ্চয়ই ছেলেবেলায় দেখেছেন ?

তারাপদবাবু তাঁর শৈশবের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। বললেন : বোধহয় দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর কিছু মনে পড়ছে না।

তৈলঙ্গ স্বামীও কি এইখানেই বাস করতেন !

মনোরঞ্জন বলল : আর এগিয়ে কী হবে! এইখান থেকেই ফেরা যাক।

নৌকোর মুখ ফেরাচ্ছে দেখে মাঝিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : সামনে আর কতগুলো ঘাট আছে ?

মাঝি বলল : ঘাটের কি শেষ আছে! আরও পাঁচটা ঘাটের পরে গায় ঘাট। ঘাটের উপরে একটি পাথরের গাই আছে বলে গায় ঘাট নাম। তারপরে ত্রিলোচন ঘাট ও প্রহ্লাদ ঘাট। প্রহ্লাদ ঘাটেই বাঁধানো ঘাট শেষ হয়েছে, আর ওখান থেকেই গঙ্গার সব ঘাটগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

মনোরঞ্জন বলল : রাজঘাট কোথায় ?

মাঝি বলল : প্রহ্লাদ ঘাটের পরে কাঁচা মাটির ঘাট, ঐ পুলের ঠিক নিচেই।

বরুণা সঙ্গমঘাট বুঝি আরও দূরে ?

মাইল খানেকের কম। সেখানেও অনেকগুলি মন্দির আছে। আর আছে লাল খানের সমাধি। বেনারসের রাজাদের একজন মন্ত্রী ছিলেন লাল খান।

এবারে আমাদের ফেরার পালা। নৌকো এগোচ্ছে ধীরে ধীরে।

আমরা উজিয়ে চলেছি। তারাপদ বাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিম্ন স্বরে কথা বলছিলেন। আর পাঁচু সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিল মাঝির দিকে, নৌকো বাওয়ার কায়দাটি বোধহয় মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার পুরনো কথা মনে পড়ল।

আমাদের শাস্ত্র মতে যেমন সত্য যুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য ও দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ছিল শ্রেষ্ঠ তীর্থ, কলিতে তেমনি গঙ্গার চেয়ে বড় তীর্থ আর নেই। গঙ্গার জল পবিত্র, গঙ্গায় স্নান করে শুধু দেহ নয় মনও পবিত্র হয়। পুরাতন পাপও এই গঙ্গার জলে ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যায়।

কাশীখণ্ডে গঙ্গা মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যত তীর্থ আছে, তার মধ্যে গঙ্গাই প্রধান। গঙ্গার সঙ্গে ত্রিলোকের আর কোন তীর্থের তুলনা হয় না। শাস্ত্রে অনেক রকমের যাগ-যজ্ঞ বিহিত আছে। সেই সমস্ত যাগযজ্ঞ করে যে ফল হয়, তার শত গুণ বেশি ফল হয় গঙ্গার দর্শনে। এমন কোন পাপ নেই যা গঙ্গার জলে ধুয়ে যায় না, আর এমন কোন অভীষ্ট নেই যা গঙ্গাস্নানে পূর্ণ হয় না। গঙ্গাকে তাই পবিত্র রাখবার জন্য অনেক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। শুধু শৌচ আচমন প্রভৃতি নয়, গঙ্গায় ক্রীড়া ও সন্তরণও নিষিদ্ধ। আর নিষিদ্ধ গঙ্গা তীরে দান গ্রহণ।

গঙ্গার গর্ভ থেকে দেড়শো হাত পর্যন্ত ভূমিকে গঙ্গা তীর বলে। গঙ্গার গর্ভ মানে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গঙ্গার জলধারা যতটা প্লাবিত করে ততটা ভূমি। গঙ্গার দুই তীরের দুই ক্রোশ পরিমিত স্থানকে গঙ্গার ক্ষেত্র বলে। গঙ্গার তীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার ও অর্থাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও কারও দান প্রতিগ্রহ ধর্মবিরুদ্ধ। আবার গঙ্গাক্ষেত্রে দান করতে পারলে অনেক পুণ্য অর্জন হয়। যাগযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের প্রশস্ত স্থান হল গঙ্গাক্ষেত্র। ব্রহ্ম পুরাণে আছে যে গঙ্গাতীরে বাস করেই মুক্তিলাভ করা যায়। এক গণ্ডূষ

গঙ্গাজল পান করে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়, ত্রিবাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করে নরক ভোগ এড়ানো যায়।

গঙ্গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা কথা আছে। এমন কথাও আছে যে গঙ্গাব উদ্দেশ্যে গমন করলে পরদ্রোহ পরদ্রব্য হবণ ও পবদার্য পাপও দূব হয়, গঙ্গা দর্শন করে লাভ হয় আয় জ্ঞান ঐশ্বর্য সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, তাবপব গঙ্গাজল স্পর্শ কবে গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ও গুরু হত্যাব পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। পশুরাজ সিংহকে দেখে মৃগবা যেমন ভয়ে পলায়ন কবে, তেমনি যমদূতেরাও মানুষকে গঙ্গাস্নান কবতে দেখে পালিয়ে যায়। অজ্ঞানে স্নান করলেও সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যায়।

গঙ্গাব এই মাহাত্ম্যেব কাবণ জানতে হলে গঙ্গা কে ছিলেন সেই কথাটি আমাদের প্রথমে জানতে হবে। গম্যাতে ব্রহ্মপদমনয়া বা গচ্ছতীতি এই অর্থে গঙ্গা। ঋগ্বেদে শতপথ ব্রাহ্মণে কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে গঙ্গাব উল্লেখ আছে, কিন্তু সবস্বতীব মতো তার স্তুতি নেই। ঋগ্বেদেব ঋষিদেব কাছে সবস্বতী অনেক প্রিয় নদী, সবস্বতীব মহিমা কীর্তনে অনেক সময়েই তাঁবা আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু গঙ্গার সম্বন্ধে তাঁদেব সে ধারণা ছিল না। অনেকে অবশ্য মনে কবেন যে ঋগ্বেদেব বচনা কালে তাঁবা সবস্বতী নদীব উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, গঙ্গা দেখেছিলেন পরবর্তী কালে। তাই ঋগ্বেদে গঙ্গাব উল্লেখ মাত্র আছে, স্তব স্তুতি নেই।

গঙ্গার কাহিনী আমরা নানা পুবাণে পেয়েছি।

দেবী ভাগবতের মতে গঙ্গা বিষ্ণুর পত্নী। তাঁর অন্য দুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও সবস্বতী। তাঁরা তিন জনেই বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সঙ্গে বাস কবতেন। একদিন গঙ্গা বিষ্ণুকে কয়েকবার কটাক্ষ করেছিলেন, তাই দেখে বিষ্ণু হেসেছিলেন, আর সরস্বতী গিয়েছিলেন চটে। বিষ্ণু সেখান থেকে সবে যেতেই দুজনে কলহ বেধেছিল, তারপর দুজনেই দুজনকে শাপ দিয়েছিলেন—নদী হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হও।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই কাহিনী কিছু অন্যরকম। এক সময়ে গঙ্গার প্রতি বিষ্ণুর বেশি আসক্তি দেখে সরস্বতী ঈর্ষান্বিত হলেন। এই নিয়েই তুজনের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল, আর তুজনে তুজনকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে এসেছিলেন নদী হয়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে বিষ্ণুর দেহ থেকে গঙ্গার জন্ম হয়েছে। গঙ্গার আর এক নাম বিষ্ণুপদী, তাই অনেকের ধারণা যে বিষ্ণুর পা থেকে গঙ্গার জন্ম। কিন্তু এই কথা যে একটি রূপক তা বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রকে অবলম্বন করে যে মেঘাবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পৌরাণিক তাকেই বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলে বর্ণনা করেছেন। সেই মেঘের বর্ষণে গঙ্গার উৎপত্তি বলেই তিনি বিষ্ণুপদী নামে অভিহিত।

উজ্জ্বল রৌদ্রে পৃথিবী তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীরা এসেছে গঙ্গা স্নানে। পুরুষ ও মেয়েরা নির্বিচারে স্নান করছে। কোন কোন ঘাটে মেয়েদের জন্যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা আছে, কোন ঘাটে তা নেই। তার জন্যে কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আমার মুখের উপরে রোদ পড়ছিল বলে আমি মাথা নিচু করে বসে ছিলুম, আর ভাবছিলুম নানা কথা। নীরবে বসে থাকতে মনোরঞ্জনের ভাল লাগছিল না, বলল : অমন মুখ গোমড়া করে আছ কেন?

বললুম : গঙ্গার কথা ভাবছি।

মনোরঞ্জন বলল : কোন গল্প বলবে নাকি?

পুরাণের গল্প কি ভাল লাগবে?

পাঁচু বলল : খুব ভাল লাগবে।

গঙ্গার জন্ম বিষয়ে পুরাণের আর একটি কাহিনী আমি বললুম।

দেবর্ষি নারদ ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। ভাল গান গাইতে না জানলেও তাঁর মনে গর্ব ছিল। তিনি নিজেকে একজন উঁচু দরের

সঙ্গীতজ্ঞ বলে ভাবতেন। একবার বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্বের গান শুনে দেবর্ষি ঈর্ষান্বিত হলেন, মনে মনে স্থির করলেন যে সঙ্গীতে তাঁকে পরাস্ত করতে হবে। এই তুম্বুরু ব্রহ্মার কাছে গান শিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে নারদ উলুকেশ্বর নামে আর একজন গন্ধর্বের নিকট গান শিখতে গেলেন। এক হাজার দিব্য বৎসর গান শেখার পর তাঁর ধারণা হল যে তুম্বুরুকে এবারে সহজেই জয় করতে পারবেন। এই ভেবে তুম্বুরুর বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

পথে কয়েকজন বিকলাঙ্গ স্ত্রীপুরুষ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

তারা উত্তর দিল, আমরা রাগরাগিণী।

তোমাদের এমন দশা কেন?

তারা বলল, নারদ মুনির জন্যে আজ আমাদের এই দশা। তাঁর গানেই আমরা বিকলাঙ্গ হয়েছি।

দেবর্ষি দুঃখিত হলেন, লজ্জিতও হলেন, বললেন: এখন কী উপায় বল, কী করলে তোমরা পূর্বরূপ ফিরে পাবে?

রাগরাগিণীরা বলল: মহাদেব যদি গান করেন, তাহলেই তা সম্ভব।

নারদ মহাদেবের কাছে গিয়ে সব কথা নিবেদন করলেন। তিনি গান গাইতে রাজী হলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত শ্রোতা চাই। নারদ বুঝলেন যে সঙ্গীতের শ্রোতা হবার যোগ্যতাও তাঁর হয়নি। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের কথায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ধরে আনলেন।

মহাদেবের গানে রাগরাগিণীরা তাদের পূর্বরূপ ফিরে পেল। কিন্তু ব্রহ্মা সেই সঙ্গীতের মর্ম কিছুই বুঝলেন না, বিষ্ণু বুঝলেন অল্প। তাতেই তিনি দ্রবীভূত হয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় নিলেন। এই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা, এইজন্যেই আমরা বিষ্ণুর দেহ থেকে গঙ্গার জন্ম বলি।

তারাপদবাবুও মনোযোগ দিয়ে আমার গল্প শুনছিলেন। আমি থামতেই তিনি বললেনঃ সত্যি নাকি!

ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গা কেমন করে আশ্রয় নিলেন, সে সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আমার জানা ছিল। কিন্তু কিছু অশ্লীল বলে আমি তা বললুম না। নগাধিরাজ হিমালয় বিবাহ করেছিলেন সুমেরু-দুহিতা মেনকাকে। উমা ও গঙ্গা তাদের দুই কন্যা। উমার বিবাহ হয়েছিল শিবের সঙ্গে, আর কোন বিশেষ কারণে দেবতারা গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন হিমালয়ের কাছ থেকে। একবার মহাদেবের তেজ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, গঙ্গা সেই তেজ ধারণে অসমর্থ হওয়ায় শরবনে তাকে রক্ষা করা হয়। কার্তিকের জন্ম হয়েছিল এই শরবনে। সে অন্য কাহিনী। কিন্তু গঙ্গা এই ঘটনার পরে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করছিলেন। সগর বংশের ভগীরথ তাঁর আরাধনা করে পূর্বপুরুষের উদ্ধারের জন্য তাঁকে মর্ত্যে এনে-ছিলেন। সেই কাহিনী আছে রামায়ণে।

মহাভারতেও গঙ্গার কাহিনী আছে। অষ্টবসুকে উদ্ধারের জন্য তিনি মহারাজ শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন। ভীষ্ম তাঁর পুত্র।

আমি নীরবে ছিলুম। তারাপদবাবুর কথার উত্তর দিল মনোরঞ্জন, বললঃ এসব পৌরাণিক কাহিনীর সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের দায়িত্ব আমাদের নেই।

তা বটে।

বলে তারাপদবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

আমি দেখলুম যে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আমরা চলে এসেছি। মাঝি জিজ্ঞাসা করলঃ ওদিকের ঘাটগুলোও দেখবেন তো!

মনোরঞ্জন বললঃ দেখব বৈকি।

আমার মেহনৎটাও তাহলে দেখবেন।

মনোরঞ্জন এ কথার উত্তর দিল না।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিমে শীতলার মন্দির। অন্য ধারে প্রমাণ

আকারের গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মূর্তি, বিষ্ণু ও নরসিংহের মূর্তিও আছে।

এর পরে যে ঘাটটি দেখলুম সেটি অহল্যা বাঈ ঘাট, ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা বাঈএর কীর্তি। দশাশ্বমেধ ঘাটের মতো এই ঘাটও জমজমাট হয়ে ওঠে সন্ধ্যা হলে। প্রশস্ত ঘাট বলে অনেক জনসভা হয়, কথা কীর্তন হয়, সন্ন্যাসীরাও যাত্রীদের নানারকম উপদেশ দেন। এ ঘাটেরও বয়স প্রায় একশো বছর হয়েছে।

এর পরেই একটি সুন্দর ঘাট। নাগপুরের রাজার দেওয়ান মুনশী শ্রীধর এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে নাম রয়েছে মুনশী ঘাট। এখন এটি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার, পিছনে তার বিরাট প্রাসাদ।

উদয়পুরের মহারাজার প্রাসাদের নাম এখন রাণা মহল, তারই নিচে রাণাঘাট। চৌষট্টি ঘাট বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠা। সিংহাসনচ্যুত পেশোয়া রঘুনাথ রাওএর দত্তকপুত্র অমৃত রাও ব্রাহ্মণদের জন্য যে ধর্মশালা তৈরি করেছিলেন, সেখান থেকেই সিঁড়ি নেমেছে রাজা ঘাটে। নারদ ঘাট সোমেশ্বর ঘাট চৌকি ঘাট ছাড়িয়ে পৌঁছলুম মানসরোবর ঘাটে। এই ঘাটটিও অম্বরের রাজা মানসিংহের তৈরি। এই ঘাটের নিকটে একটি পুষ্করিণীর ধারে গোটা ষাটেক জীর্ণ মন্দির আছে।

কেদার ঘাট বাঙালীদের প্রিয় আর দক্ষিণের তেলেঙ্গাদের। বাঙালীটোলার বাঙালীরা আসে এই ঘাটে স্নান করতে, আর পূজো করে কেদারেশ্বরের। বিশ্বেশ্বরের পরেই কেদারেশ্বর। এই ঘাটের মাঝামাঝি আছে গৌরীকুণ্ড, লোকে বলে এই কুণ্ডের জলে ক্ষত নিরাময় হয়। ঘাটের উপরেই কেদারেশ্বরের মন্দির। কেদারেশ্বর দর্শনে হিমালয়ের কেদারনাথ দর্শনের পুণ্য হয় কেন, তার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। বশিষ্ঠ নামে উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ কেদারনাথ দর্শনে যাবার পথে কাশীতে আসেন। এখানে পৌঁছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রতি বৎসর তিনি কেদারনাথ দর্শনে যাবেন। তিনি

কাশীবাসী হয়ে একষট্টিবার হিমালয়ে গিয়ে কেদারনাথ দর্শন করেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সঙ্গীরা তাকে এই অসাধ্য সাধনে বাধা দেন। কিন্তু বশিষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যাবেনই, পথে মৃত্যু হলেও যাবেন। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, হিমালয়ের কেদারনাথ তাঁকে বর দিতে এসেছেন। বশিষ্ঠ বললেন, প্রভু, তুমি যখন সদয় হয়েছ, তখন এইখানেই অবস্থান কর। সেই থেকে কেদারনাথ হিমালয়ে তার অংশ রেখে এইখানে অবস্থান করছেন কেদারেশ্বরের মন্দিরে।

কেদার ঘাট ছাড়িয়েই চিতার আগুন দেখতে পাওয়া যায়। কাশীর প্রাচীনতম শ্মশান ঘাট এটি, নাম হরিশ্চন্দ্র ঘাট। পুরাকালে এই ঘাটেই সূর্যবংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসরূপে এক বৎসর শ্মশানের কাজ করেছিলেন। এক নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তারপর নিজের যথাসর্বস্ব ঋষিকে দান করে নিরাশ্রয় রাজা স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে কাশীতে এসে উপস্থিত হন। এখানে এসে বিশ্বামিত্র রাজার দানের দক্ষিণা চাইলেন। বাধ্য হয়ে রাজা তার রাণী শৈব্যা ও রাজপুত্র রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করলেন, নিজে দাস হলেন এক চণ্ডালের। তারপরে সেই পরম পরীক্ষার দিন এল। সর্পাঘাতে মৃত রোহিতকে কোলে নিয়ে শৈব্যা এলেন শ্মশান ঘাটে। স্বামীকে চিনলেন। হরিশ্চন্দ্রও চিনলেন শৈব্যাকে। রাজপুত্রকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদলেন রাজ্যহীন রাজা রাণী। স্থির করলেন যে পুত্রের চিতায় তারা প্রাণ বিসর্জন দেবেন। কিন্তু প্রাণ তাঁদের বিসর্জন দিতে হল না, কঠিন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছেন। চণ্ডালরূপী ধর্ম এলেন, এলেন দেবতারা। রোহিতকে রাজ্য ভার দিয়ে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যাকে নিয়ে তাঁরা স্বর্গে ফিরে গেলেন। পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আমরা আজও ভুলতে পারি নি। কাশীর এই শ্মশান তাঁর নাম অমর করেছে। শহর থেকে এই ঘাটে আসবার জন্য যে রাস্তা তৈরি হয়েছে তারও নাম এখন হরিশ্চন্দ্র রোড।

হনুমান ঘাট ও হনুমানের মন্দির আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এই ঘাটের সঙ্গে যাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাঁকে আমি ছাড়িয়ে যেতে পারি নি। পরমবৈষ্ণব বল্লভাচার্য এই ঘাটে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি জন্মেছিলেন তৈলঙ্গ দেশে, বাস করতেন মথুরার কাছে গোকুলে, বৈঠক বা মঠ স্থাপন করেন মথুরা আর উজ্জয়িনীতে। লোকে বলে যে ইনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। তাঁর উপাসনার প্রণালীর নাম পুষ্টি মার্গ। এর নূতনত্ব এই যে ভগবানের উপাসনার জন্য উপবাস বা কোন শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। ভোগবিলাস ও ভগবানের সেবা একই সঙ্গে চলতে পারে।

দণ্ডীপন্থ সাধুদের ঘাট দণ্ডীঘাট ছাড়িয়ে শিবালয় ঘাট একটি সুন্দর ঘাট। তারই পিছনে চেৎসিংহের পুরনো দুর্গ আজও নতুন বলেই মনে হচ্ছে। কাশীর রাজারা আবার এটি কিনে নিয়ে নিজেদের অধিকারে রেখেছেন। চেৎসিংহকে শায়েস্তা করতে এসে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে এই দুর্গের মধ্যেই বন্দী করেছিলেন নিজের সৈন্য মোতায়েন করে। কিন্তু চেৎসিংহ পালিয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারের যে জানালা দিয়ে পালিয়েছিলেন, মাঝি আমাদের সেই জানালাটি দেখিয়ে দিল। অনেক উঁচুতে সেই জানালা। কোন অবলম্বন নেই নিচে নামবার। কী করে এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। তখন বর্ষাকাল ছিল, গঙ্গার জল ফুলে অনেক উঁচুতে উঠেছিল জানি। চেৎসিংহ তার মাথার পাগড়িকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে একখানা নৌকোর উপরে নেমে পড়েছিলেন।

বচ্ছরাজ ঘাট জৈনদের, তিনটি সুন্দর জৈন মন্দির আছে ঘাটের উপরে। তারপরে জানকী ঘাট অপেক্ষাকৃত নূতন। চারটি শিব মন্দির আছে, আর আছে বারাণসীর জলসরবরাহের পাম্প। তুলসী ঘাট তারপরে। রামচরিত মানসের অমর কবি তুলসীদাসের নামে

তুলসী ঘাট। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে তিনি এখানে বাস করতেন। ঘাটের পাশে যে ছোট ঘরটি দেখা যাচ্ছে এই ঘরে বসেই নাকি রামচরিত মানসের শেষাংশ লিখেছিলেন। এখনও এই ঘরে নাকি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আছে—একজোড়া পাদুকা, একটি বালিশ, আর এক খণ্ড কাঠ। সেই কাঠে ভর করে তিনি গঙ্গা পার হতেন। কাশীতে আরও একটি স্থান তাঁর স্মৃতি বহন করছে সাদরে, তার নাম সঙ্কট মোচন। এই স্থানটি আমরা পরে দেখেছিলুম।

কাশীর ঘাট এবারে শেষ হয়ে এল। রেওয়াব মহারাজার লালা মিশ্র ঘাট, নাগোয়া ঘাট, তারপরেই অসি ঘাটে কাশীর ঘাট শেষ। ছ সাত হাত চওড়া একটি নালার মতো নদীর নাম অসি। তারই সঙ্গমে পঞ্চতীর্থের প্রথম তীর্থ। পারের উপরে একটি জগন্নাথের মন্দির আছে।

অসি আর নাগোয়া ঘাটে অনেকগুলি নৌকো দাঁড়িয়ে আছে, এরা গঙ্গা পারাপার করে। গঙ্গার পরপারে রামনগর কাশীর যাত্রীদের একটি দর্শনীয় স্থান। কেউ নৌকোয় যায়, কেউ যায় মালব্য পুলের উপর দিয়ে মোটর বাসে। কিন্তু যায় অনেকেই। তুলসীদাসের পবিত্র রামায়ণ আছে প্রাসাদের ভিতর, প্রাসাদের বাহিরে ব্যাসকাশী, আর অনতিদূরে দুর্গাবাড়ি। রামনগরকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার জন্যে আমরা অসি ঘাটে নামতে পারতুম। কিন্তু মিসেস মুখার্জি রাজী হলেন না। তারাপদবাবুকে বললেন ঃ বেলার দিকে একটু নজর দাও।

সত্যিই বেলা অনেক হয়েছিল। পূর্বের সূর্য এখন দক্ষিণে হেলেছে। তীব্র হয়েছে রৌদ্র। দশাশ্বমেধ ঘাটে ফিরতেও আমাদের অনেকটা সময় লাগবে। মনোরঞ্জন তাই আর আপত্তি করল না, তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার হুকুম দিল মাঝিকে।

পাঁচু অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবারে বলল : কাশীতে সবশুদ্ধ কতগুলি ঘাট আছে কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন আমার দিকে তাকাল, আমি বললুম : অগুন্তি।

আমার উত্তর শুনে সাবিত্রী মুখ ফিরিয়ে হাসল। কিন্তু পাঁচু গম্ভীর ভাবে বলল : আমিও গুনতে পারি নি।

তারাপদ বাবু বললেন : কলকাতাতে তো গঙ্গা আছে, কিন্তু এমন ঘাট সেখানে নেই।

মনোরঞ্জন বলল : কলকাতায় তবু কিছু আছে, কিন্তু অন্য জায়গায় যে কিছুই নেই।

আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। সেও গঙ্গারই কথা। গঙ্গা তো নদী নয়, গঙ্গা দেবী, সরস্বতীর শাপে তিনি নদীতে পরিণত হয়ে মর্ত্যে প্রবাহিত হয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য। তার স্পর্শে সগর বংশের উদ্ধার হয়েছে, আজও উদ্ধার হচ্ছে অগণিত পাপী ও তাপী।

কিন্তু গঙ্গার নিজের কি কোন দিন মুক্তি হবে না! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আমরা দেখি যে সরস্বতীর শাপে গঙ্গা যখন ভারতে আসছেন নদীরূপে, গঙ্গার দুচোখে তখন জলের ধারা। তাই দেখে বিষ্ণু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

অদ্য প্রভৃতি দেবেশি কলেঃ পঞ্চ সহস্রকম্।

বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি।

সরস্বতীর শাপে ভারতবর্ষে তোমাকে কলির পাঁচ হাজার বছর থাকতে হবে। তারপরে তুমি আমার নিকট ফিরে আসবে।

অনেক পুরাণেই এই ধরনের কথা আছে। সাড়ে চার হাজার বছর কেটেছে কলির, পাঁচ হাজার বছর পূর্ণ হলেই গঙ্গা অন্তর্ধান হবেন।

পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।

এটি অন্তিম কলি কিনা জানি না। তা হলে আর পাঁচশো বছর পরে গঙ্গাকে আমরা দেখতে পাব না।



ধর্মশালায় পা দিয়েই মনোরঞ্জন বলে উঠল : আজ আর রান্না বান্না নয় বউদি, এ বেলায় আমরা হোটেলে খাব।

মিসেস মুখার্জি একথা শুনে হাসলেন।

মনোরঞ্জন বলল : হাসছেন যে।

আমি দেখলুম যে সাবিত্রীও মুখ লুকিয়ে হাসল।

মিসেস মুখার্জি বললেন : সে কপাল কি করেছি ঠাকুরপো! তীর্থ করতে এসেও দু বেলা আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে।

কেন?

কেন আবার! হোটেলের খাবার দুদিন খেয়ে তিনমাস উনি আমাকে ভোগাবেন। মাছ মাংস নেই, একটু কষ্ট হবে আপনাদের।

বলে ঘরের দরজা তিনি খুললেন। আর আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। ঘরের কোণায় একদিকে একধার থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। মিসেস মুখার্জি হেসে বললেন : তাড়াতাড়ি স্নান করে আসুন ভাই, খাবার তৈরি হয়ে গেছে।

ধর্মশালার কলের জলে স্নান করবার প্রবৃত্তি আমার হল না। আমি গামছা কাপড় নিয়ে গঙ্গার দিকে পা বাড়ালুম। মনোরঞ্জন বলল : কোথায় যাচ্ছ?

তারাপদ বাবুও মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখলেন। আর পাঁচু বলল : আমিও গঙ্গায় নাইব।

শেষ পর্যন্ত সবাই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সাবিত্রী রইল তার মায়ের সঙ্গে।

গঙ্গার ঘাটে স্নান করার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে। সাবধানে একটা একটা ধাপ নিচে নামতে হয়, বেশি নামবার সাহস হয় না। যারা অভ্যস্ত নয়, তারা এক কোমর জলে দাঁড়িয়েই স্নান করে। বেশি জলে গঙ্গার টান আছে, ধাপে শ্যাওলাও আছে, পা ফস্কে যাবার ভয়ে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে সবাই এমনি খোলা জায়গায় স্নান করতে অভ্যস্ত নয়। বিশেষত বাঙলা দেশের মেয়েরা লজ্জায় পিছিয়ে আসে। কিন্তু কাশীবাসীরা এমনই অভ্যস্ত যে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে নানা বয়সের মেয়েরা অবলীলাক্রমে স্নান করছে, কাপড় বদলাচ্ছে। সমুদ্রের ধারেও কতকটা এই বকম দেখেছি, কিন্তু সেখানে স্নানার্থীরা খুব সুস্থ মনে থাকে না। সমুদ্রের ঢেউএর মাতামাতিতে মনে নেশা ধরে, পাগলামি জাগে। পুরুষ ও নারীতে তখন আর প্রভেদ থাকে না। কিন্তু এখানে মেয়ে পুরুষে সুস্থ মাথায় নির্বিকার চিত্তে পাশাপাশি স্নান করছে। তারাপদ বাবু বললেন ঃ কাল আমরা সবাই এসেছিলুম।

পাঁচু বলল ঃ আজও আমি ফোঁটা-তিলক কাটব বাবা।

বলে একটা ছাতার নিচে দৌড়ে গেল।

আহারের পর বিশ্রামের জন্য আমরা পাশের ঘরে এলুম। খুবই সাদাসিধে খাদ্য, কিন্তু প্রচুর পরিতৃপ্তিতে খাওয়া গেল। ইকমিক কুকারের দুটো বাটিতে বাসমতী চালের ভাত, একটায় নানান সবজি মেলানো ডাল, আর একটায় আলুকপির তরকারি, তার সঙ্গে কড়াইশুঁটি। গরম ভাতের উপরে গাওয়া ঘি দিলেন মিসেস মুখার্জি, আর আমের মিষ্টি আচার। সবার শেষে একটু দইও দিলেন, ঘরে পাতা দই। স্টোভে কিছু ভেজে দিতে চেয়েছিলেন, আমরা রাজী হইনি। বললেন ঃ একটু মাছ হলে আপনাদের পেট ভরত।

আমি বললুম ঃ এ আপনার ভদ্রতার কথা।

মিসেস মুখার্জি বললেনঃ না না, ভদ্রতার কথা নয়। কর্তা কাজের হলে সবই করা যেত।

মনোরঞ্জন বলল ঃ আমবা থাকতে উনি আবার কেন কষ্ট করবেন!

পাশেব ঘবে এসে মনোরঞ্জন আমাকে বলল ঃ কেমন দেখছ

সংক্ষেপে আমি বললুম ঃ এই মাখামাখিটা আমাব ভাল লাগছে না। আনরা কি ওঁদের কাঁধে চেপে থাকব?

প্রয়োজন হলে আমরাই ওঁদের কাধে তুলব।

মানে?

মানে খুবই সোজা। তোমাব ভাব বইবার ভাব তুমি আমাকে দিয়েছিলে, দবকাব হলে আমি ওঁদেবও ভার বইব। এব জন্যে তোমাব সঙ্কোচেব কোন কাবণ নেই।

এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে জানলে আমি তোমাকে কোন ভার দিতুম না।

আসুন, কাশীর পান খান একটা।

বলে তারাপদবাবু এসে ঘবে ঢুকলেন।

লজ্জিতভাবে আমি বললুম ঃ সেকি, আপনি আবার পান কিনতে বেরিয়েছিলেন নাকি!

পিছন থেকে পাঁচু বলল ঃ মা বাবাকে পান আনতে বলেছিল।

এবাবে তারাপদ বাবু লজ্জা পেলেন, বললেন ঃ এই তো, ধর্মশালার গায়েই পানের দোকান। নিন নিন।

বলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তাবপরে বসে বললেন ঃ কাশীর পাণ্ডা আপনি দেখেন নি। কাল গালে চড় মেবে আমার পকেট ফাঁক করে দিয়েছিল। না পূজো করলুম ভাল কবে, না অন্য কিছু, শুধু শুধুই গচ্চা গেল।

মনোবঞ্জন বলল ঃ এ না হলে কাশীর পাণ্ডা!

আমি বললুম ঃ সারনাথে আপনি অন্যরকম দেখবেন। পাণ্ডার অভাবটাই আপনার কাছে বড় মনে হবে।

তারাপদ বাবু বললেন : সারনাথ আপনি দেখে নিয়েছেন নাকি ?

আমি বললুম : না। বুদ্ধগয়া দেখে বৌদ্ধতীর্থ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে। নির্জন গম্ভীর পরিবেশে মনে একটা ধর্মভাব আপনাতেই জাগে।

মনোরঞ্জন তার মুখের পানে একটা চাপ দিয়ে বলল : আর এখানে পাণ্ডার অত্যাচারে ধর্মের ওপরেই ঘেন্না ধরে।

আমি বললুম : ধর্ম ছাড়াও কাশীতে আরও দুটো জীবন আছে, তাদেরও উপেক্ষা করা চলে না।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : কাশীর সাংস্কৃতিক জীবনও অনেক প্রাচীন।

বুদ্ধদেব যখন তাঁর নূতন ধর্ম জনসাধারণের কাছে প্রচারের কথা ভাবলেন, তখন ভারতের অন্য কোন স্থানে তিনি গেলেন না, এলেন কাশীতে। কাশীর নিকটে সারনাথকে তাঁর ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র বলে নির্বাচন করলেন। এই নির্বাচনের মূলে ছিল কাশীর সাংস্কৃতিক প্রভাব। কাশীর পণ্ডিত ও দার্শনিকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার মতবাদ নিয়ে তর্ক হয়েছিল। সহস্রাধিক বছর পরে তারা মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করতে শঙ্করাচার্যও কাশীতে এসেছিলেন। রামানুজ চৈতন্য নানক দাদু—এঁরাও কাশীর কৌলীন্য স্বীকার করেছেন। কাশীবাস করেছেন বল্লভাচার্য ও তুলসীদাস, কবীর তো এই কাশীরই মানুষ। কত সাধু মহাপুরুষ যে কাশীবাস করেছেন তার শেষ নেই। তৈলঙ্গ স্বামী ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সাধকের নাম আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : সাংস্কৃতিক জীবন বলতে তুমি কী বোঝ ?

বললুম : শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, ধর্ম ও দর্শনের আলোচনাও নয়, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতও সংস্কৃতির বাহন।

কবীর ও তুলসীদাসের সাহিত্যের কথা আমি বললুম না, কাশীর সংস্কৃত শিক্ষা ও নাগরি প্রচারের ব্যবস্থার কথাও বললুম না, বললুম যা বললে এঁরা বিচলিত হবেন সেই কথা। তারাপদ বাবু আমার

মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখেই মনোরঞ্জনকে বললুম : ভারতীয় সঙ্গীতে কাশীর দান অসামান্য। শানাই আর তবলায় তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, হাল্কা ঠুংরীর কথাই ভেবে দেখ। কিছু দিন আগেও বাঙলা দেশের উৎসব অনুষ্ঠান কাশীর ঠুংরী আব বাঈজীব মুজরো না হলে একেবারেই জমত না।

মনোরঞ্জন আমাব দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বুঝতে পারলুম যে তারাপদ বাবুর সামনে এই আলোচনা সে পছন্দ করছে না। আমার কৌতুক বোধ হচ্ছিল, এবং আরও কিছু বলবার চেষ্টা করতেই সে বলে উঠল : এখন একটু গড়িয়ে নিন মুখুজ্জে মশাই, বিকেলে আমবা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে বেবব।

তারাপদ বাবুব একটু ঘুমের আমেজ এসেছিল। বললেন : সেই ভাল।

তিনি চলে যাবাব পবে মনোরঞ্জন বলল : এ সব কী কথা!

তারপরে পাঁচুর দিকে চোখ পড়তেই তাকে বলল : যা যা, তুইও একটু গড়িয়ে নে।

পাঁচু পালিয়ে গেল। আমিও শুয়ে পড়লুম।

মনোরঞ্জন বলল : এব পবে বুঝি বাঈজীদের জীবনের কথা বলবে ভেবেছিলে?

তার ভয় দেখে আমি হেসে ফেললুম, বললুম : না। কাশীর তৃতীয় জীবন ব্যবসায়ীদের নিয়ে, যারা জরি আর ব্রোকেড তৈরি করে আর বেচে, বেচে পিতল ও জর্মন সিলভারের বাসন, কাঠের খেলনা আর পানের মসলা। কাশীর শিল্প তার নিজস্ব জিনিস। এ জিনিস ভারতের আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

মনোরঞ্জন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল : বুঝেছি।

তারপরে নিজেও গড়িয়ে পড়ল তার বিছানায়।

বিকালে আমরা কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে বার হলুম।

আমরা ছজন মানুষ। এমন কোন যানবাহন নেই যে আমরা ছজনে একটাতে উঠতে পারি। অথচ দূরত্ব এমন যে, পায়ে হেঁটে দেখা সম্ভব নয়। অবশ্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। সে বাস বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়েব সিংহদ্বার পর্যন্তই যায়, তারপবে অনেকখানি হাঁটতে হয় শুনেছি। মনোবঞ্জন প্রথমে টাঙ্গা ঠিক করতে গিয়েছিল, ছুখানা টাঙ্গা লাগবে শুনেই পিছিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত তিনখানা সাইকেল বিক্স ঠিক হল। এখানকার বীতি অনুযায়ী ছুখানা বিক্স নিলেই চলত। এক রিক্সতে তিনজন চাপা যায়, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে একটু কসবৎ কবে বসতে হয়, অভ্যাস না থাকলে পড়ে যাবাব ভয়। মেয়েবাও এমনি কসরৎ করে চাপছে দেখতে পেলুম। আমাদেব অনভ্যস্ত চোখে দেখতে মন্দ লাগে না।

গোধূলিয়া থেকেই একটি সোজা বাস্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেছে। বেশ জনবহুল বাস্তা। টাঙ্গাব সঙ্গে বিক্সও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, মাঝে মাঝে মোটব গাড়িও চলেছে। ছুপাবে দোকান পাটে ব্যস্ততাব অন্ত নেই।

অল্প একটু এগিয়েই মনোবঞ্জন বলল: একটা বুদ্ধি কবলে খবচ কিছু কম লাগত।

আমি কোন কৌতূহল প্রকাশ করলুম না দেখে নিজেই বলল: বাসে ইউনিভার্সিটিব গেট পযন্ত গিয়ে সেখান থেকে বিক্স নেওয়া চলত।

বললুম: গঙ্গার ধাবে গিয়ে বসলে কোন খরচই লাগত না।

আমার উত্তব শুনে মনোবঞ্জন বিবক্ত হল। বলল: এবাব থেকে তোমাকে রেখেই বেবব ভাবছি।

সোজা রাস্তা ধরে আমরা এগোচ্ছিলুম। সকলের আগে চলেছেন পাঁচুকে নিয়ে তারাপদ বাবু, তার পরের রিক্সয় সাবিত্রীবা মা মেয়ে বসেছে, আমরা সকলের পিছনে তারাপদ বাবু মাঝে মাঝেই মুখ ফিরিয়ে পিছনে দেখছেন।

এই রাস্তার ধারেই বাঙ্গালী টোলা, কুচবিহার রাজার কালীবাড়ি। দুর্গাবাড়ি সঙ্কটমোচন তুলসীমানস মন্দির ও ভাস্করানন্দের সমাধি অন্য রাস্তার ধারে। সে সব আমরা ফেরার পথে দেখব স্থির হয়েছে। তাই রিক্সওয়ালারা ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়ে মনের আনন্দে ছুটেছে।

একদা কাশী ছিল বিদ্যার পীঠস্থান। কাশী পণ্ডিতের নাম সর্বত্র সমাদৃত। বাঙলায় যেমন নবদ্বীপ, উত্তর ভারতে তেমনি কাশী ছিল মহিমান্বিত। নবদ্বীপ ডুবে গেছে, কিন্তু কাশীর গৌরব লুপ্ত হয় নি। স্বাধীন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এখনও কাশীতে বাস করছেন।

কাশীতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভাড়াটে বাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ইংরেজরা কুইন্স্ কলেজ স্থাপন করেছিল, গথিক কায়দায় নূতন বাড়ি তৈরি হয়েছে পরে। এখানকার সরস্বতী ভবন ও জাদুঘর বিদ্বানেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, সাধারণ দর্শককেও হতাশ হতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানে নানা দেবতার প্রমাণ মূর্তি সাজানো আছে। তার মধ্যে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিটিই সব চেয়ে আকর্ষণীয়। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আয়ুর্বেদ কলেজ যুক্ত হয়েছে, ভারতীয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হয়।

কাশী বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নাগরী প্রচারিণী সভা কে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আমার জানা নেই। হিন্দী সাহিত্য প্রসারের কাজে নিযুক্ত এই সভাও নাকি একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং এখানকার লাইব্রেরিতে হিন্দী গ্রন্থের সমাবেশ দেখে সবাই বিস্মিত হন।

এই প্রসঙ্গে আমার তিনটি নাম মনে এল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র প্রেমচাঁদ ও জয়শঙ্কর প্রসাদ। হিন্দী সাহিত্যের এই তিনজন দিক্‌পাল বারাণসীতে বাস করে এই শহরেরই গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

চলতে চলতেই আমরা এক সময় অতি প্রশস্ত রাজপথে এসে

পৌঁছলুম। বেশ বোঝা গেল যে কাশীর পুরনো পথ শেষ হয়ে নূতন পথে এসে পৌঁছনো গেল। রাস্তার দুধারে অন্য ধরনের দোকানপাট ছোট বড় বইএর দোকান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও বিক্রি হচ্ছে। আব একটু এগিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ফটক দেখা গেল। তার সামনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মর্মর মূর্তি।

কাশীর এই আব একটি মহান্ নাম। মুষ্টিভিক্ষাব দানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়েছেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল এলাহাবাদে। প্রথমে শিক্ষক হয়েছিলেন স্কুলে, কিছুদিন পত্রিকা সম্পাদনা কববার পব হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এলাহাবাদের মিউনিসিপাল বোর্ডেব সদস্য ও সহসভাপতি ছিলেন, যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভাব সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কাবাবরণ করেন। দুবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন—একবার লাহোরে ও আর একবার দিল্লীতে। তিনবার সভাপতি হয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার। বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি, স্বাধীনতা ঘোষণাব নয় মাস পূর্বে তাঁব মৃত্যু হয়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল অপরিসীম, আরাব আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও তিনি সম্মানের চোখে দেখেছিলেন। একদিন এই দুই আপাতবিরোধী শিক্ষার সমন্বয়ের জন্য এক দুরন্ত স্বপ্ন তাঁর হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর মানসপটে সেই দিনই জন্ম হয়েছিল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিনি স্থির করেছিলেন যে তাঁর এই নূতন পরিকল্পনার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনতম ভারতীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদও গড়ে দেবেন। তাঁব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করেও মনে প্রাণে ভারতীয় হিন্দু থাকবে। স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছিল। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে

মালব্যজী বেরিয়েছিলেন ভারত পরিক্রমায়। প্রথমেই তিনি কাশীর রাজার কাছে পেয়েছিলেন এগারো শো একর জমি—গঙ্গার এক পারে কাশী নরেশের রামনগর, অন্য পারে কাশীর উপকণ্ঠে এই জমির উপরেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হল। সমগ্র ভারতের রাজা ও আমীরেরা তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অকৃপণ দানে ভরে দিয়েছিলেন। পয়সার অভাব হয়নি মালব্যজীর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য ছিলেন বিশ বছর।

ফটকের নিচে দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় ঢুকে গেলুম। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা কলকাতার মতো দু-তিনটি অট্টালিকার সমাবেশ বুঝি। কিন্তু এবকানের একটি সুবিস্তৃত শহর বুঝি না। পথের বাম দিকে মেয়েদের কলেজ এলাকা, আর ডান দিকে শ্রীসুন্দরলাল হাসপাতাল। না মোগল না রাজপুত শৈলী, দুইএ মিলে এক অপরূপ অট্টালিকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল। এখানকার দাবি মেটাবার পর বাহিরের রোগীকেও স্থান দেওয়া হয় শুনলুম।

এক দিকে দীর্ঘ প্রশস্ত পথের ধারে বিরাট ছাত্রাবাসগুলি পাশাপাশি অবস্থিত, তাদের আলাদা আলাদা নাম। যাঁদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত, তাঁদেরই নাম দেওয়া হয়েছে। সে দিক দিয়ে আমরা গেলুম না, গেলুম অন্য দিক দিয়ে। এদিকে একটির পর একটি বিদ্যাভবন। আর্টস সায়েন্স কমার্স টেক্‌নলজি তো আছেই, আছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকাল এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ, সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ কলেজ, সঙ্গীত ও কলাভবন। পরিচ্ছন্ন রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে সৌধগুলি দেখা যায়। কতকটা একই ধরনে নির্মিত, একই রঙের বাড়িগুলি বড় বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে দূরে দূরে অবস্থিত। উন্মুক্ত আলো বাতাসে উজ্জ্বল।

অনেকক্ষণ আগেই কলেজগুলির ছুটি হয়ে গেছে। ছাত্রের জটলা কোথাও নেই। নির্জন পথ। কখনও দুটি মেয়ে আসছে কথা বলতে বলতে, কখনও একটি ছেলে সাইকেলে চেপে চলে যাচ্ছে। ছেলেদের

হস্টেলগুলি থেকে তাদের কলেজ এত দূরে যে বেশির ভাগ ছেলেই নাকি সাইকেলে যাতায়াত করে। কিছু ছেলেমেয়ে শহর থেকেও পড়তে আসে।

আমরা নামলুম না কোথাও। দূর থেকেই দেখলুম ভারতীয় কলা-ভবন। এর ভিতরে নাকি প্রাচীন শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বের অপরূপ নিদর্শন আছে। তেমনি গাইকোয়াড় লাইব্রেরি, মালব্য মন্দির ও গান্ধী আশ্রম। খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, জিম্‌নাসিয়াম। এ যেন ছোটখাট একটি শহর। বিশ্ববিদ্যালয় বললে এরকম বিরাট ব্যাপারের ধারণা আমাদের হয় না।

সকলের শেষে আমরা পৌঁছলুম বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে। এ হল নূতন বিশ্বনাথের মন্দির। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে এ মন্দির এখন কাশীযাত্রীর অবশ্য দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

পথের ধারেই সুন্দর তোরণ, দু-একটি দোকান আছে তার নিচে। পায়ের জুতো খুলে রাখবার ব্যবস্থাও আছে এইখানে। ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে সুন্দর পরিচ্ছন্ন পথ মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। শ্বেত পাথরের মতো সাদা মন্দিরের চূড়ো যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। এমন উঁচু মন্দির আমি আগে কোথাও দেখিনি। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গোপুরম আছে খুব উঁচু, কিন্তু মন্দির সেখানে উঁচু নয়। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে বিন্ধ্যাচল থেকে ফেরার পথে আমি এই মন্দিরেরই চূড়ো দেখতে পেয়েছিলুম গঙ্গার ওপর থেকে।

ধীরে ধীরে হেঁটে এসে আমরা এই মন্দিরে প্রবেশ করলুম। প্রবেশ পথের দুধারে দুটি দ্বারপালের মূর্তি দণ্ড হাতে। মনোরঞ্জনের হাত ধরে পাঁচু এগোচ্ছিল। ভিতরে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল: কী সুন্দর মন্দির কাকাবাবু, একটুও জলকাদা নেই।

সত্যিই তাই। মার্বল পাথরের মেঝে পরিষ্কার তক তক করছে। মন্দিরের মধ্যেই মস্ত বড় সভা বসতে পারে, এমন প্রশস্ত নাটমন্দির। কোন গায়ক হারমোনিয়ামের সঙ্গে ধ্রুপদী সঙ্গীত গাইছেন, তার সঙ্গে

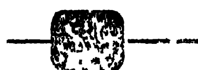
তবলা বাজছে। কোনদিকে না তাকিয়ে আমরা সোজা এগিয়ে গেলুম। ভক্তিভরে প্রণাম করলুম বিশ্বনাথকে। শুনলুম যে উপরের তলাতেও বিশ্বনাথ আছেন। দোতলা মন্দির। বিশ্বনাথ ছাড়াও আরও অনেক দেবদেবী আছেন। গণেশ পার্বতী ও দুর্গা, লক্ষ্মীনারায়ণও আছেন। তাঁদের আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ।

তারপরে আমরা মন্দিরের দেওয়ালের দিকে তাকালুম। কত সুন্দর চিত্র কত শাস্ত্রকথা। সাধু মহাত্মা ' মহাপুরুষদের কত বাণী চিত্রিত আছে তার অন্ত নেই। ঘুরে ঘুরে আমরা সব দেখতে লাগলুম। অল্প সময়ের জন্য এসে সব বাণী পড়া সম্ভব নয়। মনোরঞ্জন আমার পাশে পাশে চলতে চলতে সেই কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না। তৎপর ভাবে মহাপুরুষদের নামই শুধু দেখে যেতে লাগলুম। বাঙলার কোন মহাপুরুষের কথা আছে কিনা, তাই দেখবার বাসনা। অনেকক্ষণের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একটি কথা দেখতে পেলুম। এটি একটি সুপরিচিত কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়েও অনেক ভাল কথা তিনি বলেছেন, সুন্দর ভাষায় বলেছেন। বাঙলায় তো আরও অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন, কিন্তু তাঁদের কোন কথা নেই দেখে মন কিছু বিষণ্ণ হল।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তখন বেশ জমে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যায় এই সঙ্গীত পরিবেশিত হয় বলে শুনলুম। বড় গম্ভীর সুন্দর পরিবেশ, ধর্মের মতো গম্ভীর, আর স্বপ্নের মতো সুন্দর। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার যুগেও গর্ব করবার মতো শিল্পসমন্বিত এই বিশ্বনাথের মন্দির প্রাচীন ভারতের আত্মিক চেতনা বিকাশের সহায় হয়ে উঠেছে! এত অল্প সময়ে এই মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না।

তবু আমাদের বেরিয়ে আসতে হল।



অপরাহ্ণের ছায়া নেমেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বড় বড় গাছের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়েছিল কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। তারাপদবাবু ব্যস্ত হয়েছিলেন, বললেন: এখনও অনেক কিছু দেখতে বাকি আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।

বলতে বলতেই তিনি পাঁচুকে নিয়ে রিক্সায় উঠে পড়লেন।

মিসেস মুখার্জি মনোরঞ্জনকে বললেন: শুনলেন তো ঠাকুরপো, নাকে দড়ি দিয়ে সবাইকে ঘোরাবেন। মৎলবটা ওঁর বুঝেছেন তো!

মনোরঞ্জন কোন কথা কইল না। মিসেস মুখার্জি তাঁর প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, বললেন: বাড়িতে রেখে বেরতে পারলেই খুশী হতেন, নির্ভাবনায় বাড়া ভাতটি পাওয়া যেত কিনা।

মনোরঞ্জন প্রতিবাদ করে বলল: অসম্ভব। দু'বেলা আপনাকে কিছুতেই রাঁধতে দেব না। এ বেলা আমার ব্যবস্থা।

মিসেস মুখার্জি বললেন: আপনি আবার কী ব্যবস্থা করবেন!

মনোরঞ্জন বলল: দেখে আপনাকে তারিফ করতে হবে। আর মুখুজ্জে মশায়ের অসুখ করলে আমি দায়ী হব।

ততক্ষণে মিসেস মুখার্জি সাবিত্রীকে নিয়ে রিক্সায় উঠে পড়েছিলেন। আর আমি উঠলুম মনোরঞ্জনের সঙ্গে। রিক্সওয়ালারাও আর দেরি করেনি। চলতে চলতেই আমি প্রশ্ন করলুম: কী ব্যবস্থা করবে শুনি?

মনোরঞ্জন বলল: এ দেশে শুনেছি খাঁটি ঘিয়ে পুরি ভাজে, তার সঙ্গে তরকারি। তোমরা তো দ্বারকায় ভাল রাবড়ি খেয়েছিলে, এখানেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

আমি ভাবলুম, মন্দ হবে না। অন্তত ঐ ভদ্রমহিলা খানিকটা আরাম পাবেন।

এক সময় মনোরঞ্জন বলল : দুদিন পরে এসে তুমি খারাপ করলে। ইতিমধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখে ফেলেছি।

আমি বললুম : তার জন্যে আমি তো কোন আপশোষ করছি না।

মনোরঞ্জন বলল : আমি তোমার প্রয়োজনের জন্যেই বলছি। নিজের চোখে দেখলে লেখার সুবিধে হত।

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না। কিন্তু মনোরঞ্জন আমাকে কিছু শোনাবেই। বলল : ভারতমাতার মন্দিরটি আমরা দেখে নিয়েছি। এ তো কোন মন্দির নয়, কোন দেবতা নেই এই মন্দিরে। একটি সাধারণ বাড়ির মধ্যে পাথরের উপরে ভারতের একটি রিলিফ মানচিত্র। কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটিও একটি আধুনিক দ্রষ্টব্যস্থান। তবে কে নির্মাণ করেছেন তা জানতে পারলুম না।

আমি বললুম : রাজা ভগবান দাসের টাকায় তৈরি বলে শুনেছি। শিল্পীর নাম শিবপ্রসাদ গুপ্ত। ১৯৩৬ সালে মহাত্মা গান্ধী এই মন্দিরটি উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে তাকাল খানিকক্ষণ, তারপরে বলল : তাহলে তোমার আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই।

আমি হেসে বললুম : তোমরা কী কী মন্দির দেখেছ সেই কথা বল।

দেখেছি কিছু, কিন্তু সব কি আর দেখতে পেয়েছি! দিনের আলো থাকলে ফর্দটা পড়ে শোনাতে পারতুম।

ফর্দ!

মনোরঞ্জন বলল : ফর্দ ছাড়া আর কী বলব। এখানে পৌঁছেই একজন মুরুব্বি ধরেছিলুম। তিনি বললেন যে এক দশাশ্বমেধ ঘাটেই দুশো বিরানব্বুইটি মন্দির আছে, আর সমগ্র কাশীতে দেড় হাজারের

কম নয়। এই কথা শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। কোন রকমে সামলে নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকই দয়া করে আমাকে ফর্দটা তৈরি করে দিয়েছেন। বলেছেন যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই, গোটা কয়েক মন্দির দেখলেই চলবে। তাঁরই নির্দেশ মতো প্রথমে কালভৈরবের মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম।

কী দেখলে?

একটি নতুন ধরণের মন্দির দেখলুম। নানা অলঙ্কারে কণ্টকিত মন্দিরের চূড়ো। দরজার পাশে দ্বারপাল ও দশাবতারের চিত্র। ভিতরে কালভৈরবের ভয়ঙ্কর মূর্তি। পাথরের দেহ নীল, জ্বলজ্বল করছে রূপোর চোখ, পাশে একটি কুকুর।

আমি বললুম: পাঁচুদের চিনির কুকুর খাওয়াও নি?

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলুম: গায়ে তোমাদের ঝাঁটা বুলোয়নি কেউ?

কী বলছ এসব?

আমি বললুম: সাহেবদের বই পড়লে এ সব কথা জানতে পারতে। কাশীর কোতোয়াল ভৈরবনাথ কুকুরের পিঠে চড়ে বেড়ান। তাই চিনির কুকুর বিক্রি হয় মিষ্টির দোকানে। আর যাত্রীদের গায়ে ময়ূরের পাখার ঝাঁটা বুলিয়ে পাণ্ডারা পয়সা আদায় করে। কিন্তু এই মন্দিরটা কার তৈরি জানো?

মনোরঞ্জন বলল: শুনেছি খুব প্রাচীন মন্দির। মুসলমানদের হাত থেকে এই একটি মন্দির নাকি রক্ষা পেয়েছিল।

বললুম: সাহেবরা বলেন যে এই মন্দির পুণার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওএর তৈরি সোয়া শো বছরের কিছু বেশি আগে।

মনোরঞ্জন বলল: পৌরাণিক কাহিনীটা নিশ্চয়ই জান?

বললুম: জানিনে।

মনোরঞ্জন বলল: ব্রহ্মার উপরে রাগ করে শিব এই কালভৈরব সৃষ্টি করেছিলেন। আর কালভৈরব তখনই ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি

কেটে ফেললেন। কিন্তু সেই কপাল তাঁর হাত থেকে খসল না, সমগ্র পৃথিবী ঘুরেও তাঁর পাপ ক্ষালন হল না। শেষে এই কাশীতে এসে পৌঁছতেই কপালটি খসে পড়ল, কালভৈরব পাপমুক্ত হলেন। যেখানে কপাল পড়েছিল, সেই তীর্থের নাম হল কপাল মোচন।

মনোরঞ্জন থামল না, বলল: কালভৈরবের মন্দির থেকে বেরিয়ে নবগ্রহের মন্দির ছাড়িয়ে দণ্ডপাণির মন্দির। হরিকেশ নামে এক যক্ষ ছিল শিবভক্ত। শৈশবেই সে গৃহত্যাগ করে কাশীতে এসে শিবের তপস্যা শুরু করে। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কাশী শাসনের ভার দেন, নাম রাখেন দণ্ডপাণি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কাশীর কোতোয়াল কে? কালভৈরব, না দণ্ডপাণি?

মনোরঞ্জন বলল: আমাকে কোন প্রশ্ন ক'রো না। যা বলব, তার বেশি আমি বলতে পারব না।

আমি হেসে বললুম: তাহলে অন্য কিছু বল।

কালোদক বা কালকূপের নাম শুনেছ?

বললুম: না।

মনোরঞ্জন বলল: তোমার এ কথা জানা উচিত ছিল। তীর্থের খাতিরে নয়, একটা অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। দুপুর বারোটায় ছাদের দিক থেকে সূর্যের আলো এসে কূপের জলে পড়ে, তাতে জলের উপরে নিজের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সবাই এই ছায়া নাকি দেখতে পায় না। যারা তা পায় না, ছমাসের মধ্যে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

আমার মনে পড়ল যে একটা ইংরেজী বইএ আমি এই কথা পড়েছি। হিন্দুদের অলৌকিক ক্রিয়ায় পুরাকালে ইংরেজদেরও বিশ্বাস ছিল। তারাও অনেক কথা লিপিবদ্ধ করে গেছে।

মনোরঞ্জন বলল: তারপরে বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটিই নাকি কাশীর সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির। বৃদ্ধকাল নামে

দক্ষিণ দেশের এক রাজা সস্ত্রীক কাশীবাস করতে এসেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গই বৃদ্ধকালেশ্বর নামে পরিচিত। এক ব্রাহ্মণ বললেন যে শিবপুরাণেও বৃদ্ধকালেশ্বরের উল্লেখ আছে।

পর পর তিনখানা রিক্স যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আমি তা খেয়াল করিনি। মনোরঞ্জনও প্রথমটায় লক্ষ্য করেনি, তারপরে চেঁচিয়ে উঠল : এ কোথায় আনলে ?

এ হল কাশীর দুর্গাবাড়ি। সাহেবরা বলে মাঙ্কি টেম্প্‌ল্‌। হনুমানের মন্দির নয়, এ মন্দিরে তারা অসংখ্য বাঁদর দেখেই এর নাম রেখেছিল মাঙ্কি টেম্প্‌ল্‌।

রিক্সওয়ালাদের পরামর্শে আমরা রিক্সর উপরেই জুতো খুলে নেমে পড়লুম। তারপরে দরজা পেরিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। কোন বাঁদর আমাদের আক্রমণ করল না, চারিদিকে চেয়ে একটি বাঁদরও আমি দেখতে পেলুম না।

একটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে দুর্গার মন্দির। লাল রঙের এই মন্দিরটি অপরূপ শিল্পকলা মণ্ডিত। গত রাত্রে দেখা অন্নপূর্ণার মন্দির বলেই আমার মনে হয়েছিল। মূল প্রবেশ পথের পাশে এক জায়গায় জগঝম্প বাজে, ঘণ্টা বাজে মন্দিরের ভিতর।

তারাপদবাবুরা যখন দেবীদর্শনের জন্য মন্দিরের ভিতরে ঢুকলেন, আমি তখন বাহিরে ঘুরে ঘুরে স্থাপত্যকলা দেখতে লাগলুম। অপরূপ কারুকার্য করা বারোটি থামের উপরে নাটমন্দিরের ছাদ গম্বুজাকৃতি। থামের নিচের দিকটা চতুষ্কোণ, আর গোলাকার উপরের দিকটা। শুধু জ্যামিতিক নক্সা নয়, এক একটি সুন্দর মূর্তিও ক্ষোদিত আছে। তারপরে মন্দিরের গর্ভগৃহ।

নাটমন্দিরে আমি দুটি বৃহৎ ঘণ্টা দেখলুম। একটি নেপাল রাজের দান বলে জানি। অন্যটির সম্বন্ধেও একটি অলৌকিক গল্প আমি কোথাও পড়েছিলুম। ঘণ্টাটি নোংরা ছিল বলে বেনারসের একজন ব্রাহ্মণ কালেক্টর সেটি পরিষ্কার করান। তারপরে উর্দুতে লেখা

একটি লিপি বেরিয়ে পড়ে। তার থেকেই জানা যায় যে বেনারসের একজন ইংরেজ কালেক্টার গ্রাণ্ট সাহেব এই ঘণ্টাটি মন্দিরে উপহার দিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধায়। গঙ্গার বুকে গ্রাণ্ট সাহেব সস্ত্রীক হাওয়া খাচ্ছিলেন নৌকোয় চেপে, নৌকো হঠাৎ জলের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেল। দু-চারবার পাক খেয়ে যে নৌকো অতলে তলিয়ে যেত তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তা হল না। দুর্গার কাছে মানৎ করে মাঝিরা নৌকো রক্ষা করল। এ কথা জানতে পেরে সাহেব এই ঘণ্টাটি মন্দিরে উপহার দিলেন।

তারাপদবাবুরা নেমে এলে আমি উপরে উঠে গেলুন। মন্দিরের দরজায় এখন ভিড় নেই। সহজেই দেবীর দর্শন পেলুম। দণ্ডায়মান মূর্তি, মৌন প্রসন্ন। ধূপ ও ধুনায় ফুলের সৌরভ ও চন্দনের গন্ধে এমন একটি গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে খানিকক্ষণ এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মনোরঞ্জন আমাকে বসতে দিল না। বলল: কতক্ষণ দেখবে?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি নেমে এলুম।

মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে বিরাট পুষ্করিণী, তার নাম দুর্গাকুণ্ড। দুর্গার এই মন্দির ও দুর্গাকুণ্ড বাঙলার রাণী ভবানীর কীর্তি। ভারতের ধর্মজীবনে রাণী অহল্যা বাঈএর পরেই রাণী ভবানীর নাম। ইন্দোরের বিধবা রাণী অহল্যাবাঈ আর বাঙলার বিধবা রাণী ভবানী। অহল্যাবাঈ সত্যিই রাণী ছিলেন, কিন্তু ভবানী ছিলেন জমিদার-পত্নী। রাজসাহী জেলার মড়পাতি দাতিন গ্রামের এক সাধারণ মানুষ আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা, বিবাহ হয়েছিল নাটোরের জমিদার রামকান্তের সঙ্গে। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক আয় তখন দেড় কোটি টাকা। ধর্মের জন্য পুষ্করিণী খনন ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছিলেন। উনআশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হবার পরে।

কাশীতে রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে গোপালবাড়ি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কন্যা তারাসুন্দরীও কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোপাল কালী বিশালাক্ষী জয়ভবানী তারা রাধাকৃষ্ণ ও ললিতাদেবীর নিত্য সেবার জন্যে দেবত্র সম্পত্তি আছে। অন্নসত্র আছে গোপালবাড়িতে, আর বলির বিধান আছে শুধু দুর্গাবাড়িতে। কাশীর আব কোন মন্দিরে বলি হয় বলে শুনিনি।

দুর্গাকুণ্ডের অপব পারে ভাস্করানন্দের সমাধি। আমরা হেঁটেই যেতে পারতুম। কিন্তু রিক্সওয়ালাদের সঙ্গে এই সব দেখাবার রফা হয়েছিল বলে রিক্সয় চেপেই আমবা সেখানে গেলুম।

সুন্দর একটি উদ্যানের মধ্যে ভাস্করানন্দের সমাধি মন্দির। পথের ধারে রিক্স বেখে আমরা উদ্যানে প্রবেশ করলুম। একেবারে আধুনিক ধরনের একটি ফুলের বাগান, তারই মধ্যে একটি সাদা পাথরের মন্দির। দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু জালির ফাঁক দিয়ে আমরা সমাধিস্থান দেখতে পেলুম। উঁচু বেদীব উপর যেন একটি গোলাকার শিবলিঙ্গ। তার উপরে ফুলের মালা জড়ানো। তপস্বী ভাস্করানন্দকে আমি প্রণাম করলুম, তাবপর নেমে এলুম সমাধি-মন্দির থেকে।

আমার মনে হল যে উত্তরকালে এই তপস্বীকে কাশীর লোক হয়তো ভুলে যাবে। কিন্তু এই সমাধি এইখানে এমনিভাবেই থাকবে। যাত্রীরা আসবে গঙ্গাজল আর বিল্বপত্র নিয়ে। কাশীর অগণিত শিবের মাথায় যেমন একটুখানি গঙ্গাজল আর একটি বেল-পাতা দিয়ে যায়, তেমনি করে ভাস্করানন্দের সমাধির উপরেও তা দিয়ে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ ভাস্করানন্দ শিবে পরিণত হয়ে যাবেন।

এই উদ্যান ছিল অযোধ্যার আমেঠি রাজের নিজস্ব উদ্যান। আর যোগী ভাস্করানন্দ তখন ভক্তদের অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াতেন।

গঙ্গার এপারে অভিষ্ঠ হয়ে উঠলে ওপারে রামনগরে চলে যেতেন সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে। দিনের বেলায় ব্যাসকাশীতে যোগ-সাধনা করে রাত্রির অন্ধকারে আবার ফিরে আসতেন। আমেঠি রাজ ভাস্করানন্দকে এই উদ্যানে বাস করবার অনুরোধ জানালেন। মাটির নিচে একটি গুহা দেখতে পেয়ে তিনি এই স্থান পছন্দ করলেন, কিন্তু বললেন যে একটি শর্ত আছে।

কী শর্ত?

কাশীর জনতা যেন তাঁর সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

রাজী হলেন আমেঠি রাজ। উদ্যানের প্রবেশ পথে প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। সারাক্ষণ তারা সতর্ক পাহারা দিতে লাগল। আর যোগী ভাস্করানন্দ এসে গুহায় আশ্রয় নিলেন। নির্বিঘ্নে তাঁর তপস্যা চলতে লাগল।

কানপুরের নিকট মিখেলপুর গ্রামে বিদ্বান ব্রাহ্মণ মিশ্রলালের ঘরে এক পুত্রের জন্ম হল ১৮৩৩ সালে। অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এসে নবজাতককে আশীর্বাদ করে গেলেন যে আগামী কালে এই শিশু হবেন একজন মহাপুরুষ। শিশুর নাম হল মতিরাম। মেধাবী উদার উদাসীন এই পুত্রকে সংসারী করবার চেষ্টা করেছিলেন পিতা মিশ্রলাল। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এক কন্যার সঙ্গে বাল্যকালেই তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু মতিরাম সংসার ত্যাগ করলেন একটি পুত্রের জন্মের পরেই। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর।

বারাণসীতে মতিরাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। গৃহত্যাগের পরে তিনি উজ্জয়িনীতে গেলেন তপস্যার জন্য। দ্বারকায় গিয়ে শঙ্করাচার্যের সারদা মঠে বেদান্তের পাঠ নিয়ে এলেন। সাতাশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তাঁর নূতন নাম হল ভাস্করানন্দ সরস্বতী। দীর্ঘদিন ধরে নানা তীর্থ পরিক্রমা করে তিনি হরিদ্বার থেকে বারাণসীতে এলেন তপস্যার

জন্যে। বারাণসীতেই তিনি তাঁর বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালে দেহত্যাগের পূর্বে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর জন্মভূমি দেখতে গিয়েছিলেন।

ভাস্করানন্দের সঙ্গে সচল বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামীর বন্ধুতা ছিল, বন্ধুতা ছিল বিখ্যাত বৈদান্তিক বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। আর এসেছেন আমেরিকার স্বনামধন্য লেখক মার্ক টোয়েন। তাঁর মোর ট্রাম্প্‌স্ অ্যাব্রড্ গ্রন্থে বারাণসীর বর্ণনার সঙ্গে ভাস্করানন্দের কথাও আছে।

কাশীর লোক তাঁকে একদিনে মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করেনি। নানাভাবে পরীক্ষা করেছিল তাকে। আমেঠির রাজা নিজেই তাঁকে পরীক্ষার জন্যে কয়েকজন রূপসীকে পাঠিয়েছিলেন অন্ধকার রাতে, আর নিজে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর সব চক্রান্ত ভেস্তে গেল। কোথা থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এসে রূপসীদের একজনের পায়ে জড়িয়ে গেল, আর সবাই গেল পালিয়ে। রাজাও পালিয়ে গেলেন। সবাই ভেবেছিল যে সাপের কামড়ে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তা হয়নি। সকাল বেলায় সেই সাপ মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সুড় সুড় করে চলে গেল। সারারাত্রি যে মেয়ে ভয়ে অচেতন হয়ে ছিল এবারে তার পরিবর্তন এল জীবনে। ধর্মকে আশ্রয় করে সে নূতন জীবন লাভ করল।

নানা জনে তাঁকে নানা জিনিস দিত। সবই তিনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। রাজা মহারাজারা তাঁর পায়ে রূপোর টাকা আর সোনার মোহর ঢেলে দিতেন, আর তিনি সে সব ফিরিয়ে দিতেন। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ ছিল না তাঁর কাছে, সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন।

তাঁর কাছে এসে অনেকে অনেক অলৌকিক জিনিসও প্রত্যক্ষ করেছেন। বাঙলার মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করতে এসেছিলেন। জগৎ নিত্য কি অনিত্য, এই তাঁদের

আলোচনার বিষয় ছিল। সহসা তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যে স্বামীজী তাঁর সামনে নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত আর তর্ক করলেন না, তিনি মেনে নিলেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হল অনিত্য ও ভ্রমাত্মক।

আর একদিন ভারতের প্রধান সেনাপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আফ্রিদিদের তিনি যুদ্ধে কী ভাবে পরাজিত করেছেন সেই গল্প শোনালেন স্বামীজীকে। স্বামীজী একটি পেনসিল তাঁর সামনে রেখে সেটি তুলতে বললেন। কিন্তু সেই বলবান পুরুষ তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও পেনসিলটি তুলতে পারলেন না। স্বামীজী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন, বুঝিয়ে দিলেন যে এই জগৎ চলে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যুদ্ধ জয়ের গৌরব কোন মানুষের প্রাপ্য নয়।

ভাস্করানন্দের অলৌকিক শক্তি দেখেছিলেন অযোধ্যার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ। রাজার হাতের হীরের আংটিটি দেখবার জন্যে চেয়ে নিয়ে স্বামীজী তা দুর্গাকুণ্ডের জলে ছুঁড়ে ফেললেন। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তিতে রাজার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। স্বামীজীও তা বুঝতে পেরে বললেন, জলে হাত ডুবিয়ে তোমার আংটি তুলে নাও। জলের তলা থেকে রাজা একই রকমের অনেকগুলি আংটি পেলেন, কিন্তু নিজেরটি আর চিনে নিতে পারলেন না। স্বামীজী চিনিয়ে দিলে নিজেরটি রেখে বাকি আংটি-গুলি আবার দুর্গাকুণ্ডের জলে ফেলে দিলেন।

আর একদিন রাজার মন্ত্রীর কাছ থেকে এল জরুরি টেলিগ্রাম। প্রথম ট্রেনেই রাজাকে যেতে হবে। কিন্তু স্বামীজী বললেন, না, পরের ট্রেনে যাও। রাজা সেই কথা মেনে নিলেন। তারপরে শুনলেন যে দুর্ঘটনায় আগের ট্রেনের বহু যাত্রী হতাহত হয়েছে।

কাশীর সাধুরাও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। ভাস্করানন্দের কাছে তাঁরা এসেছিলেন ধর্মের কথা আলোচনার জন্যে। কথায় কথায় বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল। ভাস্করানন্দ বললেন,

আপনারা ছুটি খেয়ে যান। কিন্তু কী খাবেন তাঁরা? সাধুরা এক একজন এক এক জিনিস খেতে চাইলেন—নানা রকমের মিষ্টি ফল মূল। তারপর তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে সবার পাতেই পড়েছে তাঁদের পছন্দের জিনিস।

ভাস্করানন্দকে চোখে দেখেছেন, এমন মানুষ আজও আছেন বারাণসীতে।

১৭

রিক্সায় উঠবার আগে তারাপদবাবু বললেন: কাশীতে শুনেছি বারো মাসে তের পার্বণ, কিন্তু এখনতো কোথাও কোন উৎসব দেখছি না!

মনোরঞ্জন বলল: সে খবর নিয়েছি। আষাঢ়ে রথযাত্রা হয়েছে, শ্রাবণে সারনাথের মেলা, লক্ষ্মীজীর মেলা হয়েছে ভাদ্র মাসে। বর্ষায় কাশীর লোক কাজলি গেয়ে রাত জেগেছে। এখন কয়েকটা দিন বিশ্রাম। আশ্বিনের শেষে হবে ভরত মিলাপের দিন, পুজোয় নবরাত্রি, তারপর রামলীলা সারা শীতকাল ধরে চলবে। মাঘ মাসে বেদব্যাসের মেলা, তারপরে হোলি শিবরাত্রি রামনবমী।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করল: এখন আমরা কোথায় যাব কাকাবাবু?

মনোরঞ্জন বলল: সঙ্কট মোচন।

তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো বড় ঠাকুর আছে?

আমি বললুম: তিলভাণ্ডেশ্বর শিব দেখেছ বুঝি!

পাঁচু খিলখিল করে হেসে বলল: এই এত মোটা।

বলে দু হাত দু পাশে বাড়িয়ে দেখাল।

আমি বললুম: ভাল করে মেপে দেখেছ তো। বড় হয়ে যখন আবার আসবে তখন দেখবে যে আরও মোটা হয়েছে।

সত্যি নাকি কাকাবাবু!

মনোরঞ্জন বলল: এখন শুনছি তিন হাত লম্বা ও দশহাত মোটা। দিনে এক তিল করে বেড়ে এই রকম হয়েছে।

আমাদের চেয়েও রিক্সওয়ালাদের তাড়া যেন বেশি। রিক্সায় উঠতে না উঠতেই ছুটতে আরম্ভ করল। তিলভাণ্ডেশ্বরের গল্পটা আর

পাঁচুকে বলা হল না। ভালই হয়েছে, এ গল্প তার বয়সের উপযোগী হত না।

তিলভাণ্ড ছিলেন একজন দণ্ডী। মদমত্ত নামে এক শুঁড়ির বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল, ক্রমে তার স্ত্রীর সঙ্গে হল তিলভাণ্ডের ঘনিষ্ঠতা। মদমত্ত প্রথমে একথা জানত না, পরে বোধহয় সন্দেহ করেছিল। তাই একদিন হঠাৎ এমন সময়ে বাড়ি ফিরে এল যখন তিলভাণ্ড তার বাড়িতে। বিপদ দেখে মদমত্তের স্ত্রী তিলভাণ্ডকে একটা বড় জালার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। মদমত্ত নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল, তাই সেই জালার ভিতরে মদ ঢেলে আগুনে জ্বাল দিতে লাগিল। প্রমাদ গণল তিলভাণ্ড। লুকিয়ে থাকা অসম্ভব, আবার বেরবারও উপায় নেই। উপায়ান্তর না দেখে বিশ্বনাথকে স্মরণ করল, আশুতোষ শিব ভ্রমরের রূপে জালায় ঢুকে তিলভাণ্ডকে শিবলিঙ্গ হবার বর দিয়ে গেলেন। তিলে তিলে বৃদ্ধি পাবে এই শিবলিঙ্গ। অসচ্চরিত্র দণ্ডী তিলভাণ্ড শিবের বরে হলেন তিলভাণ্ডেশ্বর শিব।

এ রকমের শিব কাশীতে কত আছে তার হিসেব কারও কাছে নেই।

মনোরঞ্জন বলল: কাশীতে দেখবার আর কী বাকী রইল জানিনে।

আমি বললুম: সারা জীবন কাশীবাস করেও যে কাশী দেখা মানুষের শেষ হয় না।

মনোরঞ্জন বিরক্তভাবে বলল: তোমার আধ্যাত্মিক কথা রাখ।

বললুম: এ কোন আধ্যাত্মিক কথা নয়, এ হল তীর্থযাত্রীর মনের কথা। এই তো আমরা ভাস্করানন্দের সমাধি দেখলুম। শুনেছি যে এই অঞ্চলেই কোন মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁর মর্মর প্রতিমূর্তি আছে। শীর্ণ দেহের সৌম্য মানুষটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। কই, সে মূর্তি তো আমরা দেখলুম না, দেখবার চেষ্টাও করলুম না কোন। তারপর—

মনোরঞ্জন কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: দুর্গাবাড়ির কথাই ভাব। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে দুর্গাবাড়িতে দুর্গা দেখবার পরে মেনকার মন্দিরে যেতে হয়। মেনকা হলেন দুর্গার মা, হিমালয়ের স্ত্রী। তাঁরও মন্দির খুব কাছে। মেনকা দেবীকে প্রণাম করে বলতে হয়, তোমার মেয়েকে দেখে এলাম, ভাল আছে তোমার মেয়ে।

মনোরঞ্জন আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলল: সত্যি নাকি!

বললুম: দুর্গাবাড়ির নিকটে কালীমন্দির আমরা দেখিনি, রাণী ভবানী নাকি এই মন্দিরের একশো একটি চূড়া নির্মাণ করে দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র তালাও ভূকৈলাস লোলার্ক তীর্থ এসবও তো দেখা হল না।

মনোরঞ্জন তার পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করল, কিন্তু অন্ধকারে কোন লেখা পড়তে পারল না। বলল: সবকিছু দেখা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

একটা বাতির নিচে দিয়ে যাবার সময় মনোরঞ্জন এক নজরে কিছু পড়ে নিল, তারপরে বলল: পিশাচমোচন তীর্থ শুনেছি শহরের পশ্চিম দিকে। বড় একটি পুষ্করিণীব ধারে ধাবে অনেকগুলি মন্দির।

পিশাচমোচন খুবই প্রাচীন তীর্থ। কূর্মপুরাণে এই তীর্থের উল্লেখ আছে, আর কাশীখণ্ডে আছে পৌরাণিক কাহিনী। এক পিশাচ গায়ের জোরে কাশীবাস করতে এসেছিল, দেবতারা তাকে বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেষে কালভৈরব এসে যুদ্ধ করেছিলেন পিশাচের সঙ্গে আর তার মাথাটা কেটে বিশ্বনাথের কাছে এনেছিলেন। পিশাচের ছিন্ন মুণ্ড তখন জীবিত ছিল, বিশ্বনাথকে সে অনুরোধ করল যে তাকে যেন কাশী থেকে নির্বাসিত করা না হয়। বিশ্বনাথ বললেন, তথাস্তু। তারপরে পিশাচ আর একটি অনুরোধ করল। গয়াযাত্রীরা যেন তাকে দর্শন করে গয়াযাত্রা করে, তা না করলে যেন গয়ার তীর্থ বিফল হয়। বিশ্বনাথ তার এই অনুরোধ মেনে নিলেন। যে কুণ্ডে

কালভৈরব পিশাচের মুণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন, তারই নাম এখন পিশাচমোচন। পিশাচমোচনের লোটা-ভন্টা মেলা এখনও কাশীর একটি বিশেষ আকর্ষণ।

পিশাচমোচন তীর্থের ঘাটগুলি নানাজনে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তিনশো বছর আগে রাজা শিবশঙ্কর দক্ষিণ দিক বেঁধে দিয়েছিলেন, তারপর উত্তর দিকটা বেঁধে দিয়েছেন রাজা মুরলীধর প্রায় একশো বছর আগে। রাজস্থানের রাণী মীরাবাঈ ও গোপালদাস নামে একজন সাধুও খানিকটা বেঁধে দিয়েছেন। মীরাবাঈ প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরও আছে।

কাশীর আর একটি কুণ্ডের নাম সূর্যকুণ্ড। অনেকে সাম্বাদিত্য বলে। কৃষ্ণপুত্র সাম্ব যে সূর্যের উপাসনা করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন, তিনিই সাম্বাদিত্য। পিতার শাপেই পুত্রের কুষ্ঠরোগ হয়। নারদ এসে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তাঁর রাণীরা সাম্বের প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণ এই অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে পুত্রকে শাপ দিয়েছিলেন। উড়িষ্যার কোনারকে শুনেছি যে সাম্ব রোগমুক্তির জন্যে সূর্যের তপস্যা করেছিলেন সেইখানে। কাশীতে প্রবাদ অন্যরকম, সাম্ব এই সূর্যকুণ্ডেই তপস্যা করেছিলেন। বিশেষ তিথিতে এই কুণ্ডে স্নান করে সাম্বাদিত্যের পূজা করলে উৎকট রোগ নিরাময় হয়, স্ত্রীলোকেরাও নাকি বিধবা হয় না।

মনোরঞ্জন আর একবার তার কাগজ দেখে পাদোদক তীর্থ ও মৎস্যোদরী তীর্থের কথা বলল। বরুণা সঙ্গমে পাদোদক তীর্থ। মন্দার পর্বত থেকে ফিরে এসে আদি কেশব বিষ্ণু এইখানে তাঁর পা ধুয়েছিলেন।

মৎস্যোদরীর জল নাকি অন্তর্বাহী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে, আর গঙ্গার জল বাড়লে সেই জল আসে মৎস্যোদরীতে। কাশী তখন মৎস্যের মতো দেখাত বলে এই তীর্থের নাম মৎস্যোদরী হয়েছে। এটি প্রাচীন তীর্থ, শিব পুরাণে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন

শুধু নামটিই আছে। তীর্থকে ভরাট করে সুন্দর একটি পার্ক তৈরি হয়েছে।

তীর্থের আলোচনা আমাদের সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই আমাদের রিক্সগুলো একটা আধুনিক অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল। সুন্দর লোহার ফটক, বাধানো সড়ক চলে গেছে গৃহের সিঁড়ি পর্যন্ত, দু'ধারে বাগান। খানিকটা দূরেও একটি অতি আধুনিক ধরনের উদ্যান দেখতে পেলুম। তারাপদবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এ আবার কোথায় এলুম ?

একজন রিক্সওয়ালা বলল: তুলসীমানস মন্দির। এখান থেকে আমরা সঙ্কটমোচনে যাব।

মনোরঞ্জন বলল: এ যে একেবারে দুর্গাবাড়ির পাশেই দেখছি।

রিক্স থেকে নেমে বলল: আগে জানা থাকলে দুর্গাবাড়ি পৌঁছে রিক্স ছেড়ে দিতুম। তাতে তাড়াতাড়িও করতে হত না পয়সাও কম লাগত।

তুলসীমানস মন্দির একেবারে হালে নির্মিত হয়েছে। এক ধনী ব্যবসায়ী প্রায় বিশ লাখ টাকা খরচ করে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। একেবারে আধুনিক পদ্ধতির স্থাপত্য। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর সংস্কৃত কলেজে যেমন একটি মন্দিরের চূড়ো বিস্ময় উৎপাদন করে, এখানে তেমনি দ্বিতল অট্টালিকাটির মন্দির-সুলভ চূড়ার অভাবটাই আশ্চর্যের মনে হয়, সামনে থেকে এটিকে কোন আবাসগৃহ বলেও মনে হয় না। এও এক নতুন ধরনের মন্দির।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সমস্ত মন্দিরটি মার্বল পাথরে তৈরি। সত্যিই এটি তুলসীদাসের মানস মন্দির। কবি তুলসীদাসের প্রাণবন্ত মর্মর মূর্তি আছে, আর আছে রাম সীতার মূর্তি লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মূর্তি। আর যা আছে, তা বিশ্বের কোনখানে নেই। কবি তুলসীদাস রচিত

সমগ্র রামচরিতমানসখানি দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে। চিত্রে নয়, মূর্তিতে নয়, সাদা পাথরের উপরে কালো অক্ষরে একটি একটি করে সব শ্লোকগুলি লিখে রাখা হয়েছে। মোগল বাদশাহরা কোরাণের বাণী লিখতেন সমাধি সৌধে, বিশ্বনাথের নূতন মন্দিরে মহাপুরুষদের বাণী দেখে এলুম, আর এখানে দেখলুম তার চেয়ে অনেক বড় কীর্তি। গোটা রামায়ণখানি লিখবার জন্যেই যেন এই বিরাট মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। মন্দির তো নয়, পাথরের রামায়ণ।

মন্দিরের বাগানে কৈলাস দেখলুম, আর দেখলুম গঙ্গাবতরণের দৃশ্য। কোন বিশেষ দিনে এখানে বাতি দিয়ে সব কিছু সাজানো হয়, তখন কাশীর লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্যে এখানে ভেঙ্গে পড়ে।

তুলসীমানস মন্দির থেকে আমরা সঙ্কটমোচনে এলুম। কবির পদধূলিতে এই স্থানটি পবিত্র হয়ে আছে। তাই কবির মতোই শান্ত সমাহিত পরিবেশ। রিক্স যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে যে নামতে হবে, আমরা তা বুঝতে পারিনি। কয়েকটি ছোট দোকানের পাশ দিয়ে একটি অন্ধকার গলি ছায়াচ্ছন্ন একটি আশ্রমের দিকে চলে গেছে। আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলুম।

সঙ্কটমোচনে হনুমানের মন্দির। কবি তুলসীদাস নাকি নিজে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রাঙ্গণের অন্য ধারে আর একটি মন্দির আছে রামচন্দ্রের। শনি মঙ্গলবারে এখানে সব চেয়ে বেশি যাত্রীর সমাগম হয়। পাঠ কথকতা ও উৎসব হয় নানা রকম। মেলা বসে চৈত্র মাসে।

এখান থেকে গঙ্গার অসি ঘাট বেশি দূরেও নয়। কবি সেখানে স্নান করতেন, সাধন-ভজনও করতেন, থাকতেন একটি ছোট ঘরের মধ্যে। সেই ঘরে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। কবি তাঁর অমর গ্রন্থ রামচরিতমানস রচনা করেছেন সেইখানে বসে।

কাশীর আর একটি স্থানের সঙ্গেও কবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

সে জায়গার নাম গোপাল মন্দির। কোতোয়ালির পিছনে একটি সরু গলির মধ্যে এই মন্দির, কালকূপ ও দণ্ডপাণির মন্দিরের নিকটে। এরই বাগানে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বসে নাকি কবি তাঁর বিনয় পত্রিকা রচনা করেছিলেন। তুলসীদাসের এই কাব্যের নাম আমরা সকলে জানি না। কিন্তু বিদেশী সমালোচক স্যর জর্জ গ্রিয়ার্সন একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন। বিনয় পত্রিকা নাকি রামচরিতমানসের চেয়েও উচ্চাঙ্গের রচনা, আরও গভীর তার আবেদন। লর্ড কার্জনের একটি ফলক আছে দেওয়ালের গায়ে।

তুলসীদাস ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি। একানব্বুই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে। সে প্রায় সোয়া তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো কথা।

কালিদাসের জীবনের সঙ্গে তুলসীদাসের একটা মিল আছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তো দুজনেই কবি হয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে ধাক্কা খেয়ে। তার চেয়েও দুঃখের তাঁর শৈশব। জন্মের পরেই তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। পিতার নাম আত্মারাম দুবে আর হুলসি তাঁর মাতা। নিজের নাম ছিল রাম বোলা। অভুক্ত মূলা নক্ষত্রে সন্তানের জন্ম হলে নাকি পিতামাতার মৃত্যু হয়। এই ভয়েই তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন আত্মারাম দুবে। এক সাধু তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেন। তুলসীদাস নাম রাখেন তাঁর গুরু নরহরিদাসজী। তিনি তাঁকে বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে রামানন্দী মঠে নিয়ে যান।

তুলসীদাস মেধাবী ছিলেন, অল্প বয়সেই শাস্ত্রাদি পাঠ করে পুরোহিতের কাজ করতে আরম্ভ করেন। গুরুর অনুরোধে তিনি তাঁর প্রতিবেশী দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করেছিলেন। তারপরে মোহান্ধ হয়েছিলেন স্ত্রীর রূপে। তারক নামে এক পুত্রেরও জন্ম হয়েছিল।

তুলসীদাস যে স্ত্রৈণ বলে স্ত্রীর নিকটেও বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন তা উপলব্ধি করলেন একটি মর্মান্তিক ঘটনার পরে।

একদিন তিনি পৌরোহিত্যে করতে গিয়েছিলেন দূরের এক যজমানের গৃহে। ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন দেখে তিনি ঘরমুখে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে বসে পড়লেন। রত্নাবলী ঘরে নেই, কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। একজন প্রতিবেশী সংবাদ দিল যে তিনি বাপের বাড়ি গেছেন। সেখান থেকে একজন লোক এসেছিল অসুখের খবর নিয়ে। তুলসীদাস তখনি ছুটলেন শ্বশুর বাড়ির দিকে। সেও অনেক দূরের পথ। আকাশ ভেঙে জল ঝড় নামল, অন্ধকারে দিগ্বিদিক যেন হারিয়ে গেল। অনেক রাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে যখন তিনি শ্বশুর বাড়ি পৌঁছলেন, তখন আশ্চর্য হলেন সকলে, আর তাঁর স্ত্রী গভীর ঘৃণায় তাঁকে ধিক্কার দিলেন, বললেন—

অস্থিচরমময় দেহ মম তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মেঁ হোতি ন তো ভবভীতি॥

আমার অস্থি চর্মে তোমাব প্রীতি ক্ষয় না করে শ্রীরামচন্দ্রে মনোনিবেশ করলে তোমার পুনর্জন্মের ভয় দূর হত।

এই বিদ্রূপই তুলসীদাসের জীবনে পরিবর্তন আনল। গৃহত্যাগ করে তিনি বিশ বৎসর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর অযোধ্যায় কিছুদিন কাটিয়ে এলেন কাশীতে, তুলসী ঘাটে আর সঙ্কট-মোচনে কাটালেন শেষ জীবন। রামচরিতমানস রচনার শুরু করেছিলেন অযোধ্যায়। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। অরণ্যকাণ্ড পর্যন্ত সেইখানেই লিখেছিলেন। তারপর বৈরাগী বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল বলে কাশীতে এসে তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন।

আকবর বাদশাহর রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল তাঁর বন্ধু ছিলেন, বাদশাহের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বাঙালী সাধক মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন তাঁর প্রিয় সখা। তুলসীদাস নাকি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি রামের দর্শন পেয়েছিলেন একাধিকবার। একবার রাম নবমীতে রাম ও সীতা এসেছিলেন বেদে বেদেনীর বেশে; মারুতিকে বাঁদর

সাজিয়ে বাঁদর নাচ দেখাতে এসেছিলেন, লক্ষ্মণ সঙ্গে ছিলেন সন্ন্যাসীর মতো কমণ্ডলু হাতে। তুলসীদাস তাঁদের চিনতে পারেন নি।

তারপরে চিত্রকূট পাহাড়ে গিয়ে আঠারো বছর তপস্যা করেছিলেন তুলসীদাস। সেখানে রাম তাঁকে জটাবল্কলধারী বালক বেশে দেখা দিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি মদনগোপালকে দেখেছিলেন রাম রূপে। স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন রামায়ণ রচনার।

কাশীতে যখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, দলে দলে লোক আসছে তাঁর রামায়ণ শোনবার জন্যে, তখন রামায়ণের পুরনো পাঠকেরা তাঁর রামচরিতমানস চুরির ষড়যন্ত্র করল। রাতে এক সিঁদেল চোর পাঠাল তুলসীদাসের কুটিরে। কিন্তু সে বেচারী এসে দেখে যে ধনুকধারী এক প্রহরী আছে পাহারায়, তার ভয়ে চোর কিছু চুরি করতে পারল না। বরং ফল হল উল্টো। সকাল বেলায় তুলসীদাসের কাছে এসে সে সব কথা অকপটে স্বীকার করল। তুলসীদাস সেই চোরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন. বললেন, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তুমি রামচন্দ্রের দর্শন পেয়েছ। চোব তার পেশার কথা ভুলে গেল চিরদিনের জন্য, আর তুলসীদাস তাঁর যাবতীয় জিনিস বিলিয়ে দিলেন গরিবদের মধ্যে। বললেন, রাত জেগে রাম আমার জিনিস পাহারা দেবেন, তা হয় না। আমি তাঁর নাম করব নিরন্তর।—

রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর।

ঘরের দুয়ারের চৌকাঠে বাতি রাখলে যেমন ঘরের ভিতর ও বাহির দুইই আলোকিত হয়, তেমনি একসঙ্গে নিজের দেহমন পবিত্র করতে হলে দেহের দেউড়ি জিহ্বায় ধর রাম নামের মণিদীপ।

১৮

সঙ্কটমোচন থেকে ফেরার সময় মনোরঞ্জন বলল : চকের ভিতর দিয়ে চল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : সেখানে আবার কী আছে।

উত্তর না দিয়ে মনোরঞ্জন শুধু হাসল।

আমি বললুম : অনেক দেশ ঘুরে একটু অহংকার জন্মেছিল। কিন্তু এখানে তোমার পারদর্শিতা দেখে বেশ আশ্চর্য হচ্ছি।

আরও আশ্চর্য হবে।

বলে পরম কৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি তার এই পরিহাসের অর্থ বুঝি। তাই কোন জবাব দিলুম না। মনোরঞ্জনও খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল : কাশীতে এখন হাজার দেড়েক মন্দির আছে। সব দেখতে গেলে পাগল হয়ে যাব, এই ভয়ে কয়েকটা নাম লিখে নিয়েছিলুম। তাও মনে রাখতে পারছি না। সেদিন কাল ভৈরব দেখেছি, কিন্তু আরও অনেক ভৈরব আছেন। শঙ্করাচার্য মঠের কাছে বটুক ভৈরব। ভূত ভৈরব কাশীপুরায়; অদ্ভুত মূর্তি বলে তাঁর অন্য নাম বিষম ভৈরব। সেখানে নাকি কাশী দেবীর মন্দির আছে, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি। ঘণ্টাকর্ণ তালাও এই মন্দিরের নিকটে, তীরে বেদব্যাসেশ্বরের মন্দির। মন্দিরে বেদব্যাসের মূর্তি আছে, আর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। যাগেশ্বরের মন্দিরও নাকি বেশি দূরে নয়, যাত্রীরা মন্দিরের কারুকার্যও দেখে।

আমি তার স্মৃতি-শক্তি দেখে আশ্চর্য হলুম, বললুম : এই তো যথেষ্ট মনে রেখেছ।

মনোরঞ্জন বলল : আরও অনেক নাম মনে আছে, কিন্তু সে সব কোথায় তা বলতে পারব না। সঙ্কটা দেবী কামাখ্যা দেবী মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব। সঙ্কটা দেবীর মন্দির দেখা খুবই উচিত হবে। সঙ্কটা দেবী হলেন নবদুর্গার অন্তর্গত মহাগৌরী দুর্গা। তাঁর পাথরের মূর্তি। মন্দিরের কারুকার্য ও একটি পাথরের সিংহ যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চকোটের কালী মন্দির ও তৈলঙ্গ-স্বামীর কালা মন্দিরও আমাদের দেখতে হবে। আর একটি মন্দির দেখতে হবে, তার নাম দাউজীর মন্দির। দাউজীর মূর্তিটি ঠিক জীবন্ত মনে হয়। এই মন্দিরের সামনেই শুনেছি গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের বাড়ি।

আমি বললুম : দাউজীর মন্দির দেখতে আমাকেও যেতে হবে।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হল আমার কথা শুনে। এত সব মন্দিরের নাম শোনার পরে এই মন্দিরটি দেখার আগ্রহ আমার কেন হল, তাই সে জানতে চাইল। বললুম : ঐ মানুষটির সম্বন্ধে আমার অনেক কৌতূহল আছে।

তারপরেই বললুম : দাউজীর সম্বন্ধে যত, কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি। ভারত জোড়া তাঁর পণ্ডিত নাম, কিন্তু মানুষটি কী রকম তাই দেখবার শখ।

মনোরঞ্জন অন্য কথায় চলে গেল, বলল : আমি কাল ভৃগুর খোঁজে বেরব ভাবছি।

ঠিকানা আছে তো !

মনোরঞ্জন বলল : তা নেই। তবে খোঁজাখুঁজি করবার মতো একটা ধারণা নিয়ে এসেছি।

এক জায়গায় আমি একটি গানের সুর শুনতে পেলুম। কোন একটা গলির ভিতর থেকে সেই সুর ভেসে এল। মনোরঞ্জনও যে শুনতে পেয়েছিল তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই বললুম : রাতে একবার বেরবে নাকি ?

প্রথমটায় সে আমার কথা বুঝতে পারে নি, তাই জিজ্ঞেস করেছিল : কোথায় ?

বললুম : কাশীতে এসে ঠুংরি শুনে যাব না। আর নাচ।

মনোরঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল। তাই দেখে আমি বললুম : কোন মন্দিরে তো নহবতের বাজনা শুনলুম না, পয়সা দিয়েই না হয় একটু নাচ গান—

মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল : রোকো।

পর পর তিনখানা রিক্সই দাঁড়াল। রিক্স থেকে নেমে দেখলুম যে আমরা একটা পুরী মিঠায়ের দোকানের সামনে নেমেছি।

রাতে আমি একটু বেরতে চেয়েছিলুম, কিন্তু মনোরঞ্জন কিছুতেই রাজী হয় নি। বলেছিল : না, এখানে আমি তোমাকে বেহায়াপনা করতে দেব না।

আমি তাকে চটাবার জন্য বলেছিলুম : কাশী দেখা তাহলে আমার অসম্পূর্ণ থাকবে।

কেন ?

বাজারে আর মন্দিরে তো কাশী সম্পূর্ণ নয়, ঐ গলির ভিতর গানও একদিন শুনতে হবে।

মনোরঞ্জন কোন উত্তর না দিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে দিয়েছিল।

খিল খুলে আমি বেরিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু তা যাই নি। নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিয়েছিলুম রাতে। সকালে উঠেই বললুম : আমাকে এবারে ছুটি দাও।

মনোরঞ্জন কটমট করে তাকিয়ে বলল : কেন ?

আমার আর ভাল লাগছে না।

কী হলে তোমার ভাল লাগবে তা জানি, কিন্তু সবাই তো আর বেহায়াপনা ভালবাসে না!

এ অভিযোগের উত্তর দিতে আমার ইচ্ছা হল না। কিন্তু

মনোরঞ্জন বলল : সাবিত্রীকে আমি বলেছিলুম। কিন্তু সে বেচারির দোষ কী! তুমি কথা না বললে সে কি গায়ে পড়ে কথা কইবে!

অভদ্র ইঙ্গিত। সমস্ত পরিবেশটাই আমার কাছে অসভ্য বলে মনে হল। সহজ ভাবে যারা মেলামেশা করতে জানে না, পরিচয় হবার আগেই যারা একটা সম্বন্ধের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সুস্থ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, তারাই বলে বেহায়াপনার কথা। সাবিত্রীর জন্য আমার দুঃখ হল। ঐ মেয়েটাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে, আনন্দ করতে বেরিয়ে ওকে অভিনয় করতে হচ্ছে সারাক্ষণ।

স্বাতির কথাও আমার মনে পড়ল। তাকে কোনদিন এই রকম কষ্ট পেতে হয় নি। হাওড়া স্টেশনে আমি তাকে প্রথম দেখেছিলুম। ট্রেনেব কামরায় হাতল ধরে দাঁড়িয়ে সে আমাকে দেখেছিল। তারপর চলতি ট্রেনে আমি যখন উঠে পড়লুম, তখন মামী বললেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল!

মাথা নেড়ে স্বীকার করেছিলুম : দেখিনি।

কিন্তু স্বাতি বড় সপ্রতিভ, সে বলেছিল: আমি কিন্তু গোপালদাকে আগে দেখছি। নতুন কলেজে উঠে কনভোকেশন দেখতে এসেছি। মনে পড়ছে, গোপালদা এম-এর ডিগ্রী নিলেন গোড়ার দিকে।

আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। সহজ হয়ে গেল সম্বন্ধ। এর পর আমাদের আর অভিনয় করবার দরকার হয়নি। মামীকেই এর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। সত্যিকার কোন সম্বন্ধই ছিল না, তবু বলেছিলেন, স্বাতি তোমার বোন। নারীর সঙ্গে পুরুষের তো মা বোনেরই সম্বন্ধ। প্রিয়ার সম্বন্ধটা জোর করে চাপিয়ে দিতে নেই, সেটা প্রাকৃতিক নিয়মেই জন্মানো উচিত।

আমার মনে হল এই অস্বস্তিকর পরিবেশে আমি কিছুতেই টিকতে পারবো না। এখানে টিকতে হলে এই পরিবেশকেই আমার সহজ করে নিতে হবে। তারাপদ বাবু বা তাঁর স্ত্রী আমাকে সাহায্য

করবেন না, বাধা দেবে মনোরঞ্জন। তাই আমাকে পাঁচুর সাহায্য নিতে হবে। এ কথা মনে হতেই ডাকলুম: পাঁচু।

মনোরঞ্জন বলল: কী হল?

বললুম: পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব।

বোকার মতো মনোবঞ্জন আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আব পাঁচু এসে প্রশ্ন করল: ডাকছেন আমাকে?

আমি তার কানেব কাছে মুখ নামিয়ে বললুম: গঙ্গার ধাবে বেড়াতে যাবে?

তারপব ফিস ফিস করে বললুম: আলুকাবলি খাব।

পাঁচু লাফিয়ে উঠল, বলল: দিদিকেও ডাকবো তো!

মনোরঞ্জন কী ভাবল সেই জানে, বলল: হ্যাঁ।

পাঁচু ছুটে গেল তার দিদিকে ডাকতে। কিন্তু সাবিত্রীব বদলে এলেন তারাপদ বাবু। মনোরঞ্জন হেসে বলল: গোপাল গঙ্গাব ধাবে বেড়াতে যাচ্ছে। বললুম, একা কেন যাবে, পাঁচু আর সাবিত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

খুশী হয়ে তাবাপদ বাবু বললেন: ভালই তো, আমি এখুনি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সাবিত্রী এল একটু দেরিতে। সাজগোজ কবেই এল। এই সময়ের মধ্যে আমার মাথায় একটা নতুন ফন্দি খেলে গেছে। প্রচুর আনন্দেব ভান করে আমি বললুম: আসি ভাই তাহলে।

মনোরঞ্জন একটা কটাক্ষ করে বলল: দেখো, বেশি দেবি ক'রো না যেন। বৌদিরা আজ কেদারেশ্ববের পুজো দিতে যাবেন।

আমিও সকৌতুকে বললুম: দেখি।

পথ চলতে চলতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি আমায় কী বলে ডাকো পাঁচু?

কিছু না।

কেন?

মা বারণ করেছে।

বললুম: আমাকে তুমি গোপালদা বলে ডাকবে।

পাঁচু মুখ তুলে তার দিদির দিকে তাকাল, বলল: মা বকবে না তো দিদি!

সাবিত্রী খুবই জড়সড়ো ভাবে চলছিল, কোন রকমে বলল: জানিনে।

আমি তাদের সাহস দিয়ে বললুম: তোমাদের ভয় কি! বলবে গোপালদাই তো শিখিয়ে দিয়েছে। আমার নাম করলেও কি তিনি বকবেন সাবিত্রী?

সাবিত্রী সসঙ্কোচে বলল: না।

শুনলে তো! এইবারে চল, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কী করবে।

পাঁচু তৎপর ভাবে বলে উঠল: আলুকাব্লি খাব গোপালদা।

আমি বললুম: আগে নৌকোয় উঠবেনা; আজ আমরা মাঝির মতো নৌকো বাইব যে!

সত্যি গোপালদা!

বলে পাঁচু লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল।

দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে একখানা নৌকো ভাড়া করে আমরা উঠে বসলুম। পাঁচু আমার পাশে বসল, আর সাবিত্রী বসল একটু তফাতে। মাঝিকে আমি বললুম: আমরা নৌকো বাওয়া শিখব।

পাঁচুর পুলক আর ধরে না, সে বলল: আপনার সঙ্গে আমি রোজ বেড়াব গোপালদা।

সাবিত্রীকে আমি বললুম: আর তুমি?

সাবিত্রী মাথা নিচু করল লজ্জায়।

আমি বললুম: তোমার ভয় কি এখনও ভাঙল না নাকি!

ভয় কিসের!

তবে এমন চুপচাপ কেন!

পাঁচু বলল : আপনার সামনেই দিদি অমন গম্ভীর হয়ে থাকে। তা না হলে—বলব দিদি ?

আমি বললুম : বাড়িতে বুঝি খুব হুড়োহুড়ি করে ?

পাঁচু বলল : পরিমলদার সঙ্গে।

পরিমলদা কে, আমি তা জানতে চাইলুম না। বললুম : হুড়োহুড়ি করতে আমারও খুব ভাল লাগে।

সাবিত্রী বলল : আপনি শুনেছি বেড়াতে খুব ভালবাসেন।

কিন্তু একা বেড়াতে আমি একটুও ভালবাসি না।

অনেক নৌকোর মাঝখান থেকে নিজের নৌকো বার করে মাঝি মণিকর্ণিকার দিকে চলেছিল। পাঁচুকে একটা ইসারা করতেই সে গিয়ে মাঝির পাশে বসল, আর তার নৌকো বাওয়ার কায়দা দেখতে লাগল মন দিয়ে।

সাবিত্রীকে আমি নিজের পাশে ডেকে নিলুম, তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলুম : আমার সম্বন্ধে কিছু শোন নি ?

সাবিত্রীকে ইতস্তত করতে দেখে বললুম : কী শুনেছ বল না।

সাবিত্রী বলল : আপনার মামা-মামীর সঙ্গে আপনি খুব ঘুরে বেড়ান।

সঙ্গে আর কে থাকে ?

সাবিত্রী উত্তর দিল না দেখে বললুম : স্বাতি। তোমার চেয়ে সে বয়সে বড়, আর খুব ভালবাসে আমাকে।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে সাবিত্রী আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকে চুপিচুপি বললুম : তাকেই আমি বিয়ে করব ভেবেছি।

এক মুহূর্তে আমাদের সম্বন্ধ একেবারে সহজ হয়ে গেল। সাবিত্রীও চুপিচুপি বলল : কাউকে বলবেন না যেন। পরিমলদাও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বামুন নয় বলে বাবা মা ওকে দু চক্ষে দেখতে পারে না।

আমি তাকে সাহস দিয়ে বললুম : কোন ভাবনা নেই তোমার, এখন থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

পাঁচু ততক্ষণে মাঝির সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। বলছে: এবারে আমাকে একটু নৌকো বাইতে দাও না।

সাবিত্রী বলল: সাবধান পাঁচু।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলল: আপনি ওকে শাসন করুন গোপালদা, ও ভারি দস্যি ছেলে।

আমি বললুম: মেয়েটিও যে দস্যি দেখছি।

সাবিত্রী এবারে হাসল। এমন সুন্দর স্মিত হাসি আমি তার মুখে এই প্রথম দেখলুম।

ধর্মশালায় ফেরার পথে আমি বললুম: আলুকাবলি খাবে না পাঁচু?

পাঁচু বলল: দিদি ঘুগনি খেতে বেশি ভালবাসে গোপালদা।

খাওয়াবেন গোপালদা?

বলে সাবিত্রী আমাকে একটা দোকানে টেনে আনল। বলল: এই দোকানের ঘুগনি খুব ভাল। আর তেঁতুলের চাটনি দিয়ে দই বড়া।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তোমরা জানলে কী করে।

পাঁচু বলল: সেদিন তো আমরা এই দোকানেরই ঘুগনি কিনে গঙ্গার ঘাটে বসে খাচ্ছিলুম। আপনাকে নৌকোয় দেখে দিদি বলল, দেখতো পাঁচু। আর আমি ছুটে গিয়েছিলাম কাকাবাবুকে ডাকতে।

আমি হেসে বললুম: ভারি দুষ্টু তো তোমরা!

দোকানদার বলল: দই বড়া দেব?

আমি বললুম: ঐ মাখামাখিটা আমার ভাল লাগে না। ফুচ্‌কা আলুকাবলি আছে? জিরের জল দেওয়া গোলগাপ্পা? নেই! তবে এদের দই বড়া আর ঘুগনি দাও, আমাকে শুধু ঘুগনি।

পাঁচু বলল: দই বড়া আমারও ভাল লাগে না।

ইস্, কী রসে আপনারা বঞ্চিত গোপালদা!

বলে সাবিত্রী একটা জিভের শব্দ করল।

অনেক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। রামেশ্বরেও

আমরা দোকানে বসেছিলুম, আমি আর স্বাতি। কফির সঙ্গে বড়া ভাজা খেয়েছিলুম তেঁতুল গোলা জল দিয়ে। স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল, এরা আলুকাব্লি খায় না, ঘুগনি আর ফুচ্কা? আমি বলেছিলুম, তোমার মতো পার্টনার পেলে আমিই একটা দোকান খুলতুম এইখানে। আড়চোখে স্বাতি জবাব দিয়েছিল, রাস্তার মতো আস্বাদ কিন্তু ঘরে কিছুতেই হয় না।

এ সব রসিকতা সাবিত্রীর সঙ্গে চলবে না। স্বাতির চেয়ে সে বয়সে ছোট, বুদ্ধিতেও ছেলেমানুষ। মনোরঞ্জনের কাছে শুনেছি যে স্কুলের পরীক্ষা পাস করে সে কিছুদিন কলেজে গিয়েছিল, এখন কলেজ ছেড়ে বাড়িতে বসে আছে। স্বেচ্ছায় ছেড়েছে, না ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, তা জানিনে। এর পিছনে পরিমলদের ফস্টিনস্টিও থাকতে পারে। বাপ মায়ে তাই প্রবল উৎসাহে বিবাহের চেষ্টা করছেন। সাবিত্রীকে আমার সঙ্গে তাঁরা সাগ্রহে কেন ছেড়ে দিয়েছেন তা সহজেই বুঝতে পারি। শুধু মনোরঞ্জনের কথায় ও পাঁচুর ভরসায় নয়, কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার আশাতেও বটে। কিন্তু আমাদের এই সন্ধির খবর তাঁরা জানবেন না, চট করে বুঝতেও পারবেন না। পরে যখন টের পাবেন তখন হয় তো অভিশাপ দেবেন আমাকে, আর সাবিত্রীর নিগ্রহ তাকে একাই সামলাতে হবে।

দই বড়ায় কামড় দিয়ে সাবিত্রী বলল: আপনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন গোপালদা?

হেসে বললুম: এর পরে কী করা যায় তাই ভাবছি।

সাবিত্রী বলল: এর পরে আমরা পান খাব।

একটা নয়, দুটো করে আমরা পান খেলুম। কাশীর এই মিষ্টি পান সত্যিই উপাদেয়। পানের রঙ হলদে, পাকা পানের মতো মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়, শুধু সুগন্ধি মশলার গন্ধে মন ভরপুর হয়ে থাকে। ঠোঁট লাল করে আমরা ধর্মশালায় ফিরলুম।



তারাপদবাবুরা বাঙালী টোলার কেদারেশ্বর মন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছিলেন, আমি ছুটি চাইলুম। মনোরঞ্জন বলল : ছুটি কিসের?

বললুম : সারাক্ষণ ঠাকুর দেবতা আমার ভাল লাগছে না, আমার একটু মুক্তির দরকার।

তবে এইখানেই থাক।

বলে মনোরঞ্জনেরা বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আমি ঘরে বসে থাকতে পারলুম না। আমি বেরিয়ে পড়লুম ঘরে তালা লাগিয়ে।

প্রথমেই আমার সারনাথের কথা মনে পড়ল। এই যাত্রায় বুদ্ধের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। বুদ্ধগয়ায় আমি যেন সেই মহাপুরুষকে দেখতে পেয়েছি, নতুন করে আবিষ্কার করেছি তাকে। সারনাথেও হয়তো সেই মহাপুরুষকে আমি কাছে পাব, এই ভেবে একাই বেরিয়ে পড়লুম।

সারনাথে নতুন স্টেশন হয়েছে ছোট লাইনের উপর। শুনেছি তার গম্বুজটি ঠিক কুশীনগরের পরিনির্বাণ স্তূপের মতো। সাঁচীর মতো গেট, আর অশোক শৈলীর রেলিং। প্ল্যাটফর্মের শেড হয়েছে অজন্তার মতো।

কিন্তু কাশী থেকে ট্রেনে চেপে বেশি যাত্রী যায় না। তারা ট্যাক্সিতে কিংবা টাঙ্গায় যায়, রিক্সতেও যায় অনেকে। আর সাধারণ যাত্রীরা যায় মোটর বাসে। গোধূলিয়া থেকে এই বাস ছাড়ে। গোধূলিয়ায় গিয়ে আমিও একখানা বাসে চাপলুম।

সারনাথের বাস প্রথমে স্টেশনের দিকে যায়, তারপরে ঘুরে রেল

লাইন পেরিয়ে যায় উত্তরের দিকে। চার মাইল পথ অতিক্রম করতে খুব বেশি সময় লাগে না। রিক্সতেও যাওয়া যায় অল্প সময়ে। রিক্সয় গেলে পায়ে হেঁটে দেখার কষ্ট নেই। রিক্সতে বসেই সব কিছু দেখে ফিরে আসা যায় এক বেলাতেই।

বাস যখন সারনাথের দিকে ছুটছে, আমার তখন বুদ্ধের কথা মনে এল। ভারতের এই অঞ্চলে তিনি মহা মহিমায় বেঁচে আছেন। নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বুদ্ধগয়ায় আর এই সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। শ্রাবস্তী ও সঙ্কাস্তে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন, রাজগৃহ নালন্দা ও বৈশালীতে তিনি জীবনের কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। কুশীনগর তাঁর নির্বাণের স্থান। সাঁচী অজন্তা ও ইলোরায় বৌদ্ধ কীর্তির অপূর্ব নিদর্শন আছে। কিন্তু সেখানে তাঁর পদধূলি পড়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই।

কপিলাবস্তু থেকে লুম্বিনী বারো মাইল দূরে। সন্তান-সম্ভবা মায়া দেবীর ইচ্ছা হয়েছিল পিতামাতার কাছে যাবার। কপিলাবস্তু থেকে তিনি যাত্রা করলেন, কিন্তু দেবদাহে পৌঁছতে পারলেন না। লুম্বিনী বনেই জন্ম হল সিদ্ধার্থের। সম্রাট অশোক এখানে এসে একটি স্তম্ভ স্থাপন করে যান। আর একটি প্রাচীন মন্দির এখানে আজও আছে, চীনা পরিব্রাজকেরা যা দেখে গিয়েছিলেন। এখনও তা খুঁড়ে বার করা সম্ভব হয়নি।

শ্রাবস্তী হল প্রাচীন রাজ্য উত্তর কোশলের রাজধানী। বর্তমান গোণ্ডা জেলার সীমায় সাহেত মাহেতে যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাকেই শ্রাবস্তী বলে অনুমান করা হয়। পাশাপাশি দুটি জায়গা—সাহেতে জেতবন ও মাহেতে প্রাচীন নগর। বুদ্ধ এখানে অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন।

সঙ্কাস্ত নামে আর একটি জায়গাতেও তিনি অলৌকিক কাজ করেছিলেন। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে স্বর্গত মায়ের কাছে অভিধর্ম প্রচার

করে তিনি সেখানে নেমেছিলেন। এটা জেলার সঙ্কিসা গ্রামের প্রাচীন নাম হল সঙ্কাস্য। এখন সেখানে অনেক জায়গা জুড়ে কয়েকটি ঢিপি আছে। চীনা পরিব্রাজকেরা এখানে এসেও অনেক কিছু দেখেছিলেন। বেশি করে মাটি খুঁড়লে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

কুশীনগরে বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থান আমি দেখিনি। আশি বছর বয়সে একটি শাল গাছের নিচে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। এর জন্যই বুঝি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে যাবার জন্য বেরিয়েছিলেন কিনা কে জানে! মৃত্যুর পূর্বে তিনি আনন্দকে বলেছিলেন, আনন্দ তুমি তোমার নিজের আলো হও, নিজের আশ্রয়। অন্য কোন আশ্রয় তুমি খুঁজো না। সত্য হোক তোমার আলো, তোমার আশ্রয়। অন্য কোন আশ্রয় তুমি খুঁজো না। আমার মৃত্যুর পরে যারা সত্যকে নিজের আলো ও আশ্রয় ভাববে, অন্য কোন আশ্রয় খুঁজবে না, তারাই হবে আমার প্রকৃত শিষ্য, আর চলবে ঠিক পথে।

গোরখপুর জেলার কাশিয়া নামক স্থানে অবস্থিত ছিল সেকালের কুশীনগর। কোন অজ্ঞাত কারণে এই নগর অকালে পরিত্যক্ত হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজকেরা এখানে এসে শুধু ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন। আমার পরিচিত কয়েকজন গিয়ে কুশীনগর দেখে এসেছে। নির্বাণ মন্দিরের ছবি তুলে এনেছে, আর আশ্চর্য হয়েছে বুদ্ধের নির্বাণ মূর্তি দেখে।

রাজগৃহ ও নালন্দা আমি দেখেছি, বৈশালীর কথাও শুনেছি। আর সেদিন দেখে এলুম বুদ্ধ গয়া। এবারে সারনাথ দেখব।

বুদ্ধ গয়ায় আমার মনে হয়েছিল যে বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়েছে সেইখানে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে এ কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। সেখানে তিনি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যে প্রশ্নের উত্তরের জন্য তিনি দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন, তার উত্তর পেয়েছিলেন

তিনি বুদ্ধ গয়ায়। 'মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জন্ম মৃত্যু কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর হল, 'মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ কবলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।'

বুদ্ধ ভেবেছিলেন যে এই নূতন সত্য তিনি তাঁর পুরাতন গুরুদের প্রথমে বলবেন, কিন্তু জানতে পারলেন যে তাঁরা গত হয়েছেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের এই কথা শোনাবেন বলে স্থির করলেন। তাঁর পাঁচজন সঙ্গী তখন ঋষিপত্তনে ছিলেন। ঋষিপত্তন সারনাথেরই প্রাচীন নাম। বুদ্ধ সারনাথে এলেন তাঁর সঙ্গীদের খোঁজে। এখানকার মৃগদাব উপবনে বসে তাঁদের নতুন ধর্মের কথা শোনালেন। এরই নাম ধর্মচক্র প্রবর্তন। সঙ্গীরা শিষ্য হলেন। ষাটজন ভিক্ষুকে নিয়ে তিনি সংঘ গঠন করলেন। দিকে দিকে তাঁরাই গেলেন নতুন ধর্ম প্রচারে। সারনাথে তৈরি হল সদ্ধম চক্র প্রবর্তন বিহার। আজ যে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের অসংখ্য মানুষের প্রাণের ধর্ম, সেই ধর্ম এই সারনাথেই প্রথম রূপ নিয়েছিল। নতুন ধর্মের আলো এইখান থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছিল চারি দিকে। বুদ্ধগয়াকে তাই বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান বলা বোধ হয় উচিত হবে না, বৌদ্ধ ধর্মের সত্যিকার জন্ম হয়েছিল সারনাথে।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে আমরা চলেছিলুম। বরুণা নদীর পুল পেরবার পরে কাশীর এলাকা যেন শেষ হয়ে গেল। এই পথ গাজী-পুরের পথ। এই পথের ধারেই সারনাথ এখন একটি সুন্দর লোকালয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু স্টেশন আর পোস্ট অফিস নয়, শুধু রেস্ট হাউস আর ধর্মশালা নয়, স্কুল ও চিকিৎসালয় হয়েছে, পডাশুনা করবার জন্য পাঠাগারও আছে। শান্ত সমাহিত ছোট্ট একটি শহর বলে শুনেছি, নতুন কোন শহরের একটা পরিচ্ছন্ন শৌখিন পাড়ার মতো। পথের ধারে ধারে কয়েকটি সুন্দর বাড়ি আর কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

কিন্তু সকলের আগে আমরা সেই চৌখণ্ডি স্তূপ দেখতে পেলুম পথের ধারে। ছোট পাহাড়ের মতো একটি স্তূপের উপরে ইটের তৈরি একটি চার কোণা স্তম্ভ। বৌদ্ধ স্তূপ ভেঙ্গে পড়েছিল অনেকদিন আগে, তার উপরেই আকবর এই বুরুজটি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাঁর পিতা হুমায়ুন বাদশাহের সারনাথ দর্শন উপলক্ষে। লোকে একে চৌখণ্ডি বলে, কিন্তু স্তূপের কথা সবাই ভুলে গেছে। বুদ্ধকে তাঁর পুরাতন সঙ্গীরা এইখানেই অভ্যর্থনা করেছিলেন। আর বুদ্ধ তাঁর প্রথম পাঠ এই সঙ্গীদেরই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভিক্ষুগণ, ধর্মজীবন যাপনের জন্য বাড়াবাড়ি ভাল নয়, মধ্যপন্থাতেই নির্বাণ লাভ হতে পারে। 'এই জন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, তুমি লোভ কোরোনা, হিংসা কোরোনা, বিলাসে আসক্ত হোয়োনা। যে সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।'—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

আমাদের মোটর বাস কখন এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল

করিনি, যাত্রীদের কলরবে আমি সচেতন হলুম। সবাই নামছিল, আমিও নামলুম। তারপরে হেঁটে অগ্রসর হলুম অনেকের সঙ্গে।

প্রথমেই দেখতে পেলুম ধামেক স্তূপ, যা সবচেয়ে সগৌরবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কানিংহাম সাহেব বলেছিলেন যে ধামেক ধর্মোপদেশক বা ধর্মদেশক শব্দের অপভ্রংশ। দয়ারাম সাহনি বলেছেন, না, সংস্কৃত শব্দ ধর্মেক্ষা কালক্রমে ধামেক হয়েছে। সে যাই হয়ে থাক তা নিয়ে গবেষণা করতে আমরা আসিনি। যাঁরা রিক্সায় এসেছেন, তাঁরা রাস্তার উপরে রিক্স রেখে একটা ছোট গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছেন। আমরাও সেই গেট দিয়ে প্রবেশ করলুম।

বড় একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দু একজন ছবি তুলছিলেন। কালের চিহ্নযুক্ত বিরাট এই স্তূপটিকে বড় ন্যাড়া দেখায়। ছবিতে যখন গাছের একটি ডাল এই স্তূপের পাশে দেখা যায়, তখন একে খানিকটা সজীব মনে হয়। তাই এঁরা ঘুরে ফিরে একটি ডাল ছবিতে আনবার চেষ্টা করছেন।

আমরা এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে বিস্মিত হলুম স্তূপের আকার দেখে। কাছে না গেলে এই বিরাট জিনিসটার সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু, নিচের ব্যাস তিরানব্বুই ফুট। একটি অর্ধ গোলাকার বস্তু, উপরের অংশ নিচের মতো স্থূল নয়, কিছু সংকীর্ণ। অর্থাৎ ভূমির সংলগ্ন ব্যাসের চেয়ে উপরের ব্যাস কম। ক্রমে ক্রমে কমে নি, কমেছে মাঝখান থেকে। স্তূপ এমন বিরাট না হলে বলা যেত যে একটি বিপুলায়তন শিবলিঙ্গ মাটিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এই স্তূপের নিচের অংশ পাথরে গাঁথা, আর উপরের অংশ ইটের তৈরি। স্তূপের গায়ে যে নক্সা ছিল, তার কিছু এখনও অক্ষত আছে। উপরে ও নীচে ফুল লতাপাতা, মাঝখানে জ্যামিতির নক্সা। এত স্পষ্ট যে অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে হবে।

ধামেক স্তূপের এক দিকে একটি জৈন মন্দির দেখলুম। একাদশ

তীর্থঙ্কর শ্রীঅংশনাথের মন্দির। ইনি এখানে সাধনা ও নির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে জৈনদের কাছে এই স্থানটিও পবিত্র।

স্তূপের অন্যদিকে খানিকটা তফাতে মূলগন্ধকুটি বিহার। সুন্দর বাগানের মধ্যে এই নূতন নির্মিত সৌধটি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের আদর্শে নির্মিত। পার্থক্যও আছে। একটি হলঘর এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। লাল সুরকির রাস্তা ধরে আমরা এই বিহারে চলে এলুম। ওধার থেকেও যাত্রীরা আসছেন ধামেক স্তূপ দেখতে। যাঁরা রিক্সয় আসেন তাঁদের রিক্স রাজপথ ধরে এগিয়ে গিয়ে বিহারের সামনে দাঁড়ায়। ফেরার পথে কেউ আর এদিক দিয়ে ফেরে না।

মূলগন্ধকুটি বিহারে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মারবল পাথরের মেঝে দেখে নয়, দেওয়ালের ফ্রেস্কো দেখে। অজন্তার শৈলীতে চারিদিক চিত্রিত। শুনলুম যে জাপানের বিখ্যাত শিল্পী কসেট্সু নোসু এই চিত্রগুলি এঁকেছেন। বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাকে এখানে রূপ দেওয়া হয়েছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবোধি সোসাইটি এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। নাগার্জুনকোণ্ডা ও তক্ষশীলায় যে সব বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা এই মন্দিরেই সংরক্ষিত আছে। পুরাকালের মূলগন্ধকুটি এখন একটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

বিহার থেকে বেরিয়ে আমরা বিড়লার রেস্টহাউস দেখলুম। এই দোতলা বাড়িতে যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। পূর্বদিকে খানিকটা এগিয়ে দেখলুম চীনামন্দির। খাঁটি চীনা শৈলীতে তৈরি। চীনা উপাসনার কিছু পরিচয় এই মন্দিরে পাওয়া যায়। একটি বর্মী বিহারও এখানে আছে। আর আছে যাত্রীদের জন্য একটি দোতলা ধর্মশালা।

সারনাথেও মাটি খুঁড়ে প্রাচীন নিদর্শন বার করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই জায়গাটিও আমরা দেখলুম। এইখানেই কোথাও ছিল ধর্মরাজিক স্তূপ। আষাঢ়ের এক পূর্ণিমায় বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রথম যেখানে

উপদেশ দিয়েছিলেন, স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল সেইখানে। সেই স্তূপেরই ইঁট ভেঙ্গে নিয়ে গিয়ে জগৎ সিংহের মহল্লা তৈরি হয়েছে। জগৎ সিংহ দেওয়ান ছিলেন কাশীর রাজা চেৎসিংহের। তাঁর লোকেরাই সারনাথকে আবার আবিষ্কার করেছে।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ শো বছর আগে এই স্থান ছিল অরণ্যময়। হরিণেরা বিহার করত নিঃশঙ্ক মনে। ঋষিদের আশ্রম ছিল নানা স্থানে। তাই লোকে এইস্থানকে ঋষিপত্তন বলত, বলত মৃগদাব। পালি ভাষায় বলত ইসিপতন ও মিগদাব। যে পাঁচজন সঙ্গী বুদ্ধকে পরিত্যাগ করে উরুবিল্ব থেকে চলে এসেছিলেন ধর্ম চর্চার জন্য, তাঁরা এই ঋষিপত্তনের মৃগদাবে বাস করছিলেন। তাঁদেরই আকর্ষণে বুদ্ধ এসেছিলেন এখানে। ঋষিপত্তনের নাম সারনাথ হল কেমন করে তা জানা যায় না। কানিংহাম সাহেব বলেন যে সারনাথেও আছে মৃগের কথা, সারঙ্গ মানে মৃগ, সারঙ্গনাথ থেকেই সারনাথ হয়েছে। সারঙ্গনাথ বুদ্ধেরই নাম।

ধীরে ধীরে এই সারনাথের উন্নতি হয়েছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানের খ্যাতি ছিল বিশ্ববিশ্রুত। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এসেছিলেন এখানে, তিনি দেখেছিলেন চারটি স্তূপ। বুদ্ধ যেখানে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেখানে একটি, যেখানে তিনি ধর্ম চক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেখানে আর একটি। তৃতীয়টি নির্মিত হয়েছিল সেইখানে যেখানে তিনি মৈত্রেয়র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আর এলাপত্র নাগ যেখানে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল চতুর্থটি সেইখানে। হিউএন চাঙের বর্ণনায় আমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর সারনাথ কেন ধ্বংস হয়ে গেল সে কথা জানতে পারি না।

কাশীর ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ সারনাথ আক্রমণ করে ধ্বংস করেছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হিউএন চাঙ এখানে অনেক বিহার ও অনেক ভিক্ষু দেখেছিলেন। চেষ্টা করলেও ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ক্ষতি

করতে পারত না। বরং মনে হয় যে মুসলমানেরা যখন কাশী আক্রমণ করে, তখনই ক্ষতি হয়েছে সারনাথের। শুধু ক্ষতি নয়, সব কিছুই একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, মাটির উপরে জেগে ছিল শুধু কয়েকটি স্তূপ। সেই স্তূপেরই ইট সংগ্রহের চেষ্টায় জগৎসিংহ আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন সারনাথ।

সকলের শেষে আমরা সারনাথের যাদুঘর দেখতে গেলুম। সুন্দর একটি উদ্যানের মধ্যে এই যাদুঘর। মাঝখানে মস্ত বড় ঘর, দুধারেও ঘর। কত শত মূর্তি দেখলুম তার হিসাব নেই। সেই বিখ্যাত অশোক স্তম্ভও দেখলুম। সারনাথের লায়ন ক্যাপিটাল, ধর্ম চক্রের উপরে চারটি সিংহ। বুদ্ধের নানা ভঙ্গির মূর্তি। আর একটি পাথরের বাক্স। জগৎ সিংহ যখন ইট সংগ্রহের জন্যে একটি স্তূপ খোঁড়েন, তখন তার ভিতরে এই বাক্সটি পাওয়া গিয়েছিল। এই বাক্সের ভিতরে একটি সোনার পাত্রে ছিল অস্থি। জগৎ সিংহের হুকুমে সেই অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল, সোনার পাত্রটি কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। আমরা পাথরের বাক্সটি দেখে এই গল্প শুনলুম।

বাসে বসে সারনাথ আমি পিছনে ফেলে এলুম, কিন্তু মন আমার সেখানেই পড়ে রইল।

একদিন বুদ্ধ বলেছিলেন—

ন পরোপরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কথচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্ঞা নঞ্ঞ মঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

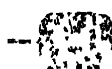
পরস্পরকে বঞ্চনা কোরোনা, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরোনা, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরোনা।

সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদ পনং এতং বুদ্ধান সাসনং॥

কোন পাপ না করা, কুশল কাজ করা ও নিজের মনকে পবিত্র করা—এই হল বুদ্ধের অনুশাসন।

আর একটি কবিতা আমার মনে পড়ল। সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুম তলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ—
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।



বিকেল বেলায় আমরা ভৃগুর সন্ধানে বার হলুম। তারাপদবাবুরা বেরলেন না। মিসেস মুখার্জি বেরতে রাজী ছিলেন না। বললেন: রোজ রাত্তিরে হোটেলে খেলে আপনাদের অসুখ করবে।

মনোরঞ্জন বলল: আমরা তো হোটেলে খাচ্চি না, যা খাচ্ছি দাদার তা সহ্য হবে।

মিসেস মুখার্জি বললেন: একদিনও কি ভাল করে আপনাদের খাওয়াতে পারলাম!

তারাপদবাবু বললেন: সত্যিই তো!

পাঁচু বলে উঠল: আজ আমরা পোলাও মাংস খাব।

লজ্জিতভাবে মিসেস মুখার্জি বললেন: রান্নাবান্নার কি কোন সুবিধে এখানে আছে!

আমিও লজ্জিত হয়েছিলুম, কিন্তু কোনও কথা বলতে পারিনি। মনোরঞ্জন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

ভৃগুর অন্বেষণ করে ফিরে আসতে আমাদের বেশি দেরী হয় নি। দেখা পাই নি তাঁর। দেখা পাওয়া যাবে কি না তারও ঠিক নেই। অপ্রসন্ন মন নিয়ে মনোরঞ্জন ধর্মশালায় ফিরল।

রাতের আহার সেরে নিজেদের ঘরে ফিরতেই পাঁচু মনোরঞ্জনকে ডাকতে এল। বলল: মা আপনাকে ডাকছেন কাকাবাবু।

মনোরঞ্জন আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: বুঝেছি।

আমি বললুম: এই ফাঁকে আমিও ঘুরে আসি।

কোথায় ?

বললুম ঃ যত্র তত্র।

মনোরঞ্জনের দৃষ্টি কঠিন হল।

তাই দেখে ভয় পাবার ভান করে বললুম ঃ ভস্ম করে ফেলবে নাকি ? কিন্তু শাস্ত্র বাক্য জান তো ! একটা শহরের সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করতে হলে তিনটি স্থান দেখতে হয়, মন্দির, বাজার, আর—

পাঁচু দাঁড়িয়ে ছিল বলে কথাটা শেষ করতে পারলুম না। বললুম ঃ মন্দির আর বাজার তো দেখা হয়েছে। এবার তৃতীয় স্থানটি দেখবার অনুমতি দাও

বলে আমি আর অপেক্ষা করলুম না। স্তম্ভিত মনোরঞ্জনকে ঘরে ফেলেই আমি বেরিয়ে গেলুম। পিছনে পাঁচুর প্রশ্ন আমি শুনতে পেয়েছিলুম। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ গোপালদা কোথায় গেলেন কাকাবাবু ?

মনোরঞ্জন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল ঃ গঙ্গার ধারে।

চকে গিয়ে বাঈজীর গান শোনার বাসনা আমার ছিল না। শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই এই ছলনার প্রয়োজন হয়েছে। মনোরঞ্জন এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়। সে আমার যন্ত্রণার কারণ জানে। যে দিনগুলির স্মৃতি আমি সযত্নে লালন করি তা সে মিথ্যা মনে করে, আমার স্বপ্নকে ভাবে দুর্বলতা। আমার মুক্তির জন্যই সে আমাকে নায়িকা বদলের পরামর্শ দিয়েছে। শুধু পরামর্শ নয়, ঘটকালিও শুরু করেছে। পুরীযাত্রী এই মুখার্জি পরিবারকে আমার সংবাদ দিয়েছিল, এখানে আমার অজ্ঞাতসারে এমন যোগাযোগ করেছে যে পদে পদে আমি বিব্রত বোধ করছি। কোন তরফ থেকেই প্রস্তাব আসেনি, কিন্তু সাবিত্রীর লজ্জা দেখেই সব কিছু অনুমান করতে পেরেছি।

পথে বেরিয়ে আমি চকের দিকে গেলুম না। পা বাড়ালুম

গঙ্গার দিকে। কোন ঘাটে বসে খানিকটা সময় কাটাবার ইচ্ছা হল। কাশীর গঙ্গার ঘাট বড় পবিত্র। কত সাধু মহাত্মা মহাপুরুষ এই ঘাটে বসে সাধনা করেছেন তার হিসাব কেউ রাখে না। অগণিত ভক্তের ভিতর সাধুরা লুকিয়ে থাকেন। সাধুকে যে খুঁজে বার করতে পারে সেও সাধারণ মানুষ নয়। তৈলঙ্গস্বামী ধরা দিয়েছিলেন বলেই আমরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলুম। কেন তিনি ধরা দিয়েছিলেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। দেশে ইংরেজ-ভক্তি বেড়ে গিয়েছিল। নিজের দেশের আচার ধর্মকে লোকে কুসংস্কার বলে পরিহার করতে দ্বিধা করছিল না। তৈলঙ্গস্বামী সেই ভাঙনের যুগে অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে হিন্দু ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। এ যুগের শঙ্করাচার্য তিনি।

দশাশ্বমেধ ঘাটের নানা স্থানে জটলা হচ্ছিল। সবাইকে বাঁচিয়ে আমি একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলুম। সামনে অনেকগুলো বজরা ও নৌকো বাঁধা আছে। পাশের কোন ঘাট থেকে কিছু পাঠের শব্দ ভেসে আসছে, গানের শব্দও আসছে অল্প অল্প। আমার মতো নিঃশব্দে বসে থাকতে কেউ এসেছে কিনা দেখতে পেলুম না। সুখী মানুষ নীরব থাকতে চায় না, দুঃখ মানুষকে মূক করে। সুখে আছে ভোগের বাসনা, বেদনায় বৈরাগ্যের অঙ্কুর। সুখ দুঃখ আনে, দুঃখ আনে মহত্ত্ব। দুঃখকে জয় করেই মানুষ হয় মহাপুরুষ।

সহসা আমার মহাপুরুষদের কথা মনে পড়ল। শুধু তৈলঙ্গস্বামীর কথা নয়, রামানন্দ কবীর মধুসূদন সরস্বতী ও গোরক্ষনাথের কথা। একজন মহাপুরুষ আর একজনকে পরীক্ষা করেছেন এই গঙ্গার ধারে, একজন আর একজনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। কেউবা আত্মগোপন করে শুধু সাধনাই করে গেছেন।

প্রথমেই আমার দেবাদিদেব শিবের কথা মনে পড়ল। মহর্ষি বেদব্যাসকে তিনি এইখানে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বেদব্যাস

শঙ্করাচার্যকে পরীক্ষার জন্য উত্তর কাশীতে গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরু গোরক্ষনাথ আবার বারাণসীতে এসেছিলেন বাঙালা সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতীকে পরীক্ষার জন্য। গঙ্গায় স্নান করে ফেরার পথে গোরক্ষনাথ মধুসূদনকে বললেন. তোমাকে একটি উপহার দিতে চাই।

কী উপহার ?

চিন্তামণি রত্ন। এই রত্নের গুণে তোমার কোন অভাব থাকবে না। যা চাইবে, তাই তুমি পাবে।

মধুসূদন সবিনয়ে বললেন, আমার তো কোন অভাব নেই। যার আছে, তাকে আপনি দান করুন।

অনেক অনুরোধ করে গোরক্ষনাথ সেই রত্নটি মধুসূদনের হাতে দিলেন। ভাবলেন যে মধুসূদন তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। কিন্তু না, হেরে যাবার ছেলে মধুসূদন নন। রত্নটি হাতে নিয়েই গঙ্গার জলে তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। গোরক্ষনাথ হেসে বললেন, সত্যিই তোমার কোন অভাব নেই।

গুরু শিষ্য রামানন্দ ও কবীরের কথাও আমার মনে পড়ছে। তাঁরাও ছিলেন প্রায় একই সময়ের মানুষ। রামানন্দ জন্মেছিলেন প্রয়াগের নিকটে, বারো বৎসর বয়সে বারাণসীতে এসেছিলেন শিক্ষার জন্যে। পরিশ্রমী মেধাবী বালক তাঁর গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু যোগ দেখে তিনি রাঘবানন্দের হাতে বালককে সমর্পণ করেন। রাঘবানন্দ তাঁকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তীর্থ পরিক্রমার উপদেশ দেন। ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে রামানন্দ বারাণসীতে ফিরে এলেন। মৃত্যু তাঁর হল না, একশো এগার বছর তিনি বেঁচেছিলেন।

রামানন্দ তাঁর উদার মতবাদের জন্য গুরুর মঠের অধিকার পাননি। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। মধ্য যুগের প্রায় সকল মহাপুরুষই তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছেন।

শুধু কবীর দাদূ ও তুলসীদাস নন, শিখগুরু নানকও তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন।

মুসলমান জোলার পুত্র বলে কবীর পরিচিত ছিলেন। আসলে তিনি তার পালিত পুত্র। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। এই কাশীর নিকটেই থাকতেন এক ব্রাহ্মণের বিধবা। বিপদে পড়ে তিনি এক সাধুর কাছে গিয়েছিলেন আশীর্বাদের জন্য। সাধু তাঁকে পুত্রবতী হও বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। কবীরের জন্ম হয় এই সাধুর আশীর্বাদে। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে বিধবা মা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এক মুসলমান জোলা তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন।

বিবাহ করে কবীর সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর জীবিকা ছিল তাঁত। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর মনে পরিবর্তন এল। দীক্ষার জন্য তিনি রামানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মুসলমান বলে রামানন্দ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কবীর দুঃখ পেলেন, কিন্তু গুরুর আশা ছাড়লেন না। কাশীর যে ঘাটে রামানন্দ স্বামী আসতেন গঙ্গাস্নানে, শেষ রাতে কবীর গিয়ে শুয়ে রইলেন সেই ঘাটে। অন্ধকারে তাঁর দেহে পা পড়তেই রামানন্দ বলে উঠলেন, রাম রাম। এতেই কবীরের দীক্ষা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গুরুকে তিনি প্রণাম করলেন। মাথা মুড়িয়ে হলেন বৈষ্ণব।

মুসলমান বলে রামানন্দ তাঁকে নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন নি। দরদী কবীর অন্য এক সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় আখড়া আজও বারাণসীতেই আছে।

রাঘবানন্দ ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠাধ্যক্ষ, তাঁদের গোঁড়ামি ছিল। তীর্থ পর্যটনে জাত গিয়েছিল বলে রামানন্দকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। আর রামানন্দ বলেছিলেন, জাত আমি মানিনে।—

জাতি পাঁতি পুছাই নাহি কোই।
হরি কো ভজে সো হরিকা হোই॥

কবীর ছিলেন আরও উদার। তিনি বলেছিলেন—

জাতি পাঁতি কুল কাপরা য়হ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহো রামানন্দ যেউ রহে ঝক্‌মারি॥
জাতি হমারী বাণী কুল করতা ঔর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি॥

এই উদার মতবাদের জন্যই মুসলমানেরা বলে তিনি মুসলমান ছিলেন, আর বৈষ্ণবরা তাঁকে হিন্দু বলে দাবী করেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর শবদেহ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে কাড়াকাড়ি পড়েছিল। মুসলমানেরা বলে, আমরা কবর দেব; হিন্দুরা বলে, আমরা পোড়াব। সেই সময় নাকি কবীর নিজেই বলেন, আমার আবরণ তুলে দেখ। মৃতদেহের আবরণ সরিয়ে সবার চক্ষু স্থির। কোন মৃতদেহ নেই, আছে শুধু এক রাশি ফুল।

এমনি করেই একদিন তৈলঙ্গস্বামী এসেছিলেন কাশীতে। পঞ্চগঙ্গার ঘাটের কাছে বেণীমাধবের এলাকায় বাস করতেন সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসী। কাশীর লোক তাঁকে সচল বিশ্বনাথ বলত। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার মতো কাশীযাত্রী তাঁকেও দর্শন করে যেত। এ খুব পুরনো ঘটনা নয়। তাঁকে দেখেছে এমন লোক বোধ হয় আজও জীবিত আছেন। কাশীতে তিনি দেহ রক্ষা করেছেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

তৈলঙ্গ স্বামীর কোন মঠ ছিল না। শিষ্যের দান নিয়ে তিনি আশ্রমে বাস করেন নি। এ দেশের বহু সন্ন্যাসীর মতো তিনি একা ছিলেন। কিন্তু আর সবার মতো তিনি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাননি।

তৈলঙ্গস্বামীর জন্ম হয়েছিল অন্ধ্র দেশে। জমিদার ব্রাহ্মণের

পুত্র তিনি। সারাজীবন অবিবাহিত থেকে ধর্মচর্চা করেছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পরেও সংসারে ছিলেন। গৃহত্যাগ করেছিলেন বাহাত্তর বছর বয়সে, পুষ্করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন আটাত্তর বছর বয়সে। তখনও তাঁর দেহে বার্ধক্যের লক্ষণ ছিল না, শেষ জীবনেও তাঁর বয়স অনুমান করতে কেউ পারেনি।

শিবের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর পিতামাতা তাঁকে পেয়েছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল শিবরাম। ধর্মজীবনে মা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, মায়ের প্রশ্রয়েই তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসী নাম গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তৈলঙ্গ দেশে জন্ম বলে তিনি তৈলঙ্গ স্বামী নামেই বিখ্যাত।

এই মহাপুরুষের জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা আমাদের জানা আছে। কেন তিনি জনসাধারণের কাছে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে যে তাঁর প্রত্যেকটি কাজের পিছনে যুক্তি ছিল। অসহায় মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। তাই কঠিন রোগে কাতর মানুষকে তিনি নিরাময় করেছেন। মৃতেরও প্রাণ দান করেছেন একই কারণে। অর্থ প্রতিপত্তিতে কিংবা ক্ষমতার অহংকারে মানুষকে যারা অবজ্ঞা করেছে, তাদের তিনি চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। আর যে বিদেশীরা হিন্দু যোগীকে অসভ্য ভেবেছে, তাদেরও অহংকার তিনি চূর্ণ করেছেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসেছিলেন তাঁর কাছে। তাঁকে তিনি আচার ও অনাচারের কথা শিখিয়েছেন বর্বর মানুষের মতো অভিনয় করে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মান করেছেন মহাপুরুষের মতো। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে দেবতার মতো সম্মান করেছেন।

হিন্দু যোগীর আদর্শ ছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। তাই তাঁকে কাশীর মানুষ সচল বিশ্বনাথ বলত। তাঁর মাথাতেও গঙ্গাজল ঢেলে পুজো করতো এই মহাপুরুষের।

রাত কত হয়েছিল জানিনে। গঙ্গার ঘাটে মানুষের ভিড় আর নেই। এখানে সেখানে দু'একজন লোক শুধু বসে আছেন। আর একজন গান গাইছিলেন গুনগুন করে। স্তোত্রপাঠের মতো গান। বোধ হয় বিশ্বনাথের নাম করছেন।

কখন্ আমি নিজের কথা ভাবতে শুরু করেছিলুম মনে নেই। মন আমার ভারি হয়েছিল ভাবনায়। শুধু অতীতের নয়, ভবিষ্যতের ভাবনাতেও মন থমথম করছিল। কেউ কি আমাকে নিয়ে খেলছে!

পৃথিবীটাই তো একটা খেলার জায়গা বাবা, তা নিয়ে ভাববার কী আছে!

আমি চমকে পিছনে চেয়ে দেখলুম। এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। কাকে এই কথাগুলি বললেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললুম: একটু বসবেন!

ভদ্রলোক কোন আপত্তি না করে বসে পড়লেন। তাঁর প্রসন্ন-দৃষ্টি দেখে আমি শ্রদ্ধায় অবনত হলুম।

ভদ্রলোক বললেন: দুঃখকে ভয় নেই। দুঃখ মানুষের বন্ধু। মানুষকে বৃহৎ করে, মহৎ করে। দুঃখের পথেই মানুষের মুক্তি।

কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগে যে আমারও এই কথা মনে হয়েছিল। ইনি কি মনের কথাও জানতে পারেন!

ভদ্রলোক বললেন: অন্তর্যামী সব জানেন, সব বোঝেন। যোগ্য মানুষকে নিয়েই তিনি পরীক্ষা করেন, আশীর্বাদও করেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার।

ভদ্রলোক উত্তর ভারতের কোন্ ভাষা বলছিলেন, আমি তা বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু তাঁর কথার মানে বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। খানিকক্ষণ নিঃশব্দ থেকে বলেছিলেন: এইবারে ঘরে যাও।

আমি তাঁর প্রতিবাদ করিনি, কোনও প্রশ্নও করি নি। নিঃশব্দে তাঁকে প্রণাম করে ফিরে এলুম।···কাশীর পথ তখন জনশূন্য।

২১

রাতে যখন ধর্মশালায় ফিরেছিলুম, সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজা খোলা রেখে মনোরঞ্জন নাক ডাকাচ্ছিল।

পরদিন সকালে উঠে সে আমার সঙ্গে কথা কইল না। নিঃশব্দে তার তল্পিতল্পা বেঁধে ফেলল। পাশের ঘরেও যাত্রাব আয়োজন দেখলুম। বুঝতে কষ্ট হল না যে গত রাত্রেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁচুর কাছে জানলুম যে আজ সকালেই আমরা হরিদ্বাবের গাড়ি ধরব।

দেরাতুনগামী দূন এক্সপ্রেস বেলা সোয়া এগারটার সময় বেনারস ছাড়ে। সকাল সকাল খেয়ে আমরা ট্রেন ধরলুম। এবারে আর আলাদা গাড়িতে নয়, মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে এক গাড়িতেই উঠলুম। কোণার দিকটা ওঁদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমি একটু দূরে বসলুম।

নানা কারণে মনোরঞ্জনের মেজাজ আজ ভাল ছিল না। শুধু আমার ব্যবহারেই ক্ষুব্ধ হয় নি, ভৃগুর সন্ধানেও ব্যর্থ হয়েছিল। গত সন্ধ্যায় শাস্ত্রীজীর প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক বলেছিলেন যে তিনি এখন দিল্লীতে আছেন। মাঝে মাঝেই সেখানে যান এবং থাকেন নিউ দিল্লীতে এক শিষ্যের বাড়িতে। শুধু এম. পি. নয়, মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছেন। সরকারী কোন কাজ হাঁসিলের দরকার থাকলে মন্ত্রীর বদলে শাস্ত্রীজীকে ধরলেই চলে। দিল্লীতে এখন তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি।

কবে ফিরবেন?

কোন ঠিক নেই।

হরিদ্বারে মাঝে মাঝে যান শুনেছি।

আগে যেতেন, এখন যান কিনা জানি না।

তার পর মনোরঞ্জন ভৃগুর গণনাব সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিল। ভদ্রলোক বলেছিলেন: গণনা আমি জানি না, তবে কী করেন জানি। ওই কাগজপত্র আমার থাকলে আমিও জ্যোতিষী হতে পারতুম।

কী রকম?

অনেক প্রাচীন কাগজপত্র আছে, ভৃগুর গণনা। অনেকে এই ভৃগুকে আমাদের প্রাচীন ঋষি ভৃগু বলে মনে করেন। তা ভুল অনেক পরবর্তী কালে ভৃগু নামে একজন ক্ষমতাশালী জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁর গণনার কোন পদ্ধতি নেই। তিনি নিজে কোন কায়দায় গণনা করে ঠিকুজি তৈরি করেছিলেন। জন্ম রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে এক একজনেব এক একখানি ঠিকুজি। শুনে আশ্চর্য হবেন যে তিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতকের ঠিকুজি তৈরি করে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন জ্যোতিষীর কাছে সমস্ত ঠিকুজি পাওয়া যায় না। যাঁর কাছে যে কখানা আছে, তিনি তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন।

বাকী লোকের কী হয়?

জাল জালিয়াতি।

মানে?

নেই, এ কথা তো বলা যায় না। তাই নিজেদেরই তৈরি কবে রাখতে হয়েছে। সেগুলো মেলে না। আসল ভৃগু যার পাওয়া যায়, তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা যে মিলে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়েছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: আপনি আপনার ঠিকুজি নিয়ে আসবেন। জন্মের রাশি নক্ষত্র মিলিয়ে আপনার সঠিক কাগজখানি যদি পাওয়া যায় তো শাস্ত্রীজী তা আপনাকে পড়ে শোনাবেন। আর আপনি আপনার জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে যাবেন। আপনার অতীত

মিলবে, বর্তমান মিলবে, তখন আপনি আপনার ভবিষ্যৎ লিখে নেবেন। আপনার মৃত্যুর তারিখ বার সময় পর্যন্ত লেখা আছে।

কী করে তা সম্ভব?

অসম্ভব কিছুই নয়। গ্রহ নক্ষত্রের এক রকম সমাবেশ কয়েক হাজার বছর পরে হয়। কাজেই ওই কাগজটি একজনের জন্যেই তৈরি অথবা এক সময়ে জন্মেছে এমন অনেক লোকের জন্যে। একটা গল্প বলি, তাহলেই ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন।

কিছু দিন আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন শাস্ত্রীজীর কাছে। সে দিন আমি তাঁর বৈঠকখানায় ছিলুম। কয়েক দিন ধরে খুঁজে পেতে শাস্ত্রীজী ঠিক কাগজখানি বার করে রেখেছিলেন। ভদ্রলোক আসতেই শাস্ত্রীজী পড়তে শুরু করলেন। সাধারণ ঘরেব ছেলে, লেখাপড়ায় খুব তীক্ষ্ণ মেধাবী, পরিশ্রমী, জীবনে উন্নতি করবেন, আবার রাজার সঙ্গে বিবাদের জন্যে জেল খাটবেন। খুঁটিনাটি অনেক কিছু বলেছিলেন, সেগুলো মিলছে কি মিলছে না তা সেই ভদ্রলোকই বুঝছেন। হঠাৎ আমরা শুনে চমকে উঠলুম যে এই জাতক নিজেই রাজা হয়েছেন। কত বছর কত মাস, কত সাল কত তারিখ। কিন্তু আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই আর এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাইরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আগন্তুক চলে গেলেন ও ভদ্রলোক আবার ভিতরে এসে ফরাসে বসলেন। শাস্ত্রীজী পড়লেন যে এই পর্যন্ত পড়বার পরে যদি কোন রাজপুরুষ এসে কোন জরুরী রাজকার্যের জন্য পড়ায় বাধা সৃষ্টি করেন, তবে বাকি অংশটুকুও পড়তে পারেন। শাস্ত্রীজী সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন আর ভদ্রলোক সংক্ষেপে অনুরোধ করলেন, পড়ুন।

মনোরঞ্জন তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ভদ্রলোক কোথাকার রাজা?

বলছি। তার আগে আরও একটু শুনুন।

বলুন।

শাস্ত্রীজী পড়লেন, রাজসম্মান ও রাজকার্য জাতকের ভাল লাগবে না। বিদ্যানুরাগ তাঁর মানসিক শান্তির অন্তরায় হবে। অনেক বিচার বিবেচনার পর তিনি স্বেচ্ছায় রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করে বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করবেন। এই ঘটনারও সময় তারিখ দেওয়া আছে।

মনোরঞ্জন বলল: এইবারে ভদ্রলোকের পরিচয় দিন।

ভদ্রলোক নিজে তাঁর পরিচয় দেন নি, শাস্ত্রীজীর প্রণামী দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমরা চেষ্টা করে জেনেছিলুম যে তিনি একটি রাজ্যের রাজ্যপাল।

একটি নাম আমার মুখে এসেছিল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই ভদ্রলোক বললেন: তাঁর নাম আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। শুধু জেনে রাখুন যে কিছু দিন পরেই খবরের কাগজে তাঁর গদি ত্যাগের খবর পড়ে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

মনোরঞ্জন বলল: সত্যি বলছেন?

আমি সত্যি বলছি, কিন্তু ভদ্রলোকের পরিচয় যদি মিথ্যা জেনে থাকি তো অপরাধ নেবেন না।

খানিক ক্ষণ চিন্তা করে মনোরঞ্জন বলল: এখানে কত দিন অপেক্ষা করলে শাস্ত্রীজীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?

বলতে পারি না।

আমরা এখান থেকে হরিদ্বারে যাব ভাবছি। সেখানেই কি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব?

সেখানেই এ খোঁজ নেবেন।

মনোরঞ্জন নাছোড়বান্দা, বলল: আপনি কী পরামর্শ দেন?

আমার পরামর্শ। খুব বেশি দরকার থাকলে দিল্লীই চলে যান। কিংবা—

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে মনোরঞ্জন বলল: বলুন।

দেশে ফেরার পথে এইখানে আর একবার খোঁজ নিয়ে যাবেন।

ভেবে দেখি।

বলে মনোরঞ্জন তাঁর কাছে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু কী করবে এখনও স্থির কবতে পাবে নি বলে মেজাজ অপ্রসন্ন আছে। হঠাৎ আমার উপরেই ক্ষেপে উঠল, বলল: তোমাব সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

প্রশ্ন করলুম: কিসে বাড়াবাড়ি দেখলে?

দু দিন আগে যখন কথা বলছিলে না তখন একেবারে মৌনীবাবা, এখন তোমার বেহায়াপনা দেখে আমাদের লজ্জা করছে।

এ কথার কোন উত্তব না দিয়ে আমি হাসলুম।

হাসছ কোন্ আক্কেলে।

আজ মেজাজ এমন খারাপ কেন?

দেশে তোমাকে চিনতে পারলে এমন কাজ আমি করতুম না।

গম্ভীর ভাবে বললুম: এখন চিনেছ তো, সাবধান হবার সময় এখনও যায় নি।

মনোরঞ্জন বলল: নাকটা যে কাটা গেল।

সে তো নিজেই কেটেছ। আমাকে না জানিয়ে তোমরা এত বড় ষড়যন্ত্র করলে, আর এখন দোষ হল আমার!

মনোরঞ্জনের রাগ বোধ হয় খানিকটা পড়ল, বলল: একটু রয়ে সয়ে এগোতে হয়।

বললুম: সময় মতো শেখাবে তো সব।

দেখ, এখন আমি তোমার গুরুজন। আমার সামনে তোমার মধ্যে চলা উচিত। আর সাবিত্রীকেও সে কথা জানিয়ে দিয়ো।

যে আজ্ঞে।

সহসা দেখলুম যে মনোরঞ্জনের এখন আত্মপ্রসাদের আর অন্ত নেই। সে তার কৌশল সার্থক হয়েছে ভেবে পুলকিত।

তারাপদবাবু ও তাঁর স্ত্রীকেও প্রফুল্ল দেখাচ্ছি। মেয়ের একটা গতি হবে ভেবে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সাবিত্রীও সব বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে নি। প্রকাশ করাও তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হেসেছে। মনোরঞ্জন তার এ হাসিটিও দেখেছে, এবং তার আত্মপ্রসাদ আরও বেড়েছে।

এইবারে আমি মনোরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলুম: মেজাজ তোমার খারাপ হয়েছিল কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

বোঝবার খুব চেষ্টা করব।

আমাদের দিল্লী যাওয়া কেন অসম্ভব বলতে পার?

পারি।

মনোরঞ্জন সোজা হয়ে বলল: পার বলতে?

হেসে বললুম: শাস্ত্রীর বদলে যদি স্বাতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

মনোরঞ্জন বড় বড় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: দেখা হবেই। দিল্লী যাব, অথচ স্বাতির সঙ্গে দেখা হবে না, এ একটা কথা হল?

মনোরঞ্জন বিব্রত ভাবে বলল: তুমি কি ভৃগুর গণনা শিখলে নাকি?

তার পরেই ঝাঁজিয়ে উঠল: তোমার কি লজ্জা সরম নেই! এ পর্যন্ত কতবার লাথি খেলে বল তো?

মাত্র বার কয়েক। কিন্তু তাতে পিছিয়ে এলে আমার পৌরুষটা রইল কোথায়!

কী বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি। দিল্লীতে তোমার সঙ্গে চাওলার পরিচয় করিয়ে দেব, সে মিত্রার কাছে অন্তত হাজার বার লাথি খেয়েছে, তবু

এখনও তার আশা ছাড়ে নি। আমার মনে হয় আশা ছাড়বার আর দরকার নেই। অগ্নি পরীক্ষায় চাওলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মিত্রার কথাগুলি আমি আজও ভুলি নি, কোন দিন ভুলব না। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধ হয় কোন দিন দেখি নি। গোড়া থেকেই আমি এ কথা অনুভব করেছিলুম। সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করেছিলুম সেই দিন, যে দিন ওখলায় আমার পাশে বসে বলেছিল: চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

কেন জানি না, সেই মুহূর্তে মিত্রাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্প পরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে, এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংস্কারকে উপেক্ষা করেছে। তাকে আমার ভাল লাগল। বললুম: ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী?

মিত্রা বলল: তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়োনির দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি খানিকটা পেয়েছিলুম। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তাই সে দিন প্রতিবাদ করি নি।

আর এক দিন চাওলার কাছে শুনেছিলুম মিত্রার কথা। বলেছিল: প্রেমে পড়ে প্রথমে আমি ভাবতুম, সামান্য মেয়ে সে নয়, সে অসামান্যা।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম: এখন কি তোমার মত বদলেছে?

কেন বদলাবে না! চোখে তো আর রঙীন ঠুলি নেই। মোহ ভাঙতেই খাঁটি রূপটা দেখতে পেয়েছি।

তবু তো তাকে ভালবাস!

ভালবাসা বলতে তুমি কী বোঝ জানি না। কিন্তু আমি যা বুঝি মিত্রা তা স্বীকার করে না। আমি ভালবাসতে চাই একটি মেয়েকে। কিন্তু যাকে ভালবাসব তাকে চাই আমার সমস্ত অধিকারের মধ্যে। ছুনিয়ার আর কেউ তার ওপর কোন দাবি রাখতে পারবে না।

বললুম: সাবাস! এই তো পুরুষের ভালবাসা। আদিম যুগ থেকে আজও পর্যন্ত একেই তো আমরা শ্রদ্ধা করে আসছি।

কিন্তু তুমি শ্রদ্ধা করলে কী হবে! যে শ্রদ্ধা করলে আমার জীবনটা সার্থক হত, সে তো অন্য কথা বলে। সে মেয়ে ভাবে যে ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে ভালবেসেও কুমারী থাকা চলে। বন্ধুকেও তো লোকে ভালবাসে!

সত্যি তো, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কি শুধু স্বামী স্ত্রীর!

চাওলা বোধ হয় চটে উঠল, বলল: এ সব তত্ত্ব কথা বলতে বেশ লাগে। যে ভোগে, সেই বোঝে। আমিও তো রইলুম, দেখব, এ সব কথা তোমার কত দিন ভাল লাগে।

পরে এক দিন স্বীকার করেছিল: মিত্রার আশা আমি আজও ছাড়ি নি।

অনেক দিন পরে আবু পাহাড়ে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছুজনে বেড়াতে এসেছিল। তার পর তাদের খবর আর জানি নে।

মনোরঞ্জন বলল: তুমি কি চাওলার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?

ভৃগুর সাক্ষাৎ পেলে কারও পদাঙ্ক অনুসরণের দরকার থাকবে না।

মনোরঞ্জন চিন্তিত হল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

আমি জানি, মিত্রা ও চাওলার বিবাদ এক দিন মিটে যাবে। মিটবেই। তাদেব বিবাদে কোন সামাজিক বর্ণভেদ নেই, প্রভেদ শুধু মতের। একটা কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করে মনেব মিলকে তারা দূরে ঠেলে রাখছে। মিত্রাব পিতা মিস্টাব ব্যানার্জি কোন দিন তাদের বিবাহেব অন্তরায় হতে পারবেন না। তাঁর কঠিনতম আপত্তি উপেক্ষা করে মিত্রা চাওলাকে বিবাহ করতে পারে, মিত্রার চরিত্রে সেই বলিষ্ঠতা আছে। মিস্টাব ব্যানার্জি যে এ বিবাহে রাজী হতে পাববেন না, তা তারা দুজনেই জানে। পরীক্ষায় চাওলা তাঁর কাছে ফেল হয়ে গেছে। এ গল্প আমি চাওলার মুখেই শুনেছি।

এক দিন বলেছিল: এই ধর না আমাব কথা। কেউ বলে, আমার লাখ নয় কোটি টাকার কারবার, থাকি এমন নেংটে সেজে। আবার এক দল বলে যে সবটুকুই আমার চাল, আসলে সব গড়ের মাঠ। প্রেমেব ব্যাপারেও আমি কাঁচা ছিলুম।

বলে সংক্ষেপে গল্পটা বলল: মিস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হবার পব হঠাৎ এক দিন মনে হল, মেয়েটা আমায় ভালবাসে। মনে হতেই নিজেকে হিবো বানিয়ে তুললুম। ঝোঁকের মাথায় একখানা গাড়িও কিনে ফেললুম। কিন্তু হলে হবে কী। ঝানু আই. সি. এস. আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঝপ করে এক দিন পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় জরুরী, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধার কর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পাবতুম না, কিন্তু পিছিয়ে এলুম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব! পরে জানতে পেরেছিলুম, বুড়ো আমাব ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন এমনি করে।

হাসতে হাসতেই চাওলা যোগ করেছিল: বুড়োর ধারণা,

পয়সাওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা বার করবেই, আর ধার কর্জ করে দিলে প্রেমটা খাঁটি বুঝবে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : মেয়ে কী বলে?

চাওলা চমকে উঠে বলেছিল : তার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। তবে বিয়ে করতে রাজী হলে বুঝব, খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যা বলবে না।

চাওলার দু চোখে যে শ্রদ্ধার আভাস দেখেছিলুম, তাও মনে পড়ল।

স্বাতির সম্বন্ধেও কি আমার এমনই শ্রদ্ধা আছে! আমিও কি তাকে খাঁটি জিনিস ভাবি! তবে সে কেন জো রায়ের মতো একটা অপদার্থকে বিয়ে করতে রাজী হল! ভৃগুর জন্য যদি দিল্লী যাই তো স্বাতিকে এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।

২২

আমার পাশে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে টাইম টেবল দেখছিলেন। তাঁর দেখা শেষ হতেই আমি বললুম: আমি একবার দেখতে পারি?

আমি ইংরেজীতে বলেছিলুম, তিনিও ইংরেজীতে উত্তর দিলেন: ও, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক প্রবীণ, পুরু কাচের চশমাখানি সরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর টাইম টেবলখানি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: এই লাইনের জন্যে ষোল নম্বর টেবল দেখুন।

ভদ্রলোকের কথার ভিতর একটা আন্তরিকতার সুর শুনলুম। এ যুগে কিছু চাইলেই লোকে বিরক্ত হয়, শুধু চাঁদা বা সাহায্য নয়, দেশলাই বা টাইম টেবল চাইলেও। ফেলে দেওয়া খবরের কাগজখানা কুড়িয়ে পড়তে গেলেও লোকে অবজ্ঞার চোখে তাকায়। ধন্যবাদ দিয়ে টাইম টেবলটি নেবার সময় তাঁর অন্য পাশে আরও কয়েকখানি বই দেখলুম। উপরের বইখানা মলাট দেওয়া বলে তার নাম পড়তে পারলুম না।

ষোল নম্বর টেবল ফৈজাবাদ লুপের। মোগলসরাই থেকে দুটো লাইন পশ্চিমে গেছে। একটা মির্জাপুরের উপর দিয়ে এলাহাবাদ-দিল্লীর দিকে, আর একটা বারাণসী পর্যন্ত এসে আবার দু ভাগ হয়েছে। একটা লাইন জঙ্ঘাই হয়ে লক্ষ্ণৌ গেছে, আর এক লাইন লক্ষ্ণৌ পৌঁছচ্ছে ফৈজাবাদ হয়ে। ও লাইনে বড় স্টেশন প্রতাপগড় ও রায়বেরেলি, এ লাইনে জাফরাবাদ জৌনপুর অযোধ্যা ফৈজাবাদ বরাবাঁকি। এলাহাবাদ থেকে জঙ্ঘাই হয়ে জৌনপুরে ট্রেন আসে। আবার প্রতাপগড় হয়েও ফৈজাবাদে ট্রেন

যায়। এলাহাবাদ থেকে রায়বেরেলি বা লক্ষ্ণৌ যাবারও সোজা রাস্তা আছে।

এ অঞ্চলে ছোট লাইনের ট্রেনও প্রায় সর্বত্র আছে। ছাপরা থেকে বারাণসী এলাহাবাদ, কাটিহার থেকে লক্ষ্ণৌ কানপুর আগ্রা। লক্ষ্ণৌ বেরেলি মোরাদাবাদ দিল্লী, কোথায় নেই। পাঞ্জাবের মতো উত্তর প্রদেশেও রেলগাড়ির অভাব নেই।

মোটামুটি সময়গুলো আমি দেখে নিলুম। বেলা প্রায় সোয়া বারোটায় জৌনপুর। স্টেশনে খাবার ব্যবস্থা আছে। অযোধ্যা বেলা তিনটেয়, তার পাশেই রৌডগঞ্জ বা ফৈজাবাদ সিটি। ফৈজাবাদ জংশন পরের স্টেশন। এ সমস্তই চার মাইলের মধ্যে। ফৈজাবাদ বড় স্টেশন। আমিষ নিরামিষ খাদ্য ও চায়ের দোকান আছে। বরাবাঁকি সাড়ে পাঁচটায়, এবং সাড়ে ছটায় লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ-এ আমাদের ট্রেন চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে। তারপর সাড়ে আটটায় বালামৌ, নৈমিষারণ্য এখান থেকে শাখা লাইনে ষোল মাইল। রাত নটায় হর্দৈতে খাবার ব্যবস্থা আছে, শাজাহানপুরেও ব্যবস্থা আছে সাড়ে দশটায়। তার পর ঘুম। বেরেলি আর মোরাদাবাদ ঘুমিয়ে কাটবে। হিমালয়ের পাদদেশে কোটদ্বার যেতে হলে নাজিবাবাদ নামতে হবে ভোর সাড়ে চারটের পর। সাড়ে পাঁচটার পর লক্সর জংসন। পাঞ্জাব মেল রুড়কি সাহারানপুর আম্বালা লুধিয়ানা জলন্ধরের উপর দিয়ে অমৃতসর যায়, আমাদের ট্রেন লক্সর থেকে উত্তরে হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন যাবে।

নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়া একই অঞ্চলের তিনটি সুন্দর শৈলাবাস। লক্ষ্ণৌ ও বেরেলি থেকে ছোট লাইনের গাড়ি কাঠগোদাম যায়। সেখান থেকে মোটরে উঠতে হয়। মানস সরোবর ও কৈলাসের পথ আলমোড়া থেকে। কোটদ্বার থেকে কেদার-বদরী যাবার একটি পথ আছে। হরিদ্বার হৃষীকেশ থেকে যে পথ গেছে, সেই পথ মিলেছে শ্রীনগরে। এ শ্রীনগর কাশ্মীরের

শ্রীনগর নয়। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও এই সব পথের সঙ্গে যুক্ত। বদরীনারায়ণের পথ থেকেও মানস সরোবর ও কৈলাসে যাওয়া যায়। মসুরি একটি সুন্দর শৈলাবাস। দেরাদুন থেকে মোটরে যেতে হয়। এই অঞ্চলে চক্রাতায় আছে একটি সেনানিবাস।

আমরা সোজা হরিদ্বারে গিয়ে নামব। নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়া আমাদের দেখা হবে না। হরিদ্বারেও আমরা বেশি দিন থাকব না। কাজেই হিমালয় দেখার সুযোগই আমাদের হবে না। হাতে প্রচুর পয়সা আর অপর্যাপ্ত সময় থাকলে কেদার-বদরী কিংবা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী বেড়ানো যেত। রাজনৈতিক কারণে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শনের আর উপায় নেই।

আমি যখন টাইম টেবলটি বন্ধ করে ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিলুম, তিনি অন্য একখানা বই দেখছিলেন। চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কত দূর যাচ্ছেন?

সংক্ষেপে বললুম: হরিদ্বার।

তীর্থ দর্শনে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যা দেখবেন না?

হাতে সময় থাকলে নিশ্চয়ই দেখতুম।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ভাল করে কিছু দেখলেন ও বোঝবার চেষ্টা করলেন। তার পর বললেন: সম্ভব হলে হরিদ্বারে এক দিন কম থেকে ফেরার পথে অযোধ্যা দেখে যাবেন।

আমি এ উপদেশের সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করলুম না। বললুম: দেখবার বুঝি অনেক কিছু আছে?

সে কথা বলবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার।

লজ্জিত ভাবে আমি নিজের পরিচয় দিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: আমার নাম শর্মা। লক্ষ্ণৌ-এর একটা কলেজে আমি প্রাচীন ইতিহাস পড়াই। কিছু মনে করবেন না, লেখাপড়ায় আপনার কী রকম অনুরাগ?

বললুম: এই অনুরাগের জন্যেই আমার কিছু হল না।

ঠিক এই মুহূর্তে মনোরঞ্জন একটা হাই তুলে চোখ বুঁজল।

আমার মনে হল, ভদ্রলোক ইতিহাসের অধ্যাপক না হলেই যেন ভাল হত। ইতিহাস জানা লোকের সঙ্গেই আমার বেশি সাক্ষাৎ হয় বলে একটা বদনাম আছে। সত্য কথা বললে লোকে সন্দেহ করবেন, আর বিশ্বাস করাতে হলে আমাকে মিথ্যা বলতে হবে। মিথ্যা কথাই আজকাল মানুষের সহজে বিশ্বাস হয়।

রাজস্থান ভ্রমণের সময় এক ভদ্রলোকের আমি পুরো নাম লিখে দিয়েছিলুম। তার পরিণামের জন্য আমি লজ্জিত। বাংলা দেশ থেকে যাঁরা রাজস্থানে যান সেই বই হাতে নিয়ে, তাঁরা সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করেই তৃপ্ত হন না, তাঁর অতিথি হয়ে থাকেন। অতিথিবৎসল সজ্জন মানুষ বলেই এই অত্যাচার তিনি সানন্দে স্বীকার করেন। সেই থেকে যাঁদের বিপদে ফেলবার ইচ্ছা নেই, তাঁদের পুরো নাম আমি লিখি না। যেমন, প্রফেসর শর্মার কলেজের নামটা আমি গোপন করছি।

প্রফেসর শর্মা বললেন: ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে পৌরাণিক গ্রন্থগুলি আমাদের ভাল করে পড়া উচিত। পুরাণকে অস্বীকার করে ভারতের ইতিহাস রচনার চেষ্টা কতকটা হাস্যকর বলে আমার কাছে মনে হয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালুম তাঁর মুখের দিকে।

ভদ্রলোক বললেন: অযোধ্যা নাম আজও আছে, মুছে যেতেও পারত। মুসলমান আমলে অযোধ্যার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ফৈজাবাদ শহর, তারা ইচ্ছা করলে অযোধ্যাকেই ফৈজাবাদ বলতে পারত। যেমন কাশীর নাম দিয়েছিল মুহম্মদাবাদ। হিন্দুদের ভাগ্য

যে এক বাদশাহ গাদতে বসে মুহম্মদাবাদ নামটাই তুলে দিয়েছিলেন। অযোধ্যা এখন একটি পুরনো শহরের নাম, মুসলমান আমলে একটি রাজ্যের নাম ছিল। কিন্তু পুরাণে আমরা অযোধ্যা নাম দেখি একটি সমৃদ্ধ নগরের। এই নগর ছিল কোশল রাজ্যের রাজধানী। পৌরাণিক ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠান্বিত রাজ্য হল কোশল। সূর্যের পুত্র মনু এই রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন অযোধ্যায়। বেদের ব্রাহ্মণে আমরা কোশল নাম পাই আর তার সীমানা দেখি শতপথ ব্রাহ্মণে। সদানীরা নদীর এক পারে কোশল, ও অন্য পারে বিদেহ রাজ্য। পণ্ডিতরা মনে করেন যে গণ্ডক নদীর নামই ছিল সদানীরা। গণ্ডক নদীর নাম শুনেছেন তো?

বললুম: শুনেছি। পাটনার নিকটে গঙ্গায় এসে মিলেছে।

তাহলেই বুঝতেই পারছেন সে যুগে কোশল রাজ্য ছিল পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত। তার পূর্বে বিদেহ। আধুনিক মানচিত্র থেকে এই দুটি নামই লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের গৌরবময় ইতিহাস যায় নি মুছে। আজও আমরা কোশল নাম জানি, আজও মানি বিদেহের বিদ্যানুরাগের খ্যাতি। কাশীরাজ্য কখনও কোশলের অধীন ছিল বলেই মনে হয়। রামায়ণে রাজা দশরথ ও রাণী কৈকেয়ীর কথোপকথন থেকে এই ধারণাই হয় যে তাঁদের সময়ে কাশীর রাজারা কোশলের অধীনতা স্বীকার করতেন। আরও কত রাজ্য তাঁদের অধীনে ছিল তার সঠিক হিসাব করা এখন কঠিন। তবে রামের মৃত্যুর পরে তাঁদের চার ভাই-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাজ্যবিভাগ দেখে খানিকটা অনুমান করা যায়। জানেন তো সেই কথা?

আমি বললুম: না।

প্রফেসর শর্মা বললেন: রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন—এঁদের প্রত্যেকেরই দুটি করে পুত্রের নাম পাই। মহাকোশল রাজ্য

এই আটজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। লবের রাজ্য উত্তর কোশল, রাজধানী শ্রাবস্তী। কোশল বা দক্ষিণ কোশল হল কুশের রাজ্য, রাজধানী কুশবতী বা কুশস্থলী। ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র তক্ষ গেলেন তক্ষশীলায়। কনিষ্ঠ পুষ্কর গেলেন পুষ্পাবর্ত বা পুষ্করাবতীতে। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদ অঙ্গদীয়ায়। কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু চন্দ্রকান্তায়। শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরসেন বিদিশায় ও কনিষ্ঠ পুত্র সুবাহু মধুরায় রাজধানী স্থাপন করলেন।

কৌতূহলী হয়ে আমি বললুম: এসব স্থান কোথায় ছিল, তার পরিচয় কি পাওয়া যায় না?

আমাদের প্রশ্নে খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন: চেষ্টা করলে কেন পাওয়া যাবে না! পুরাণেই তার হদিশ আছে। শ্রাবস্তী অযোধ্যারই উত্তর-পশ্চিমে, আর কুশবতী নগরী ছিল বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে। এসবও প্রাচীন নগর। বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় যে যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী নির্মাণ করেন, আর আনর্তের পুত্র রেবত বাস করতেন কুশস্থলী পুরীতে, শর্যাতি তাঁর পিতামহ ছিলেন। পুণ্যজন নামে রাক্ষসরা এই নগর ধ্বংস করে। পরবর্তী কালে কুশস্থলীরই নাম হয়েছিল দ্বারকা পুরী। রেবতের পৌত্রী রেবতীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের। রামায়ণে কুশস্থলী নাম নেই, আছে কুশাবতী নাম। এই শহর মধ্য ভারতের চান্দা নাগপুর বা অন্ধ্রের অমরাবতী কিনা, তাও গবেষণার বিষয়। অনেকে বলেন যে কুশ অযোধ্যাতেই রাজত্ব করেছিলেন।

ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর গন্ধর্ব দেশটি দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। ভরতের মাতুল কেকয়রাজ যুধাজিৎ মহর্ষি গার্গ্যকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্রের কাছে। ভরত একবার মাতুলালয়ে গিয়েছিলেন, সেই ভ্রমণের সূত্র ধরে কেকয় রাজ্যের অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। বর্তমান কাশ্মীর বা নিকটবর্তী কোন স্থানে

এই কেকয় রাজ্য ছিল। যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে বলেছিলেন গন্ধর্ব দেশ জয় করবার কথা। সিন্ধুর দুই তীরে অবস্থিত এই গন্ধর্ব দেশ গান্ধার বা কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রামচন্দ্র ভরতকে পাঠিয়ে এই রাজ্য জয় করেছিলেন, আর ভরতেরই দুই পুত্র এই রাজ্যটিকে ভাগ করে নেন। তক্ষ তক্ষশীলায় ও পুষ্কর পুষ্করাবর্তে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তক্ষশীলা এখন পাঞ্জাবে, আর পুষ্করাবর্ত বা পলাশপুর পুরুষপুর বা পেশোয়ার কিনা, তাও গবেষণার বিষয়।

লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদের রাজ্য হয়েছিল কারুপদ দেশ, রাজধানী স্থাপন করেছিলেন অঙ্গদীয়ায়। চন্দ্রকেতু মল্ল দেশের রাজা হয়েছিলেন, তাঁর রাজধানীর নাম হয়েছিল চন্দ্রকান্ত চন্দ্রবক্ত্রা বা চন্দ্রদ্যুতি। শত্রুঘ্নের পুত্র শূরসেনের রাজধানী বিদিশা আজও অনেকের মনে আছে। মহাকবি কালিদাস এই নামটি অমর করেছেন। তা না হলে বর্তমান ভিল্‌সায় দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। শত্রুঘ্নের অপর পুত্র সুবাহুর রাজধানী মথুরা বর্তমানের মথুরা না মাদুরা তা জানবার উপায় নেই। দক্ষিণ ভারতের মাদুরাও হতে পারে। তার কারণ দাক্ষিণাত্য ও দ্রাবিড় দেশও দশরথের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সিন্ধু সৌরাষ্ট্র সৌবীর, অঙ্গ বঙ্গ মৎস্য ও মগধ—এসব রাজ্যও কোশলের অধীনে ছিল, কিংবা ছিল মিত্ররাজ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র সমগ্র ভারতে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফেসর শর্মা বললেন: রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা!

কোথায় আজ রঘুপতি, তাঁর রাজ্য কোশলই বা কোথায়!

আমি বললুম: কোশল না থাক, অযোধ্যা তো আছে। আর রাম নামও ভারতবাসী কোনদিন ভুলবে না।

ভদ্রলোক বললেন: তা ঠিক। কিন্তু আজ আমরা যে অযোধ্যা

দেখছি, তা কি সেই অযোধ্যা! রামচন্দ্রের পরেই তো অযোধ্যা পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়।

কেন?

তা জানিনে। রামচন্দ্রের পুত্র লব তো অযোধ্যায় বসে রাজত্ব করেন নি, তিনি শ্রাবস্তীপুরে সরে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, সে কথা কোথাও পাইনি। তবে কুশ অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন মেনে নিলে এ সমস্যা মিটে যায়।

একটু থামলেন প্রফেসর শর্মা, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: প্রাচীন অযোধ্যার সমৃদ্ধির পরিচয় আপনার জানা আছে তো?

কোন দ্বিধা না করে বললুম: না।

রামরাজ্যের চিত্র আছে পদ্মপুরাণে। পুরাণকার লিখেছেন যে শস্যক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত শস্য ও গবাদির প্রচুর খাদ্য সারা বছর পাওয়া যেত। দেশের স্বাস্থ্য সবল ছিল। গ্রামে গ্রামে দেবালয় ছিল, ছিল ফুল ও ফলের উদ্যান। কারও কোনও অভাব ছিল না। ধর্মানুরাগী প্রজারা পরিবার ও পরিজন নিয়ে সুখে জীবন যাপন করত।

হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনি সংস্কৃত জানেন?

বললুম: অল্প অল্প।

শব্দগুলি সুন্দর বলে আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে।

সপদ্মিনীককাসারা যত্র রাজন্তি ভূময়ঃ।
সদম্ভা নিম্নগা যত্র ন যত্র জনতা ক্বচিৎ॥
কুলাস্বেব কুলীনানি বর্ণানাং ন ধনানি চ।
বিভ্রমো যত্র নারীষু ন বিদ্বৎসু চ কর্হিচিৎ॥
নদ্যঃ কুটিলগামিন্যো ন যত্র বিষয়ে প্রজাঃ।
তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেষু ন মানবাঃ॥
রজোযুজঃ স্ত্রিয়ো যত্র ন ধর্মবহুলা নরাঃ।
ধনৈরনন্ধো যত্রাস্তি জনো নৈব চ ভোজনম্॥

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : মানে বুঝেছেন ?

একে সংস্কৃত, তায় অবাঙালী উচ্চারণ। নির্বিবাদে স্বীকার করলুম : বুঝি নি।

ভদ্রলোক মিলিয়ে মিলিয়ে আমাকে মানে বলে দিলেন।—যত সরোবর, তত পদ্ম। সদম্ভে নদী বইত, কিন্তু মানুষের কোন দম্ভ ছিল না। বংশে লোক কুলীন ছিল, কিন্তু তাদের ধন চোরের ভয়ে ভূগর্ভে কুলীন ছিল না। বিভ্রম ছিল নারীদের বিলাসে, পণ্ডিতের কোন বিভ্রম ছিল না। কুটিলগামী ছিল দেশের নদী, প্রজারা নয়। আর কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি ছিল তমোযুক্ত, মানুষ নয়। রজোযুক্ত হত রমণী, ধার্মিক মানুষের কোন রাজসিক ভাব ছিল না। মানুষ ধনে অনন্ধ ছিল, কিন্তু ভোজনে নয়। প্রথম অনন্ধের মানে অমত্ত, আর দ্বিতীয়টিব মানে অন্নহীন। ধনগৌরবে মানুষ মত্ত হ'ত না, অন্ন থাকত আহারে। অনন্ধ শব্দটিব আজকাল ব্যবহাব নেই বলেই এই শ্লোকটির সৌন্দর্য ধরা পড়ে না।

অযোধ্যার বর্ণনা আছে রামায়ণের আদি কাণ্ডে। প্রশস্ত রাজপথে এক কণা ধূলো থাকত না. ভিজে পথের দু ধারে ফুটে থাকত নানা রঙের ফুল। কত সৌধ, কত উদ্যান, কত আম্রকানন, অস্ত্রাগারও কত। নগরের চারি দিকে শাল গাছের মেখলা, বাহিরে জলদুর্গম পরিখা। নানা দেশ থেকে বণিক আসত বাণিজ্যে, করদ রাজারাও আসতেন। তাঁদের জন্য স্থানে স্থানে সীমন্তিনীদের নাট্যশালা।

প্রফেসর শর্মা একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ পড়েছেন।

এই মানুষটির কাছে নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হচ্ছিল না। বললুম : তাকে পড়া বলে না।

প্রফেসর শর্মা বললেন : এইটিই আমাদের দোষ। দক্ষিণ

ভারতীয়রা ভাবেন, কাম্বারামায়ণের চেয়ে উৎকৃষ্ট আব কিছু নেই, আমরা ভাবি তুলসীদাসের রামচরিতমানসই রামায়ণের শেষ কথা।

আমি বললুম : আমরা কৃত্তিবাসের রামাযণ পড়ি।

কিন্তু কোনটাই মূল রামায়ণের অনুবাদ নয়। কবিরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যা লিখেছেন তা অপূর্ব হলেও মূল গ্রন্থের আস্বাদ তাতে পুরোপুরি মিলতে পারে না। মূল রামায়ণ ও মহাভারত প্রত্যেক ভারতীয়ের সযত্নে পড়া উচিত। আমার মনে হয় যে এই গ্রন্থ না পড়া পর্যন্ত ভারতীয়ের শিক্ষা দীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

প্রফেসর শর্মার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এখন আর তাঁকে একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এখন তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। কিন্তু তিনি থেমে পড়তেই আমি বিস্মিত হলুম।

খানিক ক্ষণ নীরব থেকে বললেন : কিছু মনে কববেন না, এ আমার একটা পাগলামি। পবিণত বয়সে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায আমি এই বিরাট কাব্য দুখানি পড়েছি। শুধু আনন্দই পাই নি, আমার মনে হয়েছিল যে এত দিন আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল। শিক্ষায় সভ্যতায় যুদ্ধে ও রাজনীতিতে ভারত কত উন্নত ছিল, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আমার ছিল না। আজ আমরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার দেখে বিস্মিত হচ্ছি, কিন্তু সে যুগে এর কোন্‌টা ছিল না!

লোকে বলে রামের জন্মের ষাট হাজার বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। কিন্তু রামায়ণে আমরা অন্য কথা দেখি।—

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

রামচন্দ্রের রাজত্ব লাভের পরেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

রামায়ণেই আছে যে নারদ সত্তরটি শ্লোকে বাল্মীকিকে রামচরিত শুনিয়েছিলেন। আর বাল্মীকি রামায়ণ রচনার পরে লবকুশকে সপ্ত সুরে সকল রস সংযোগে সেই গান গাইতে শিখিয়েছিলেন।

প্রফেসর শর্মা বললেন: গোপালবাবু, আপনি ভাল করে রামায়ণ পড়ুন। দেখবেন যে আমাদের দেশের সাহিত্য এই রামায়ণকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। বাল্মীকি রামায়ণের পর আপনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়ুন। তাতে রামায়ণের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ রূপ পাবেন। তারপর পড়ুন অদ্ভুত রামায়ণ। এর পরে বেদব্যাসের নানা পুরাণে রামায়ণের কাহিনী, পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অধ্যাত্ম রামায়ণ। কালিদাসের রঘুবংশ পড়ুন, ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য। পদ্মপুরাণে রামায়ণ আধুনিক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। রাবণ বধের পর আরম্ভ, এবং পূর্বের ঘটনা ডায়েরির মতো দিন ক্ষণ দিয়ে লেখা। রামচন্দ্র ও সীতার বয়সের হিসেব শুনেও কৌতুক বোধ করবেন। রাম যখন জনক রাজার গৃহে হরধনু ভঙ্গ করেন তখন তাঁর বয়স পনর বছর। সীতা তাঁর চেয়ে ন বছরের ছোট, তাঁর বয়স ছ বছর। বিবাহের পর বারো বছর তাঁরা অযোধ্যায় সুখে বাস করেছিলেন। বন গমনের সময় রামের বয়স সাতাশ ও সীতা আঠারো বছরের তরুণী। তের বছর বনবাসের পর রাবণ সীতাহরণ করেন মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর বিন্দু মুহূর্তে। সীতার বয়স তখন একত্রিশ। দশ মাস পরে সীতার সন্ধান পাওয়া যায় জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতির কাছে। সে দিন ছিল অগ্রহায়ণের শুক্লা নবমী। লঙ্কায় গিয়ে হনুমান সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবার পরে অষ্টমীর বিজয় মুহূর্তে রামচন্দ্র যুদ্ধযাত্রা করেন। অমাবস্যা পর্যন্ত তাঁরা সমুদ্র তীরে শিবিরে বাস করেন। পৌষ মাসের শুক্লা দশমী থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত সেতুবন্ধ হয়, তার পর দ্বিতীয়া পর্যন্ত সৈন্যদের সমুদ্র অতিক্রম। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়াতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, চৈত্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে

রাবণ বধের পর সাতাশি দিনের দিন সেই যুদ্ধ শেষ হয়। প্রত্যেকটি ঘটনার তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন।

সত্যই আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। বললুম: আপনার স্মৃতি শক্তির তুলনা নেই।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: ইতিহাসের সন তারিখ পড়াতে পড়াতে মুখস্থ হয়ে গেছে, এও তেমনি। দু চার বার আওড়ালে আপনারও মুখস্থ হয়ে যাবে।

আমি বললুম: রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, রামায়ণ আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ নয়, মহাভারতের তুলনায় তা আধুনিক।

প্রফেসর শর্মা বললেন: এটি বিদেশী মত। তাঁরা বলেন, সভ্যতার বিকাশের যে ধারা আছে তা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে রামায়ণের যুগের সভ্যতা উন্নততর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সমাজের যে অবস্থা দেখা যায়, তা অপেক্ষাকৃত আদিম। রামায়ণের কাল অনেক সভ্যতর। কাজেই মহাভারতই প্রাচীনতম গ্রন্থ। যদি তাই হত, তাহলে রামায়ণে মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যেত, মহাভারতে ও পুরাণে রামায়ণের উল্লেখ থাকত না।

আর একটা আপত্তি আছে হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাসে। সত্য যুগে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। দেবতা ও ঋষিরা তখন এ দেশে বাস করতেন। বেদের জন্ম হয়েছিল, দর্শন ও অধ্যাত্ম সাধনায় দেশে তখন চরম উৎকর্ষের দিন। তার পর ত্রেতা, দ্বাপর। মানুষের মান নেমে নেমে কলিতে অবনতির শেষ ধাপে নেমেছে। এর পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনিই বলুন, পৃথিবী ধ্বংস হবার কি কিছু বাকি আছে?

বললুম: সত্যি কথা। কিন্তু এই ধ্বংস হবার ধারণাকে আমি

মানি না। আমার মনে হয় না যে প্রলয় হয়ে পৃথিবীর রূপ পালটাবে।

তবে?

আমার ধারণা শুনে আপনি হয়তো হাসবেন। আমার মনে হয় যে ধ্বংসের দিকে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে মানুষ থমকে দাঁড়াবে। ভাববে, এবারে কোন্ দিকে যাই। তার পর উল্‌টো দিকে ফিরে আবার হাঁটতে শুরু করবে। কলির পর দ্বাপর ত্রেতা, তার পর সত্য যুগ ফিরে আসবে।

প্রফেসর শর্মা আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। বললেন: মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি ভাবেন?

ভয়ে ভয়ে বললুম: একটু ধৃষ্টতার কাজও করেছি।

কী?

এ বিষয়ে আমি একটা থিসিস দাখিল করে এসেছি। ডক্টরেট না পেলেও আমার কোন দুঃখ হবে না।

কেন?

আমার ধারণা হয়তো ভুল, কিন্তু কারও কাছে ধার করা নয়। এই পুরনো পৃথিবীতে নতুন কথা বলার চেষ্টা কেউ করেন না। আমি বলেছি যে নতুন কথা ভাববার সময় আমাদের এসেছে, তার সুযোগ নিলে সাহিত্যই সমৃদ্ধ হবে না, সমাজও রক্ষা পাবে।

ভদ্রলোক অনেক ক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন: খাঁটি কথা।

আমি বললুম: এইবার অযোধ্যার কথা কিছু বলুন।

এ কথার উত্তর না দিয়ে প্রফেসর শর্মা বললেন: আপনি কি সাহিত্যের ছাত্র?

বললুম: আজ্ঞে।

তবে কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন না কেন?

আমি সত্যি কথাই বললুম : পাশ করে বেরিয়ে কোন সুযোগ পাই নি ।.

এখন যদি সুযোগ পান—ধরুন লক্ষ্ণৌ-এ ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভদ্রলোক আমার নাম ঠিকানা তাঁর নোট বুকে টু'কে নিলেন, বললেন : চিঠি দেব।

আমি বললুম : এইবারে বলুন।

ভদ্রলোক তাঁর নোট বুক বন্ধ করে বললেন : আমাদের শাস্ত্রে সাতটি পুরী মোক্ষদায়িকা নামে পরিচিত, তাদের প্রথম হল অযোধ্যা।—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

মায়া হল হরিদ্বার আর অবন্তিকা উজ্জয়িনীর নাম। যুদ্ধে অজেয় বলে নগরের নাম হয়েছিল অযোধ্যা। ব্রহ্মার প্রপৌত্র সূর্য। তাঁর পুত্র মনু এই অযোধ্যার পত্তন করেছিলেন। এই সূর্য বংশের তেত্রিশ পুরুষ পরে রাম। ব্রহ্মাকে এক নম্বর ধরলে রাম সাঁইত্রিশ নম্বরে। এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করেছেন মান্ধাতা ভরত সগর নহুষ প্রভৃতি রাজারা। এ রামায়ণের হিসাব। বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য ও রামের মধ্যে আছেন পঁয়ষট্টি জন। হরিশ্চন্দ্র ভগীরথ প্রভৃতি রাজাও আছেন।

প্রফেসর শর্মা একটুখানি থেমে বললেন : বৈদিক ও পৌরাণিক উপাদান থেকে বিদেশী পণ্ডিতেরা যে কাল নির্ণয় করেছেন, তা বোধহয় জানেন ?

আমি স্বীকার করলুম : জানিনে।

ভদ্রলোক বোধহয় এই রকমেরই উত্তর আশা করেছিলেন। বললেন : মনুকে তাঁরা বলেন খ্রীষ্টের জন্মের একত্রিশ শো বছর আগের মানুষ। আমরা প্রাচীনকাল বলতে যে মান্ধাতার আমল বলি, তা ২৭৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। রাম রাজত্ব করেছেন খ্রীষ্টের জন্মের

প্রায় দুহাজার বছর আগে। বিশ্বামিত্রকে আমরা হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করতে দেখি ২৫৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। আবার রামের শৈশবেও দেখি। তখন তাঁর বয়স প্রায় পাঁচশো বছর। এই পণ্ডিতদের মতেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের চোদ্দ শো বছর আগে। তার মানে লঙ্কার যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যবধান প্রায় পাঁচশো বছর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অযোধ্যার রাজা ছিলেন বৃহদ্বাহু। তিনিও সূর্য বংশের রাজা। অভিমন্যু তাঁকে বধ করেছিলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে এই হিসাব শুনলুম। তারপরে সভয়ে বললুম: এসব সন তারিখ কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়?

প্রফেসর শর্মা বললেন: বোধ হয় যায়। আবার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করাও যায়।

সে কেমন করে সম্ভব?

বর্তমান যুগের আয়ু নিয়ে বিদেশী পণ্ডিতরা হিসাব করেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে সে যুগে মানুষের আয়ু অনেক বেশি ছিল। তার পরে রামায়ণে সূর্যবংশের যত পুরুষ দেখি, অন্যান্য পুরাণে তার সংখ্যা দ্বিগুণ। আবার রাম ও বৃহদ্বাহুর মধ্যে তিরিশ পুরুষের ব্যবধান আছে বলে মনে করা হয়। তা মেনে নিলে এঁদের কালের ব্যবধান একহাজার বছরের কম হয় না।

আমি বললুম: তাহলেও তো একথা স্বীকার করতে হয় যে রাম রাজত্ব করেছেন চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে।

প্রফেসর শর্মা বললেন: অসম্ভব নয়।

একটু থেমে বললেন: মৎস্য পুরাণে একটি মজার কথা আছে। বুদ্ধেরও নাকি সূর্যবংশে জন্ম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর তিনি সূর্য বংশের পঞ্চবিংশতি পুরুষ।

মৎস্য পুরাণে এই কথা আছে?

আছে। বুদ্ধের কথায় শাক্য জাতি ও সাকেতের কথাও মনে পড়ে। পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন যে শাক্য জাতি সূর্য বংশেরই

একটি শাখা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চন্দ্রবংশের বীর অভিমন্যু সূর্যবংশের যে রাজাকে বধ করেন, তাঁর নাম বৃহদ্বাহু বা বৃহদ্বল। শাক্য নামে এক রাজা এঁরই উত্তর পুরুষ, বুদ্ধ তাঁর অষ্টম পুরুষ। বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল লুম্বিনিতে, বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে। কিন্তু বুদ্ধ বহুদিন অযোধ্যায় বাস করেছিলেন ও সেখানে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, এ সম্বন্ধেও অনেকে অনেক প্রমাণ পেশ করে থাকেন। শাক্য বংশের রাজধানী বলে অযোধ্যার তখন সাকেত নাম হয়েছে। আর চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও হিউএন চাঙ এই কারণেই এসেছিলেন সাকেত দর্শনে। অযোধ্যা নামের উল্লেখ নেই তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

আমি বললুম: সাকেত শ্রাবস্তীর নাম নয় তো।

প্রফেসর শর্মা বললেন: ও ভুল করবেন না। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম হল সাহেত-মাহেত। সেখানেও অনেক বৌদ্ধ নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ আছে। পুরাণে একটি শ্লোক আছে যে শাক্য বংশে সুমিত্র রাজা হবার পরে কলিযুগে সূর্য বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বোধহয় সত্যিই তাই হয়েছিল। রাজা সুমিত্র এই নগর পরিত্যাগ করে যাবার পর এই অঞ্চল অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। শোনা যায় যে শ্রাবস্তীর রাজারাও অযোধ্যায় রাজত্ব করেছেন, তারপর অশোকের অধিকার। রাজা বিক্রমজিৎ বা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যা জয় করেছিলেন কাশ্মীরের রাজা মেঘবাহনের কাছ থেকে। তাঁর মৃত্যুর পর সমুদ্রপাল-বংশীয়েরা এখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন।

অতীতে অযোধ্যা অনেকবার অরণ্যে পরিণত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে দেখি হিমালয়ের থারুরা জঙ্গল কেটে অযোধ্যায় চাষ-বাস করছে। সোমবংশের জৈন রাজারা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষে সোমবংশীয়দের তাড়ালেন কনৌজের রাজা চন্দ্রদেব। তারপর ভড় নামে এক অসভ্য জাতি

এসে অযোধ্যা অধিকার করল। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা লুঠ করেছিলেন শাহাবুদ্দিন ঘোরী। তার পরেই মুসলমান অধিকাব কায়েম হল। অযোধ্যার নবাবদের কথা আজকাল ইতিহাসে পড়ানো হয়। ইংরেজ আমলে অযোধ্যার বেগমদের উপবে অকথ্য অত্যাচারের দায়ে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসেব বিচার হয়েছিল বিলাতেব পার্লামেণ্টে।

ইতিহাসের এই ঘটনা আমি জানি। তাই বললুম: বর্তমান অযোধ্যার কথা কিছু বলবেন না?

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসতে প্রফেসর শর্মা কিছু সময় নিলেন। বললেন: পাণ্ডারা বলেন যে অযোধ্যায় এখন ছিয়ানব্বইটি মন্দিব আছে। তার মধ্যে বিষ্ণু মন্দিরের সংখ্যা তেষট্টি আর শিবেব মন্দির তেত্রিশ। শুনে আপনি বিস্মিত হবেন যে এই অযোধ্যা এখন সর্বধর্মেব তীর্থস্থান। এখানে মসজিদ আছে ছত্রিশটি, আব খ্রীষ্টানদের সমাধিস্থান একটি। তা বাইবেলে উক্ত নোয়ার কবর বলে কথিত। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার নাকি এই কবরটি নির্মাণ করান। তারপর বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির। হিউএন-চাঙ এখানে কুড়িটি বৌদ্ধ মন্দির দেখেছিলেন, আর জৈনদের আছে ছটি মন্দির। আদিনাথ অজিত অভিনন্দন সুমতি অনন্ত ও অচল—অযোধ্যা এই ছজন তীর্থঙ্করের জন্মভূমি। একটা কথা বললে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে আমি কৌতূহল নিয়ে তাকালুম। তিনি বললেন: জৈনদের একুশজন তীর্থঙ্কর নাকি ইক্ষ্বাকু বংশের। প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথও ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা নাভির পুত্র। ইক্ষ্বাকুর কথা আপনাকে বলিনি। তিনি ছিলেন মনুর পুত্র। সূর্যবংশ তাই ইক্ষ্বাকু বংশ বলেও পরিচিত। রামকে রঘুবংশের সন্তান বলা হয়, রঘুও ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা। শাক্য কথাটিও ইক্ষ্বাকু থেকে এসে থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস জানা দরকার। পুরাণে মনু একজন নন, চতুর্দশ মনু। পুরাণান্তরে তাঁদের ভিন্ন নাম। আমরা যে মনুর কথা বলছি, তিনি সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু। ব্রহ্মার পুত্র মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। এঁর দুই পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ধ্রুব তাঁর পৌত্র। মনুর জন্ম ও মানুষ সৃষ্টির কথা জানতে হলে আপনাব মাথা খারাপ হ:য়ে যাবে। তার চেয়ে আপনাকে অযোধ্যাব কথাই বলি।

অযোধ্যায় লোকে এখন বামকোট দেখে, রামচন্দ্রেব দুর্গ। জন্মস্থান রামসীতার স্থান ও স্বর্গদ্বাব দেখে। রামায়ণের অনেক মূর্তি আছে। দশরথ ও কৈকেয়ী, বিশ্বামিত্র, কনক সীতা, রাজবেশে হনুমান প্রভৃতি। এই সব মূর্তি শিল্পমণ্ডিত না হলেও ধর্মভাবের সহায়ক। লোকে মণি পর্বত সুগ্রীব পর্বত কুবের পর্বত দেখে, আর .দখে সবযূর ঘাটগুলো—রাম-লক্ষ্মণদের ঘাট, স্বর্গ ঘাট। সকল সম্প্রদায়ের মঠ আছে এখানে, বৈষ্ণবদেরই সাতটি মঠ আছে।

অযোধ্যার কথায় রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা স্মরণ না করে উপায় নেই। বৌদ্ধ অধিকাব বিলুপ্ত হবার পর প্রাচীন অযোধ্যার বিস্মৃত স্থানগুলি তিনিই সযত্নে উদ্ধার করেন। ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে বার করেন রামের জন্মস্থান। দশরথের দুর্গপ্রাসাদের নাম দেন বামকোট। মণি পর্বত হল গন্ধমাদনের অংশ। হনুমান যখন হিমালয় থেকে গন্ধমাদন পবত নিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছিলেন, ভরত তখন শবাঘাত কবে একাংশ নামিয়েছিলেন অযোধ্যায়। তিনশো বাটটি দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন বিক্রমাদিত্য। সমুদ্রপাল ও তাঁর বংশের রাজারা অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন বিক্রমাদিত্যের পরে। সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি।

বলে প্রফেসর শর্মা নীরব হলেন।

২৩

গল্পে গল্পে কত পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। মনোরঞ্জন সেই যে চোখ বুঁজেছিল আর খোলে নি। এখন তার নাক ডাকছে।

প্রফেসর শর্মা বোধ হয় ক্লান্ত হয়েছিলেন। জলের একটা বোতল বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিলুম। তিনি নিজের গলায় খানিকটা জল ঢেলে সেটা তুলে রাখলেন।

এই ভদ্রলোকের কাছে আমার অনেক কিছু জানবার আছে। শুধু লক্ষ্ণৌএর কথা নয়, সম্ভব হলে নৈনিতাল রাণীক্ষেত ও আলমোড়ার কথাও। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু জেনে নেবার ইচ্ছা হল। কিন্তু লজ্জা হল কোন প্রশ্ন করতে। ভদ্রলোক কী ভাববেন!

হঠাৎ আমার নাগপুরের দত্তর কথা মনে পড়ল। স্ত্রীর শখে সে ভদ্রলোক সারা ভারতবর্ষের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর থেকে কোডাইকানাল। উত্তর ভারতের সমস্ত পাহাড়ী শহরগুলো তাঁর নিশ্চয়ই দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যেত।

প্রফেসর শর্মা বললেন: কী ভাবছেন?

বললুম: পাহাড়ের কথা।

দত্তর কথাও তাঁকে বললুম। শুনে তিনি অনেক ক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন: অনেক দিন আগে ও অঞ্চল আমি ঘুরে এসেছি। কিছু জানবার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

বললুম : প্রশ্ন করতে হলে নিজের কিছু জানা দরকার। সে জ্ঞান আমার নেই। আপনার যা মনে আছে তাই বলুন।

আমার সঙ্গে একখানি সরকারী গাইড বই ছিল। তাতে পড়েছিলুম যে কলকাতা থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগোদাম যান ছোট লাইনের ট্রেনে। যাঁরা পশ্চিম দিক থেকে আসেন, তাঁরা আগ্রা কিংবা বেরিলিতে ছোট লাইনের ট্রেন ধরেন। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল মাত্র বাইশ মাইল। সুন্দর প্রশস্ত পথ, ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। যত দূর মনে পড়ছে সমুদ্রতল থেকে নৈনিতালের উচ্চতা ছ হাজার সাড়ে তিনশো ফুট।

দত্তর কথা আমার আবার মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন হিমালয়ের এ একটা রসিকতা। এ দেশে যত ভাল ভাল শহর, সব ছ হাজারের বেশি। তার পরে মুখে মুখে সব হিসাব দিয়েছিলেন। দার্জিলিঙ ছ হাজার আটশো, রাণীক্ষেত ছ হাজার, নৈনিতাল ছ হাজার তিনশো, মসুরি ছ হাজার পাঁচশো, ডালহাউসি ছ হাজার ছশো, সিমলা সাত হাজার দুশো।

আমি বলেছিলুম : আলমোড়ার উচ্চতা তো কম।

আলমোড়া কেন, শিলং কালিম্পং কার্সিয়াং এরা উচ্চতায় যেমন কম, গৌরবেও তেমনি নিচু।

হিমালয়ের এই গিরিশ্রেণীর সাধারণ নাম কুমায়ুন হিল্‌স্। সামনে এই শৈলাবাসগুলি, পিছনে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী। এই অংশের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে হল কতকগুলো স্বাভাবিক জলাশয়। চারি দিকে পাহাড় ঘেরা এই জলাশয়গুলোকে এ অঞ্চলের লোক তাল বলে। তাদের নামেই স্থানের নাম। যেমন, নৈনিতাল, খুরপাতাল, ভিমতাল, সাততাল, নৌকুচিয়াতাল, মালোয়াতাল। এই অঞ্চলে নাকি এই রকমের তাল গোটা ষাটেক আছে। নৈনিতাল নামের আরও একটু কৈফিয়ত আছে। লেকের ধারে আছে নয়না বা নয়নী দেবীর মন্দির। তাঁরই নামে তালের

নাম নৈনিতাল। এখানে আরও একটি মন্দির আছে। ঠিক উলটো দিকে পাষাণ দেবীর মন্দির। নৈনিতালের জল এইখানে প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর।

আমি এক গাইড বইয়েই পড়েছিলুম যে প্রায় সোয়াশো বছর আগে এক শ্যালক ও ভগিনীপতি এই অঞ্চলে শিকারে এসে এই সুন্দর স্থানটি আবিষ্কার করেছিলেন। মিস্টার ব্যাটেন ও মিস্টার ব্যারন। মিস্টার ব্যারন শাজাহানপুরে ব্যবসা করতেন, তিনি পিল্‌গ্রিম ছদ্মনামে আগ্রা আখবারে একটি প্রবন্ধ লিখে নৈনিতালের সৌন্দর্যের খবর এ দেশে প্রচার করেছিলেন।

প্রফেসর শর্মা বললেন: নৈনিতালে নেমে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

কেন?

কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল পৌঁছতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছিল। মোটর বাস এসে একেবারে লেকের ধারে দাঁড়াল। সামনেই বিস্তৃত জলাশয়, চারি ধারের পাহাড় ক্রমশ আকাশের দিকে উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের গায়ে শুধু নানা রকমের গাছ নয়, অনেক সুন্দর বাড়ি যেন ফুলের মতো ফুটে আছে। জলে তার ছায়া পড়েছে, বাতাসে দুলছে, আর দুলছে পাল-তোলা সব নৌকোগুলো। কত বিচিত্র সাজে নানা দেশের মেয়ে পুরুষ নৌকোয় বসে বিশ্রাম করছে, কেউ বা খেলা করছে।

যেখানে আমরা নামলাম সেই জায়গার নাম তল্লিতাল। শহরের নিচু অংশ, সস্তার বাজার হাট, সাধারণ লোকের বাস। লেকের অপর পারের নাম মল্লিতাল, সাহেব পাড়া, বড় বড় হোটেল আর শৌখিন বাজার এই দিকে। কয়েক দিন থাকবার পরেই নৈনিতালের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু চীনা পিকে কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়। মনে

হয়েছিল যেন দিগন্তে এক গলা রুপোর স্রোত বইছে। এমন সুন্দর বরফের পাহাড় আমি আগে কখনও দেখি নি। অন্য ধারে অনেক নিচে নৈনিতাল দেখলুম। যেন উড়ো জাহাজ থেকে নিচের দৃশ্য দেখছি। নৈনিতাল যদি লম্বায় এক হাজার হাত হয় তো চওড়ায় তার এক তৃতীয়াংশ হবে। পারের কোনখানে লম্বা লম্বা ঝাউ গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনখানে অ ্য কোন গাছ জলের উপর নুয়ে পড়েছে। পাল-তোলা নৌকোগুলো দেখাচ্ছিল বিন্দুর মতো। লারিয়া কাঁটা নামে আর একটা জায়গা প্রায় চীনা পিকের সমান উঁচু। সেখান থেকে এই অঞ্চলের অনেকগুলো লেক দেখা যায়। ল্যাণ্ডস্ এণ্ড থেকে দেখা যায় নিচের সমতলভূমি। এ সব অদ্ভুত দৃশ্য, বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হয়। ছুটোছুটি করে দেখলে এ সবের সৌন্দর্য বোঝা যায় না। দ্রষ্টব্য স্থান নৈনিতালে আরও অনেক আছে—কিলবেরি দেওপাট্টা ।। ক্যামেল্‌স্ ব্যাক স্নো ভিউ টিফিন টপ বা ডরোথি সিট।

সাহেবদের মেজাজ ঠিক আমাদের মতো নয়। পাহাড়ে আমরা যাই স্বাস্থ্যান্বেষণে, বড়লোকেরা বিশ্রামের জন্যে যায়। আমরা নির্জনতা ভালবাসি, পায়ে হেঁটে দূরে দূরে নির্জন পথে বেড়াতে যাই। কিংবা নৌকোয় উঠে চুপ করে বসে থাকি, নয় বই পড়ি। মিউনিসিপাল লাইব্রেরিতেও অনেকে বই পড়তে যাই। সাহেবরা এই অলস জীবন ভালবাসে না। তারা জীবন উপভোগ করে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে। তার জন্যেও সুব্যবস্থা আছে। সাঁতারের জন্য সুইমিং পুল আছে, ইয়াট আর নৌকো আছে, ঘোড়া আছে, স্কেটিং ট্রেকিংএরও ব্যবস্থা আছে। মল্লিতালের কাছে আছে ফ্ল্যাট্‌স্। সেখানে ফুটবল ক্রিকেট হকি খেলা হয়, মাঝে মাঝে পোলো খেলাও হয়। তার পরে ক্লাব আর সিনেমা।

সমস্ত পাহাড়ী শহরে এই রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। দার্জিলিঙের রেসকোর্স লেবঙে, সে অনেক দূর। সিমলার মাঠ

অ্যানানডেলে, সে অনেক নিচে। যাতায়াতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। মসুরিতে শুনেছি কোন খেলার মাঠ নেই, বেড়াবার পার্ক নেই, ভাল বসবার জায়গাও নেই। মসুরি নাকি বড়লোকের স্বাস্থ্যনিবাস— তাঁরা নিজেদেব প্রাসাদেব বাগানে বসে আলস্যে সময় কাটান।

যাদের বয়স কম, নৈনিতাল থেকে তারা নানা জায়গায় বেড়াতে যায়। খুরপাতাল একটি ছোট জলাশয়, হাঁটাপথ মাত্র তিন মাইল পশ্চিমে। ভাওয়ালি সাত মাইল আর ভীমতাল চোদ্দ মাইল দূরে। নৈনিতাল থেকে নিয়মিত বাস চলাচল করে। ভাওয়ালিতে কেউ আপেলের বাগান দেখতে যায়, কেউ যায় টি. বি. স্যানা-টোরিয়াম দেখতে। ভীমতাল সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র দু হাজার ফুট উপরে। এখানকার লেকটি ভারি সুন্দর। লেকের মাঝখানে একটি ছোট দ্বীপ আছে। একটি ঘন ওকের জঙ্গলের মধ্যে নৌকুচিয়াতাল একটি নয়-কোণা জলাশয়, তাতে প্রচুর মাছ। মাছ ধরাব অনুমতি নিয়ে লোকে সেখানে যায়। নৈনিতাল থেকে চোদ্দ মাইল দূরে বামগড়ে লোকে ফলের বাগান দেখতে যায়। আপেল পীচ চেরী আর অ্যাপ্রিকটের বাগান। এখান থেকে এগার মাইল দূরে মুক্তেশ্বরে হল ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

তারপর রাণীক্ষেতের প্রসঙ্গ। রাণীক্ষেতকে যাঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্বত্য শহর বলেন, তাঁরা এই কারণে বলেন যে এটি একটি মালভূমির উপর অবস্থিত ও এইখান থেকে হিমালয়ের দুশো মাইল ব্যাপী তুষারধবল গিরিশ্রেণী দেখা যায়। রাণীক্ষেতের উচ্চতা প্রায় ছ হাজার ফুট, ক্যান্টনমেণ্ট এরিয়া আরও এক হাজার ফুট উঁচুতে। এই প্রশস্ত সুন্দর মালভূমিটি দেখে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োর ভারি পছন্দ হয়েছিল। তিনি ভারতের রাজধানী সিমলা থেকে এইখানে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

আমি আমার বইএর মানচিত্রটি খুলে দেখলুম যে কাঠগোদাম থেকে রাণীক্ষেতের দূরত্ব তিপ্পান্ন মাইল। জেওলিকোট থেকে সোজা

রাস্তা নৈনিতাল গেছে, সেই রাস্তাই ডান দিকে গেছে ভাওয়ালি। নৈনিতাল থেকেও একটা সোজা রাস্তা ভাওয়ালি এসেছে। এটি একটি ত্রিভুজ। ভাওয়ালি থেকে পাঁচটি বড় রাস্তা পাঁচ দিকে গেছে। একটি গেছে কাঠগোদাম আর একটি নৈনিতাল। তৃতীয় রাস্তা নৌকুচিয়াতাল গেছে, সাততাল ও ভীমতাল এই পথের দক্ষিণে, আর একটা পথ মুক্তেশ্বর গেছে। রামগড় থেকে মুক্তেশ্বর পর্যন্ত পথের দু ধারে ফলের বাগান। শেষ পথটি গেছে রাণীক্ষেতের দিকে। কোশী নদীর পুল পেরিয়ে আরও উত্তরে রাণীক্ষেত। যাঁরা আলমোড়া যাবেন তাঁদের কোশী নদী পেরতে হয় না। কোশী নদীর এপার থেকেই ডান দিকে বেরিয়ে গেছে আলমোড়ার পথ। কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া তিরাশি মাইল, রাণীক্ষেত থেকে মাত্র তিরিশ।

প্রফেসর শর্মা বললেন: রাণীক্ষেতের চারি দিকে যেমন ঝাউ ওক সিডার ও সাইপ্রেস গাছের ঘন অরণ্য, ভিতরে তেমনি সুন্দর পথ ঘাট, খেলার মাঠ, পোলো গ্রাউণ্ড ও গল্‌ফ্‌ কোর্স। প্রায় সব পথে মোটর চলে ও বেশির ভাগ বাড়িতেই মোটরে যাতায়াত করা যায়।

এক দিন ভোর বেলায় উঠে উত্তরে হিমালয় পাহাড়ের দিকে তাকালে চোখ আপনার জুড়িয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল দৃশ্য আপনি জীবনে কখনও দেখেছেন কিনা মনে পড়বে না। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যত দূর দেখা যায় সবটাই বরফের পাহাড়। নেপাল থেকে টেহরি গাড়োয়াল ও বদরীনাথের বিস্তার বোধ হয় দুশো মাইল। রাণীক্ষেতের অনেক জায়গা থেকেই এ দৃশ্য আপনার চোখে পড়বে।

জিজ্ঞাসা করলুম: মাউণ্ট এভারেস্টও কি দেখতে পাওয়া যায়?

ভদ্রলোক বললেন: আমি দেখতে পাই নি; কিন্তু শুনেছি, খুব পরিষ্কার দিনে অস্পষ্ট ভাবে মাউণ্ট এভারেস্ট অনেকে দেখেছেন।

যা দেখে চোখ জুড়োয়, তা হল নন্দাদেবী। সব চেয়ে পূর্বে একটি ধূসর পিরামিডের মতো শিখর। তার পরে ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি। পশ্চিমের দিকে হাতি পর্বত ও গৌরী পর্বত। এরই পিছনে কোন কোন দিন মাউন্ট এভারেস্ট দেখা যায়। আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকলেও যে সব পাহাড় দেখা যায়, তাদের নাম হল মানা পিক কামেট পাঁচকোটি ও নীলকান্ত এ সব বদরীনাথের দিকে।

প্রফেসর শর্মা বললেন: এই সব পাহাড় দেখবার জন্যেই রাণীক্ষেতে যাওয়া দরকার। আপনি কী বলবেন জানি না, সমুদ্রের মতো পাহাড়ে গেলেও নিজেকে বড় ছোট মনে হয় নিজের সঙ্কীর্ণতা নিজের কাছেই ধরা পড়ে। ধীরে ধীরে মন হয় উদারতায় অভ্যস্ত।

বলতে আমার লজ্জা হল যে সমুদ্র যে ভাবে দেখেছি, পাহাড় দেখি নি তেমন করে। যে সব পাহাড়ে উঠেছি, তার আকর্ষণ অনুভব করি নি। আকর্ষণ তো পাহাড়ের নয়, বোধ হয় বরফের। হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে একবার যে ভাব বরফ দেখেছে সে-ই বাঁধা পড়েছে পাহাড়ের মায়ায়। বারেবারে তাকে ছুটে যেতে হয়, তার আর নিস্তার নেই।

উত্তরে আমি বললুম: গান্ধীজীও এই কুমায়ুন পাহাড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

প্রফেসর শর্মা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

আমি গাইড বই খুলে দেখলুম যে আলমোড়া অতি প্রাচীন শহর। কুমায়ুনের রাজা কল্যাণচাঁদ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর পত্তন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি ব্রিটিশের হাতে এসেছে। পাঁচ হাজার ছ শো ফুট উঁচু, এই শহরটির অন্য রকম মায়া। দু' মাইল লম্বা এই শহরটির চারি দিকে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় মাথায় মন্দির। শহরের বাজারটি পাথরে বাঁধানো, তার দু ধারে

স্লেট পাথরের বাড়ি, ছাদও স্লেটের। দোতলা তেতলা চারতলা বাড়ি।

প্রফেসর শর্মা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: আলমোড়ায় বরফের পাহাড় দেখতে লোকে লালমণ্ডি যায়। চার মাইল দূরে কালিমাট থেকে নেপালের পাহাড় দেখা যায়। কালো মাটির জন্যে নাম কালিমাট। কাছাকাছি আরও অনেক পাহাড় আছে, উঁচু নিচু পথ ধরে সে সব জায়গায় পৌঁছতে হয়। সব নাম আমার মনে নেই, মনে আছে শুধু ঝাণ্ডিধরের নাম। এখান থেকে শুধু শহরের দৃশ্য নয়, হিমালয় ও কুমায়ুনেরও সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। রাজা কল্যাণচাঁদের এটি প্রিয় গ্রীষ্মাবাস ছিল। তিনি একটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করে গেছেন।

আমি বললুম: আলমোড়ার কাছে মায়াবতী আশ্রমের কথা শুনেছিলুম।

ঠিকই শুনেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম ও উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠান আলমোড়া শহরে, রামকৃষ্ণ মিশনেরই মায়াবতী আশ্রম বিয়াল্লিশ মাইল দূরে। মোটরে চম্পাবতী গিয়ে ছ মাইল হাঁটতে হয়। প্রবুদ্ধ ভারত নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার দপ্তর এই আশ্রমে। নির্জনতার জন্য আপনাদের দেশবন্ধু এই আশ্রমটি বড় ভালবাসতেন।

উপেনদার কাছে আমি এই গল্প শুনেছি। বললুম: জানি।

প্রফেসর শর্মা বললেন: পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার আমি দেখতে যেতে পারি নি। হাতে আমার সময় ছিল না। তা না হলে যে রকম সুব্যবস্থার কথা শুনেছিলুম, তাতে যাবার বড় লোভ হয়েছিল। আলমোড়া থেকে মাত্র পঁচাত্তর মাইল হাঁটতে হয়, দিন আষ্টেকের যাত্রা। আটটি স্টেজে আটটি ডাকবাংলো। জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরতে পারলে এ একটা চমৎকার যাত্রা। মে জুন কিংবা সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বেরতে হয়। তের চোদ্দ হাজার ফুট ওঠবার সময়

ধাপে ধাপে প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে ঝাউ গাছ শেষ হয়ে আসবে ওক গাছ, তার পরে দেবদারু। আরও উপরে উঠলে বুনো ফুল ফার্ন আর রডোডেনড্রন। একেবারে গ্লেসিয়ারের কাছে ঘাস আর গুল্ম।

এই গ্লেসিয়ারটি হল দু মাইল লম্বা, চওড়ায় ছয় থেকে আটশো হাত। এই বরফ আসে নন্দাদেবী ও নন্দাকোট পাহাড় থেকে। নিচে পিণ্ডারী নদী। এরকম দৃশ্য আপনি কল্পনা করতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন, আর আমি তাকালুম তাঁর মুখের দিকে। উত্তর শুধু একটি শব্দে এল: অপূর্ব।

ভদ্রলোক অনেক ক্ষণ নীরবে কাটিয়ে বললেন: এই আলমোড়া থেকে যাত্রীরা আর একটি লোভনীয় স্থানে যায়।

আপনি মানস সরোবর ও কৈলাসের কথা বলছেন?

ঠিক ধরেছেন। নানা দেশ থেকে যাত্রীরা এসে আলমোড়ায় জমা হতে থাকে। তার পর এক যোগে যাত্রা। পথের দূরত্বও যত, দুর্গমতাও তত। কেদার-বদরীনাথের মতো পথের ধারে ধারে চটি নেই, নিজেদেরই সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। শুধু খাদ্য নয়, রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু পর্যন্ত। লিপুলেকে ভারতের সীমান্ত, তার পরে তিব্বত। বামে রাক্ষসতাল ও দক্ষিণে মানস সরোবর। তার মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। যাত্রীরা কৈলাস পরিক্রমা করে, গৌরীকুণ্ডে স্নান করে, তারপর তুষারমৌলি কৈলাসকে প্রণাম করে দেশে ফেরে। কোন মন্দির নেই, দেবতা নেই, শুধু জল আর বরফ। এই আমাদের দেবতা। এই দেবতাকে দেখবার জন্য যুগযুগান্তর ধরে যাত্রীরা যায় কৈলাসে।

কালিদাসের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ল।—

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থ সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

কুবের-বিজয়ী রাবণ এক দিন বাধা পেয়েছিলেন এই কৈলাস পর্বতে। পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করে মোহান্ধ রাক্ষস তাঁর বিশ হাতে এই পর্বতকে পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লীলাময় মহাদেবেব পায়ের চাপে নিপীড়িত হয়ে তাঁর অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। তার পব এই মানস সরোবরেব তটে সেই উদ্ধত বাক্ষস সহস্র বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তাঁব দেহের স্বেদে কিংবা অশ্রুধারায় এই রাবণ হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল।

কুবের কোন কালে ভারতেব আরাধ্য দেবতা ছিলেন না। যুগ যুগ ধরে ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছে যে দেশ, ঐশ্বর্যে বিরাগ ছিল তার রক্তে ও মজ্জায়। কুবের তাই ভাবতের সীমানা এই হিমালয় পাহাড় ডিঙিয়ে মানসেব তীরে তাঁর পুবী নির্মাণ করেছিলেন। সকাল বেলায় তাঁর পুরললনারা স্নান ও প্রসাধনের জন্য এই সরোবর তীবে নেমে আসতেন। তাঁদের চঞ্চল চরণে নূপুবের নিক্কণ উঠত মন্দিরাব মতো। পরিধেয় পট্ট বস্ত্রেব বর্ণাঢ্যে রামধনুর ছায়া পড়ত মানসের নীল জলে। আর তাঁদেব হীরকাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত হত মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের বিচিত্র দ্যুতি।

আবেগোচ্ছল হংসমিথুন সেই শান্ত সুনীল জলরাশির উপর কেলি করত। তাদের পক্ষপুটে বিক্ষুব্ধ সলিল তরঙ্গ নিক্ষেপ করত বলয়ের মতো। সেই তরঙ্গ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে স্নানার্থিনীদের নিরাবরণ বক্ষে এসে আঘাত করত। কঙ্কণবলয়শিঞ্জিত লীলায়িত বাহুর তাড়নায় তরঙ্গের নৃত্য উঠত তটপ্রান্তে।

সেখানে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে ছিল একটি বৃদ্ধ বট, নির্বাক প্রহরীর মতো তার দিবারাত্রির সতর্ক প্রহরা। স্নানসমাপনান্তে কুবের কন্যারা এসে প্রসাধন করত এই বটের ছায়ায়। যেখানে

সূর্যকিরণ এসে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সেই উত্তাপে ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মেলে দিত কেশবতী কন্যা, আর যৌবনভারগর্বিতা নারী তার বেশবিন্যাস করত ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আজ আর মানসতটে সে বটগাছ নেই। কুবের কন্যাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে না তার তীরভূমি। কুবের আজ ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাঁর নতুন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে। যে ভারত এক দিন তাঁকে চায় নি তার আদর্শে, সেই ভারতকে তিনি চির দিনের জন্য পরিত্যাগ করে গেছেন। ভুখা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদছে।

কিন্তু ভারতের আদর্শ আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সেই সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বর আজও তপস্যারত তুষারশৈলশিখরে। কৈলাস আজও জেগে আছে। জেগে থাকবে কিন্তু ভারতবাসী কি আর সেখানে যেতে পারবে!

২৪

মনোরঞ্জনের নাক ডাকার শব্দ বন্ধ হতেই আমি তার দিকে তাকালুম। সে চমকে সোজা হয়ে বসেই চেঁচিয়ে উঠল: এই চা।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর চা-ওয়ালা চেঁচিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। এ কোন্ স্টেশন?

প্রফেসর শর্মা বললেন: ফৈজাবাদ।

মনোরঞ্জনের পরে আমি চা নিলুম। প্রফেসর শর্মাকে এগিয়ে দিতে গেলে তিনি বললেন: ধন্যবাদ। চা আমি খাই না।

নিজের বোতল বার করে তিনি খানিকটা জল খেলেন।

মনোরঞ্জন তারাপদবাবুকে চেঁচিয়ে বলল: এখুনি খেয়ে নিন দাদা। পরে জুটবে কিনা জানা নেই।

তাঁরাও চা নিলেন। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। ঘন ঘন হাত বদল করে খেতে হল।

এই সময় প্রফেসর শর্মা বাথরুমের দিকে উঠে যেতেই মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল: ভদ্রলোক পাগল নাকি?

কেন?

একেবারে রেডিও চালিয়েছিলেন।

রেডিও তো তুমি চালিয়েছিলে।

কেন?

তোমার নাক ডাকার শব্দে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলুম না।

বটে।

বলে মনোরঞ্জন গম্ভীর হল।

অনেক দিন আগের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। দক্ষিণ

ভারত ভ্রমণের সময় এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কোন একটা স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। মামার গাড়িতে খেয়েদেয়ে নিজের কামরার দিকে যখন পা বাড়াচ্ছিলুম, তখন স্বাতি বলল: একখানা বই নিয়ে যাবেন গোপালদা?

বলেছিলুম: বই আমার চাই না।

তা হলে সময় কাটাচ্ছেন কী করে?

সংক্ষেপে বলেছিলুম: রেডিও শুনে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়েছিল: রেলের গাড়িতে রেডিও বাজাচ্ছেন আপনারা!

আমরা বাজালে অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করে দিতুম। বাজাচ্ছেন এক ভদ্রলোক, যাঁর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তাঁকে বারণ করতে পারছেন না?

বারণ করলেই বা শুনছেন কে! রেল কোম্পানি সরকারী নোটিশ মেরেছেন কামরার দেওয়ালে—জানলা দিয়ে হাত পা বার করো না, অযথা শিকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা লাগবে, বিড়ির টুকরো বাইরে ফেল, এমন কি সহযাত্রীর অনুমতি নিয়েই সিগারেট ধরাতে পার পর্যন্ত। কিন্তু—

পিছনে গার্ড সাহেবের সবুজ আলো দেখে বললুম: অনেকক্ষণ আগে এক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠেছেন—কালীঘাটের হালদার। আশ্বিন মাসে বিয়েব গল্প নিয়ে আসর জমিয়েছেন, থামছেন না কিছুতেই।

স্বাতির হাসি ছাপিয়ে গিয়েছিল মামার অট্টহাসি।

প্রথমে স্বাতি আমাকে 'আপনি' বলত। তার পর নিজে থেকেই 'তুমি' বলা ধরল। বলল: কাল কম করে হাজার আটবার 'আপনি' বলেছি তোমাকে।

হেসে বলল: পরকে অমন আপন বলি নি এ জীবনে।

সেই স্বাতি এবারের বড় দিনের সময় কলকাতায় এসেছিল। মাঘ মাসে তার বিয়ে হত জো রায়ের সঙ্গে। বিবাহের আয়োজনের জন্য মামা আমার সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন। আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম কলকাতা থেকে। পুরীর সমুদ্র-বেলায় শুয়ে জীবনটা শূন্য মনে হয়েছিল। তার পর ওই কালীঘাটের হালদারের মুখেই তার বিয়ে ভেঙে যাবার সংবাদ পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে-ছিলুম। স্বাতিরা তখন দিল্লীতে ফিরে গেছে।

আমার সামনেই স্বাতির তিনটে সম্বন্ধ ভেঙে গেল। দুটো কলকাতায়, আর একটা দিল্লীতে। তার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখনই একটা সম্বন্ধ পাকা হয়ে ছিল। বিলেত ফেরত ছেলে, মামীর খুবই পছন্দ ছিল। কিন্তু স্বাতি আমাকে তার মনের কথা জানিয়েছিল। সেই লোকটার গলায় মালা দেবার চেয়ে তাদের চাকর রামখেলাওনের সঙ্গে ইলোপ করাও তার পক্ষে সহজ হবে। এই বিয়েটা কেন ভাঙল, সে কথা আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। এবারে জো রায়ের সঙ্গে সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল। হালদারের কথা যদি সত্য হয় তো তিনিই বিয়েটা ভেঙেছেন। তাঁর ধারণা এই কাজ করে তিনি শুধু আমারই উপকার করেন নি, স্বাতিকেও সাহায্য করেছেন।

দিল্লীতে তার সম্বন্ধ হয়েছিল রাণার সঙ্গে। শুধু সম্বন্ধই হয়েছিল, বিয়ের কথা পাকা হয় নি। দিল্লীর বিয়ের বাজারে স্বাতি রাণার কাছে দাম পেয়েছিল, পায় নি তার বাবার কাছে। ঝানু আই. সি. এস. ব্যানার্জি সাহেব যেমন চাওলাকে মেকী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি স্বাতিকেও গ্রহণ করেন নি বলে। অঘোর গোস্বামীর এম. পি. থেকে উপমন্ত্রী হবার সম্ভ থাকলেও তিনি হয়তো বিবেচনা করে দেখতে পারতেন। মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্র মন্ত্রীকে বেয়াই পাকড়াতে পারলে ছেলের উন্নতি ও নিজের এক্সটেন্সন দুইই সম্ভব হত। কাজেই রাণা এ বিয়েতে

বাপের মত পেল না। আর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করার দুঃসাহস রাণার মতো ভাল ছেলের নেই।

পুরী থেকে ফিরে এসে আমি স্বাতির খোঁজ করতে গিয়েছিলুম তাদের বাড়িতে। কারও দেখা পাই নি। তাঁরা দিল্লীতে ফিরে গিয়েছিলেন। আমাদের চা-ওয়ালা হারানিধি তাঁদের খোঁজ নিয়েছিল। তাঁরা আমার খোঁজ করতে উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন। কারও কাছে খোঁজ না পেয়ে ফিরে চলে গেছেন।

স্বাতি আমাকে কেন চিঠি লেখে নি তা অনুমান করতে পারি। মামী নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছিলেন। হয়তো আমাকেই দায়ী করেছেন এই বিয়ে ভাঙার জন্যে। আমরাই হালদারকে নানা জায়গায় সুযোগ দিয়েছি নানা ভাবে। তিনি যদি মুখরোচক গল্প কিছু রাষ্ট্র করে থাকেন তো তার জন্য আর কেউ দায়ী নয়। রামেশ্বরে যে রাত আমরা মন্দিরে কাটিয়েছিলুম, সেই রাতে হালদারও ছিলেন ধর্মশালায়। তিনি নিজের চোখেই সব দেখেছিলেন। তার পরে পুষ্করে আমাদের দেখেছেন, দেখেছেন দ্বারকার সমুদ্র তীরে সায়াহ্নের অন্ধকারে, প্রভাসে সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে দেখেছেন পূর্ণিমার রাতে। হালদারকে আমরা আর ভয় পাই না। কিন্তু মামী ভয় পান। তাঁর ধারণা যে এই সব ঘটনা হালদার কলকাতার বাজারে রঙ দিয়ে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

হালদারের একটা কথা আমার মনে পড়ল। পুরীতে আমাকে বলেছিলেন: গোপালবাবু, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়ে যদি রোজগার হয় তো ও কাজ কেন করব! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়! ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ, সে কথা তো জানি।

আমি বলেছিলুম: সত্যি কথা।

সত্যি কথা!

বলে হা-হা করে হালদারমশাই হেসে উঠেছিলেন। পিছনের পথচারী চমকে উঠেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সমুদ্রের গর্জন খানিকক্ষণ শুনতে পাইনি। হাসি ফুরোবার পরে বলেছিলেন: এবারে বলেছি সব কথা, বলে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি।

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

হালদার মশাই বলেছিলেন: হাঁ করে দেখছেন কী। এবারে এই কর্মই তো করে এলুম। কিন্তু যাঁর পয়সায় এলুম তাঁর নাম আমি কিছুতেই ভাঙব না।

অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বলেছিলেন: প্রতিজ্ঞা করেছি।

সে দিন পুরীর সমুদ্র তীরে বসে বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি যে কে তাঁকে টাকা দিয়েছিল। আমি শুধু এইটুকু ভেবেই আশ্চর্য হয়েছিলুম যে হালদারের সাহায্যের কেন দরকাব হল। সময় মতো সে ভদ্রলোক এসে না পড়লে কি এ বিয়ে ভাঙত না!

স্বাতি এখন কী করছে। কা করে তার সময় কাটছে। একবার যেন শুনেছিলুম যে সে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে এম. এ. ক্লাস করতে। কথাটা সে আমার কাছে গোপন রেখেছে। কেন রেখেছে, তা সে নিজেই জানে। তার সময় কাটাবার আর একটি জিনিস দিল্লীতে দেখেছিলুম। একটি সেতার। এক দিন সে আমাকে তার সেতার শুনিয়েছিল।

তখন আমি জানতুম না যে সে সেতার বাজায়। ঘরের কোণায় টাঙানো একটা সেতার দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: কে বাজায় এটা?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হেসেছিল।

তোমারই সম্পত্তি বুঝি? কিন্তু জানতুম না তো।

সব কথাই যে জানতে হবে, তার কি মানে আছে।

এক সঙ্গে থেকেও জানি না, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

দিন কয়েক এক সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাই কি এক সঙ্গে থাকা হল!

তোমাদের বাড়িও তো গেছি কয়েকবার। কিন্তু সে তর্ক থাক. এবারে কিছু বাজিয়ে শোনাও।

সঙ্গত করতে পারবে?

স্বাতির প্রশ্নে খানিকটা কৌতুক ছিল।

বলেছিলুম: আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই, আমি তোমার বাজনা শুনতে চাই।

সে কি!

আমি সত্যি কথাই বলছি। তবলার সঙ্গত না হলেও তোমার হাতের সুর আমি উপভোগ করতে পারব। তোমার দিকে যখন তাকাই, তখন তোমাকেই দেখি। রাণার পাশে তোমাকে কেমন মানাবে সে কথা ভাবি না।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জান না, এই তর্কে তারই প্রমাণ দিচ্ছ।

তা হয়তো দিচ্ছি। কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত না হলেও তাতে ভেজাল নেই। তোমার সুরও খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই আঘাত করবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুরু করতে পার।

স্বাতি তবু ওঠে নি। বলেছিল: আর একটা বাধা আছে। এখন বিকেল, এ সময়ের কোন রাগিণী আমার জানা নেই।

জানালা দিয়ে চেয়ে বলেছিলুম: সূর্যাস্তের সময় হয়েছে। তার জন্যে শুনেছি অনেক রাগিণী আছে।

শ্রীরাগ আমার ভাল লাগে না।

বসন্তের কোন রাগিণী বাজাও, চৈত্র এখনও শেষ হয় নি।

আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে, তাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে কোন দিন পারব!

আমি চমকে উঠেছিলুম একথা শুনে। কিন্তু কোন উত্তর আমার মুখে যোগাল না।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলেছিল: রাত গভীর হোক, তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাব। সেই আমার মনের সুর হবে।

রাতে একখানা খাটিয়া পেতে আমি বাহিরে শুয়েছিলুম। আর ভাবছিলুম নিজের জীবনের কথা।

অনেকক্ষণ থেকে একটা মিষ্টি সুর কানে এসে লাগছিল। ভাল করে শুনেই বুঝতে পারলুম যে ঘরের ভিতর স্বাতি সেতার বাজাতে বসেছে। ভারি মিষ্টি তার হাত, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছে আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ, বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গেল, আমি উৎকর্ণ হয়ে তার বাজনা শুনতে লাগলুম।

এক সময় মনে হল যে স্বাতি আমার মনের সুরটি যেন ধরতে পেরেছে। এক মুঠো কাশফুলের মতো সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই, লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গেল।

সকাল বেলায় স্বাতি বলেছিল: কাল বাজনা শুনেছিলে আমার? বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

এর পর স্বাতি আর আমাকে সেতার শোনায় নি।

কিন্তু সেই কথাটি সেদিন সে কেন বলেছিল?—আমার বসন্ত তো শেষ হয়ে গেছে, তাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে কোন দিন পারব?

আমি এ কথার মানে বুঝেছিলুম, তাই তাকে কোন প্রশ্ন করি নি। কোনও উত্তরও দিতে পারি নি। পরে তাকে আমি উত্তর দিয়েছিলুম। কথায় নয়, কাজে। দিল্লী থেকে ফেরবার পথে

এলাহাবাদ স্টেশনে আর নামি নি। সোজা ফিরেছিলুম কলকাতায়।

আমি কি এলাহাবাদে নামতে ভয় পেয়েছিলুম? যমুনার অভিশাপের কথাই যদি বিশ্বাস করতুম তো এলাহাবাদের টিকিট কাটতুম কেন? অর্থ প্রতিপত্তি বা রাজকন্যার লোভে?

সেখানে না নেমেই বা আমি কী পেয়েছি?

কে বলে কিছু পাই নি! জীবনের বসন্ত ফুরিয়ে গেছে বলে কি স্বাতি এখনও আক্ষেপ করছে!



আমি একটু নড়েচড়ে বসতেই মনোরঞ্জন বলে উঠল : ঘুমোও ঘুমোও, একটু ঘুমিয়ে নাও। রাতটা তো আবার বসে কাটাবে।

মনোরঞ্জনের পাশ থেকে প্রফেসর শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন : বসে কাটাবেন কেন ?

ওর ওই রকম অভ্যেস। বেনারস আসবার পথে ওকে আমি শুতে দেখি নি।

আমি যে খানিক ক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। বাথ রুম থেকে ফিরে এসে প্রফেসর শর্মা আমার পাশে না বসে অন্য ধারে মনোরঞ্জনের পাশে বসেছেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হল যে এতক্ষণ তাঁরা গল্প করছিলেন। প্রফেসর শর্মা মুখ বাড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন : কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্‌।

নিতান্ত বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলুম : অভিনন্দন আবার কিসের জন্যে ?

প্রফেসর শর্মা একবার মনোরঞ্জনের দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে হাসলেন। মনোরঞ্জনও রহস্যময় চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আপনার কথা আমি বুঝতে পারলুম না।

এর উত্তরে তিনি সাবিত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন।

আমার আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। আমার অজ্ঞাতসারে মনোরঞ্জন প্রফেসর শর্মার কাছে অনেক কিছু বলেছে। কিন্তু কেন বলেছে, তা বুঝতে পারলুম না। সহযাত্রীর সঙ্গে আমরা আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করি, কিংবা স্থান কাল রাজনীতি নিয়ে। ব্যক্তিগত

বিষয় নিয়ে আলোচনা মার্জিত রুচির পরিচয় নয়। বললুম: আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না।

নাই বা দিলেন।

বললুম: বিবাহ আমার কাছে বিলাস। আমার বন্ধু এই কথাটি বুঝেও বোঝে না।

প্রফেসর শর্মা বললেন: এটি এ কালের সমস্ত যুবকের কথা। আপনিও এই কথা বলে যুগের ধর্মকেই সম্মান করলেন।

বলুন, যুগের সত্যকে স্বীকার করলুম।

প্রফেসর শর্মা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: যে যুগে একজন লোকের উপার্জনের উপর একটা গোটা পরিবার নির্ভর করে থাকত, সে যুগ আজকাল গত হয়েছে। এখন এমন দিন এসেছে যে পরিবারের প্রত্যেককে রোজগার করতে হবে। এই হল সাধারণ মানুষের ভাগ্য। যারা অসাধারণ তাদের অন্য কথা, অন্য নিয়ম। আমি অসাধারণ নই।

প্রফেসর শর্মা চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন এমন হল?

এ কথার উত্তর দিতে হলে নিজেরই বিপদ ডাকা হবে। তবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের নীতির পরিবর্তন সাধন দরকার।

এই সঙ্গেই যোগ করলুম: মানুষের সমাজে বর্ণ ভেদ না থাকলে অনেক দিন আগেই আমি সংসার পাততে পারতুম। তা যখন করি নি, তখন আর সে বাসনা নেই।

আপনার বয়স এমন কিছু বেশি নয়।

অভিজ্ঞতা বেশি হয়েছে। জেনে শুনে ফাঁদে পা দেবার নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তার চেয়ে আপনি অন্য কিছু বলুন।

কী বলব?

বলুন—

ভাবতে গিয়ে প্রথমেই আমার হিন্দী সাহিত্যের দিক্‌পাল ভারতেন্দুর কথা মনে পড়ল, বললুম: ভারতেন্দুর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

আমাব অনুরোধ শুনে প্রফেসর শর্মা হাসতে লাগলেন।

বললুম: হাসছেন যে?

আপনি যে খাঁটি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক তা বুঝতে পারছি।

কেন?

একটা মধুর প্রসঙ্গ ছেড়ে সাহিত্যের কচকচির মধ্যে ঢুকতে চাইছেন! কিন্তু আমি তো সাহিত্যের অধ্যাপক নই। সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব কেন!

আমাকেও কোন পরীক্ষা দিতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।

মনোরঞ্জন বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল।

প্রফেসর শর্মা বললেন: শুনে আশ্চর্য হবেন, যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নামে এখন একটা যুগ ধরা হয়, তিনি মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান।

বলেন কি!

প্রফেসর শর্মা হাসলেন। বললেন: আপনার মতো সকলেই এ কথা শুনে চমকে ওঠেন। বেঁচে থাকলে তিনি কী করতে পারতেন সে কথা আজ অবান্তর। যা করেছিলেন, তার জন্যেই আজ হিন্দী সাহিত্যের জনক বলে মান্য হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। এক দল ফার্সির পক্ষে, অন্য দল সংস্কৃতের। তরুণ হরিশ্চন্দ্র বললেন, ফার্সি নয়, সংস্কৃতও নয়, সাহিত্যের ভাষা হবে পশ্চিমী হিন্দীর কথ্য ভাষা খড়িবোলি। এই ভাষার সংস্কারে এগিয়ে এলেন সরস্বতীর সম্পাদক পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ নিয়ে ভারতেন্দু সাহিত্যের আসরে নামেন ষোল বছর বয়সে। কবিতা ও প্রবন্ধের চেয়ে নাটক লিখে বেশি খ্যাতি পান। তাঁর নাটকে সংস্কৃত রীতির সঙ্গে ইংরেজী আঙ্গিকেব সমন্বয় হয়েছে।

ভারতেন্দুব মতো পণ্ডিত দ্বিবেদীও একটি যুগের প্রবর্তক। বিশ বছর তিনি সরস্বতীব সম্পাদক ছিলেন এবং খড়িবোলিব সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেন। তাঁরই অনুকরণে এ যুগের কবিরা ব্রজ-ভাষা ছেড়ে খড়িবোলিতে কবিতা রচনা শুরু করেন। পণ্ডিত দ্বিবেদী শুধু সংস্কৃত ও ইংরেজী নয়, মারাঠী ও বাংলা ভাষারও নানা গ্রন্থ অনুবাদ করে হিন্দীকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মৈথিলীশরণ গুপ্ত এই যুগের কবি হলেও ছায়াবাদ আন্দো-লনেরও একজন নায়ক।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ছায়াবাদের কী মানে?

প্রফেসর শর্মা বললেন: ছায়াবাদের মানে আমার কাছেও খুব পরিষ্কার নয়। বোধ হয় ইংরেজী মিস্টিসিজমকেই হিন্দীতে ছায়াবাদ বলা হয়েছে। বস্তুকেন্দ্রিক কবিতা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মনের উপর প্রকৃতি ও প্রেমের প্রভাব নিয়ে কবিতা শুরু হল। এক দিকে কবীর বিদ্যাপতির প্রেরণা, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ও বিদেশী কবিদের প্রভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রায় পনর বছর এই ছায়াবাদের যুগ।

এই যুগের কবি মৈথিলীশরণের দুখানি কাব্য উল্লেখযোগ্য— সাকেত ও যশোধরা। প্রথমটি রামায়ণ কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার কাহিনী, দ্বিতীয়টি বুদ্ধপ্রিয়া যশোধরার কথা।

জয়শঙ্কর প্রসাদ তাঁর কামায়নী কাব্যে শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। গল্প উপন্যাস আধুনিক নাটকও ইনি লিখেছেন। উপন্যাসে আদর্শবাদী ও ছোটগল্পে কাব্যধর্মী। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় এযুগে তাঁর তুলনা নেই।

কবি নিরালা শুধু ছায়াবাদের যুগের নন, এ যুগেরও শ্রেষ্ঠ কবি।

আমি বললুম: বাঙলাদেশে তাঁর জন্ম বলে শুনেছি।

প্রফেসর শর্মা বললেন: মহিষাদল বোধ হয় বাঙলায়। বাঙলা দেশে মানুষ হয়েছেন বলে বাঙলার প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে, বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এ কথা আমরা তাঁর কবিতার সমালোচনা পড়ে জেনেছি। ছন্দোময় কবিতাও লিখেছেন, আবার গদ্য কবিতাও আছে। তাঁব অনেক কবিতা আমার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে।

নিরালাব আসল নাম আমি একবার শুনেছিলাম, কিন্তু মনে রাখতে পাবি নি। সেই কথা শুনে প্রফেসর শর্মা বললেন: সূর্য-কান্ত ত্রিপাঠী।

তার পর বললেন: সুমিত্রানন্দন পন্থের নাম শুনেছেন?

শুনি নি।

প্রফেসর শর্মা বললেন: এঁরই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে বেশি। আর কবি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন। ব্রজভাষার লালিত্য যদি খড়িবোলিতে এসে থাকে তো তা কবি সুমিত্রানন্দনের জন্যেই।

একটু ভেবে বললেন: মহাদেবী বর্মার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই বললেন: তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিই নন, তাঁর মতো শক্তিমতী কবি শুধু ছায়াবাদের যুগে নয়, এ যুগেও কম আছেন। অনেকে তাঁকে আধুনিক মীরাবাঈ বলেন। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাচীন হিন্দীর কিছু প্রভাব পড়েছে। সর্বত্র একটি বেদনার সুর। মিলনকা মত নাম লে, মৈঁ বিরহ মে চির হুঁ শলভ। ব্যর্থতার পথ বেয়ে আসবে জীবনের সার্থকতা।

প্রফেসর শর্মা এইখানে থামলেন।

অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম : তার পর?

তার পর প্রগতিবাদের যুগে এসে আমি খেই হারিয়ে ফেলি।

কেন?

কেউ বলেন, শুধু প্রগতিবাদ নয়, আছে পরীক্ষাবাদ বা প্রতীকবাদ।

হেসে বললুম : বাদানুবাদে আমাদের দরকার নেই। আপনি কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের কথা বলুন।

তা পারি। কবিদের মধ্যে পন্থ নিরালার পর দিনকর সুমন কেদারনাথ।

প্রফেসর শর্মা আরও নাম মনে করবার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললুম থাক। এবারে বরং গদ্য সাহিত্যের কথা কিছু বলুন।

প্রফেসর শর্মা আরাম পেলেন, বললেন : সেই ভাল।

কিন্তু কথাসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রাচীন কোন নাম মনে করতে পারলেন না। বললেন : প্রেমচাঁদের আগের কোন নাম মনে পড়ছে না। বোধ হয় নেই। শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রেমচাঁদ উর্দুতে লিখতেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিন্দীতে হাত দিলেন। কাজেই হিন্দী কথাসাহিত্যের জীবনকাল বছর চল্লিশের বেশি হবে না। প্রেমচাঁদের কোন লেখা পড়েছেন?

বললুম : উপন্যাস পড়ি নি, দু একটি ছোটগল্পের অনুবাদ পড়েছি।

তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর লেখা কত জীবন-ঘনিষ্ঠ। পাত্রপাত্রীর কথাবার্তাও তাদের চরিত্রের অনুকূল। জয়শঙ্কর প্রসাদও এই সময়ে উপন্যাস লিখতেন। তাঁর লেখার অন্য মেজাজ। এমন কি ভাষারও। প্রেমচাঁদের হিন্দীতে যেমন উর্দু ভাষার প্রাধান্য, জয়শঙ্কর তেমনি সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। কৌশিক উগ্র, এঁরাও এই সময়ে উপন্যাস লিখে নাম করেছেন।

কৌশিকের নাম ঐতিহাসিব উপন্যাসের জন্য, উগ্র বস্তুবাদে বড়ই উগ্র। জীবনের এমন অনেক নগ্ন চিত্র এঁকেছেন যা বীভৎস। ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ীর লেখাতেও কদর্যতা আছে।

প্রফেসর শর্মা একটু ভেবে বললেন : জৈনেন্দ্রকুমার এই যুগের আর একটি নাম। তাঁর উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়।

এর পর প্রফেসর শর্মা আর অনেক ক্ষণ কথা কইলেন না। যখন আমার মনে হল যে তিনি আর কিছু বলবেন না, তখন জিজ্ঞাসা করলুম : এ যুগের কথা কিছু বলবেন না?

এই যুগের কথা!

হ্যাঁ।

এ যুগের সাহিত্যের খবর এ যুগের লোকের কাছেই পেতে পারেন। আমরা পুরনো হয়ে গেছি।

বললুম : সাহিত্যের খবর একেবারেই রাখেন না, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

কিছু পড়ি এবং পড়ে আনন্দও পাই। কিছু বলতে ভয় পাই এই জন্যে যে পড়ার চেয়ে না পড়ার বহরই বেশি। ভালকে বাদ দিয়ে হয়তো মন্দর নামই করে বসব।

আমার তাতে ক্ষতি নেই।

তাহলে আপনাকে দু তিনটে নাম বলি। যশপাল, অজ্ঞেয় ও ইলাচাঁদ যোশী। ভগবতীচরণ শর্মাও আমার মতে শক্তিমান লেখক। যশপাল মার্কসবাদী, অজ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক, আর ইলাচাঁদ ফ্রয়েডের ভারে কাতর। ভগবতীচরণের একখানা উপন্যাসে তাঁকে কম্যুনিস্ট বিরোধী ও গান্ধীবাদী বলে মনে হয়েছে। এ যুগে আরও অনেক জনপ্রিয় লেখক আছেন, কিন্তু শ্রদ্ধা করবার মতো লেখক আমি দুজন পেয়েছি। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও রাহুল সংকৃত্যায়ন। যদি সম্ভব হয়, তাঁদের একখানি করে বই আপনি পড়ে দেখবেন।

বলুন।

দ্বিবেদীজীর বাণভট্ট কী আত্মকথা ও রাহুলজীর ভোল্‌গা সে গঙ্গা।

বললুম: ভোল্‌গা সে গঙ্গা আমি বাঙলায় পড়েছি। সমাজ-বিবর্তনের অপূর্ব চিত্র।

প্রফেসর শর্মা খুশী হয়ে বললেন: বাঙলায় অনুবাদ হয়েছে বুঝি।

হয়েছে। আরও অনেক হিন্দী বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। সে সবের নাম আমি জানি না।

প্রফেসর শর্মার বললেন: বাঙলার সাহিত্য এত উন্নত যে অনুবাদ পড়বার প্রয়োজন আপনাদের হয় না। হিন্দী সাহিত্য অনেক পিছনে পড়ে ছিল, কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করছে। এই দেখুন না, ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পে কত উন্নতি হয়েছে। নাটকও মন্দ লেখা হচ্ছে না। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে একাঙ্ক নাটকই বেশি। শুধু গদ্য সাহিত্য এখনও তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে অনেকেই হাত দিয়েছেন। সাহিত্যিকেরা পিছিয়ে নেই। নিরালা জয়শঙ্কর প্রসাদ সুমিত্রানন্দন ও অজ্ঞেয় গদ্য লিখছেন। আশা করা যায় এ দারিদ্র্য দূর হতে আর দেরি নেই।

মনোরঞ্জন এতক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। এইবারে বলে উঠল: বাঙলার কাছে ঋণের কথা কিছু বললেন না?

সে যে আমাদের আলোচনা শুনছিল, সে কথা বুঝতে পারি নি। প্রফেসর শর্মাও আশ্চর্য হলেন। বললেন: শুধু বাঙলা কেন, হিন্দী অনেকের কাছেই ঋণী।

আমি মনোরঞ্জনের দিকে তাকালুম।

মনোরঞ্জন বলল: কিছু দিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়োজনের কথা প্রথম প্রচার

করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন গত শতাব্দীতে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। পাঞ্জাবে নবীনচন্দ্র রায় প্রথম আন্দোলন করেন ও তাঁর কন্যা সুগৃহিণী নামে একটি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলকাতায় প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সমাচার সুধা বর্ষণ, তার সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন। বেনারস আখবার ও সুধাকর নামে যে দুখানি বিখ্যাত পত্রিকা বের হত, তার সম্পাদক ছিলেন তারামোহন মিত্র। এ সমস্তই গত শতাব্দীর কথা, হিন্দী সাহিত্যে ভারতেন্দুর যুগ তখনও শুরু হয় নি।

মনোরঞ্জন তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাকে শান্ত করবার জন্য বললুম: অনেক কথা মনে রেখেছ তো!

আজ বেহারের লোক বাঙালীকে শত্রু মনে করে কিনা, তাই এ সব মুখস্থ করে রেখেছি।

এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবুর কথা আমার মনে পড়ল। কিন্তু প্রফেসর শর্মা দুঃখিত হবেন বলে বললুম না। তিনি লিখেছিলেন, এক শো বছর আগে খড়িবোলি অর্থাৎ আধুনিক নমুনার হিন্দী গদ্যে কোন সাহিত্য ছিল না। এমন কি ১৯২৫ সন পর্যন্তও খড়িবোলি গদ্যে কোন সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন নেই। পঁচিশ ত্রিশ বছরের অর্বাচীন এই হিন্দী গদ্য এখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে।

এর পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা তা নেতারা জানেন। আমাদের সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

২৬

বাহিরে কখন সূর্যাস্ত হয়েছিল খেয়াল করি নি। বরাবাঁকিও পেরিয়ে এসেছি। এর পরেই লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য আমার খুবই কৌতূহল ছিল। কিন্তু শর্মাজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে আমার লজ্জা হল। সারা দুপুর তাঁকে অনেক বকিয়েছি, নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে তাঁকে জ্বালাতন কম করি নি। অধ্যাপক মানুষ বলেই তিনি এত কথা বলতে পেরেছেন, অন্য মানুষ হলে চুপ করে থাকতেন, কিংবা চটে উঠতেন।

পথে তিনি কিছু খান নি। চা খান না, কোন খাবারও না। অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়েছি মনে হয়েছে, তিনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন, পাঁচজনের হাতের ছোঁয়া খান না। কিছু বলতে না পেরে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলুম।

সহসা প্রফেসর শর্মা প্রশ্ন করলেন: লক্ষ্ণৌএ একবার নামবেন না?

মনোরঞ্জন উত্তর দিল: এখন তো অসম্ভব।

ফেরার পথে?

আমি উত্তর দিলুম: চেষ্টা করে দেখব।

প্রফেসর শর্মা বললেন: যদি নামেন তো গরিবের কুটীরে উঠবেন।

বলে নোটবুকের একটি পাতায় নিজের নাম ঠিকানা লিখে সেই পাতাটি ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সেই কাগজ পড়ে পকেটে রাখলুম।

প্রফেসর শর্মা বললেন: সাইকেল রিক্সয় চেপে বসলে দশ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন।

এইবারে সুযোগ পেলুম, বললুম: কী দেখাবেন আমাদের?

যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, টাঙ্গায় করে সবই দেখিয়ে দেব।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। তাই দেখে বললেন : লক্ষ্ণৌএর যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তা আপনাদের মানতেই হবে। গঙ্গার শাখা গোমতী, তারই তীরে বিস্তৃত শহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কেউ বলেন, রামায়ণের লক্ষ্মণ এই শহর পত্তন করেন। কেউ বলেন, জৌনপুরের মুসলমান শাসনকর্তার হুকুমে লখ্‌না নামে এক হিন্দু স্থপতি এই শহর তৈরি করেন। তাঁদের নামেই শহরের নাম। কিন্তু আজকের লক্ষ্ণৌ যে অযোধ্যার তৃতীয় নবাব আসফ-উদ্দৌলার কীর্তি, তাতে আর সন্দেহ নেই। তাঁর সব চেয়ে বড় কাজ হল গোমতী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বড় ইমামবরা। আসফ-উদ্দৌল্লা নবাব হবার ন বছর পরে কিয়ায়েৎ উল্লা নামে একজন স্থপতি এই ইমামবরা তৈরি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকের কথা।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল : ইমামবরা কী?

মহরমের উৎসব হয় এখানে, আলি ও তাঁর দুই পুত্র হাসান আর হোসেনের উৎসব। পঞ্চাশ ফুট উঁচু এর বড় ঘরটি, কিন্তু কোন থাম নেই। উপর থেকে লক্ষ্ণৌ শহরটা দেখে নিতে যেন ভুলবেন না।

এর পরে রুমি দরওয়াজা পেরিয়ে ছোট ইমামবরা। রুমি দরওয়াজাকে কেউ কেউ টারকিশ গেটও বলেন। এই ইমামবরা নবাব মুহম্মদ আলি শাহর আমলে তৈরি, সিপাহী বিদ্রোহের পনর ষোল বছর আগে। এর ভিতরের জাঁকজমক ভাল করে দেখে নেবেন, পাশের পুরনো প্রাসাদে দেখবেন নবাবদের ছবি।

নদীর ধারে ধারে যে পথ, তার উপর পুরনো রেসিডেন্সির ধ্বংসাবশেষ। এই বাড়ির আয়ু ছিল মাত্র সাতান্ন বছর। সিপাহীরা ইংরেজ মারতে গিয়ে বাড়িটাও ধ্বংস করেছিল। এখন এখানকার বাগানে ভাল গোলাপ ফোটে।

শহরের দিকে আর খানিকটা এগিয়ে কাইজার বাগ। পার্কের দু ধারে কয়েক সারি হলদে বাড়ি। নবাবের হারেম ছিল এক সময়ে। কাছেই নবাব শাহ আফৎ আলি খান ও তাঁর রূপবতী বেগম খুরশিদের সমাধি।

খুরশিদ মনজিলে আজকাল মেয়েদের লা মার্টিনিয়ার স্কুল বসেছে। ছেলেদের লা মার্টিনিয়ার কলেজ হল ক্যাণ্টনমেণ্টের কাছে। জেনারেল ক্লড মার্টিনের নাম লক্ষ্ণৌএর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে। ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এই ভদ্রলোক ভারতে এসেছিলেন তাঁর ভাগ্যান্বেষণে। কিছু দিন পরে ইংরেজের সেনাদলে তাঁকে দেখা গেল বিখ্যাত সেনাপতি রূপে। ভদ্রলোক শিল্পী ছিলেন, ব্যবসায় বুদ্ধিও তাঁর প্রখর ছিল। লক্ষ্ণৌ-এর এই সমস্ত প্রাসাদের পরিকল্পনা এক দিন তিনিই করেছিলেন। ভারতবর্ষকে যে তিনি ভালবেসেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌএর স্কুল ও কলেজ। তাঁর সারা জীবনের উপার্জন উজাড় করে দিয়েছেন তিনটি বিদ্যাপীঠের জন্য। তৃতীয়টি তাঁর জন্মস্থান লিয়ঁ শহরে।

ক্লড মার্টিনের গল্প আমাদের জানা ছিল না। শুনে বড় আশ্চর্য লাগল।

কিন্তু প্রফেসর শর্মা থামলেন না, বললেন: মেয়েদের স্কুলের কাছেই সাদা বড় গম্বুজওয়ালা শাহ নাজাফ নবাব গাজী উদ্‌দীন হাইদর ও তাঁর পত্নীর সমাধি। সোনা ও রুপোর তৈরি দুটো কবর।

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলুম যে লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে আর দেরি নেই। প্রফেসর শর্মা তাড়াতাড়ি বললেন: যে সব বাগানের জন্য লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধি আছে, তাও দেখিয়ে দেব। বানারসী বাগ এক সময় নবাবের প্রাসাদের অন্তর্গত ছিল। এখন চিড়িয়াখানা হয়েছে। জন্তু জানোয়ারকে এখানে স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর রাখা হয়েছে। চোখের সামনে গণ্ডার আর

বাঘ সিংহ স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইটুকুই এই চিড়িয়াখানার বিশেষত্ব।

দেখাব সিকান্দার বাগ, অযোধ্যার শেষ নবাব তাঁর বেগমের জন্য তৈরি করেছিলেন। আজ তাকে বটানিকাল গার্ডেনে পরিণত করা হয়েছে। দেখাব দিলখুশা। নবাবরা শিকার করতেন এখানে লক্ষ্ণৌবাসী আজ দিলখুশায় পিকনিক করছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় দেখাব, দেখাব মেয়েদের ইসাবেলা থোবর্ন কলেজ, ভাতখণ্ডের গানের স্কুল, আর্ট স্কুল, বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অব পলেবটানি, আর ছাত্তার মনজিলে সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল: বাজার দেখাবেন না?

দেখাব বইকি। হজরতগঞ্জ ও আমিনাবাদ দুটো বাজারই দেখাব। হোটেলে খাঁটি মোগলাই খানা খাওয়াব—বিরিয়ানি পোলাও, মুরগ মুসল্লম আর ককোরি কাবাব। তার পর বাড়ির জন্য চিকনের শাড়ি কিনে দেশে ফিরবেন।

বলে প্রফেসর শর্মা হাসলেন।

মনোরঞ্জন বলে উঠল: গোপালকে সেই আশীর্বাদ করুন। ওর যেন এইবারেই শাড়ি কেনবার দরকার হয়।

স্টেশনে এসে গাড়ি থামছিল। প্রফেসর শর্মা দাঁড়িয়ে বললেন: কানপুর আর লক্ষ্ণৌ, এ দুটোই নতুন স্টেশন, অবশ্য এখন পুরনো হয়ে গেছে। স্টেশন থেকে বেরবার সময় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখবেন। রাজস্থানী শৈলী আপনাদের ভাল লাগবে।

ভদ্রলোক নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্য তৈরি হলেন। হঠাৎ কী মনে হতেই টাইম টেবলখানা আমাকে দিলেন, বললেন: এখানা সঙ্গে রাখুন।

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম: না না, আমাদের দরকার হবে না।

প্রফেসর শর্মা হেসে বললেন : সঙ্গে থাকলেই কাজে লাগবে। আসি।

বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমিও তাঁর পিছনে এগিয়ে গেলুম। তিনি নামলে আমিও নেমে দাঁড়ালুম। শ্রদ্ধা জানিয়ে আনন্দ পেলুম অন্তরে। শ্রদ্ধারই পাত্র। শুধু দিয়ে গেলেন, নিলেন না কিছু। অতীতে গুরুশিষ্যের এই সম্বন্ধই ছিল।

মনোরঞ্জন আমাকে ডেকে বলল : তোমার টাইম টেবলটা একবার দেখ তো।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললুম : কী দেখব ?

বউদি বলছেন, ভর সন্ধ্যেয় খাওয়া উচিত নয়। এর পরে কোন খাবার জায়গা আছে ?

এ আমি আগেই দেখেছিলুম। বললুম : আছে। রাত নটায় হর্দৈ স্টেশনে খাবার পাওয়া যাবে।

মনোরঞ্জন পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করল : রাত নটা পর্যন্ত জাগতে পারবে তো ?

পাঁচু মাথা দুলিয়ে বলল : খুব পারব।

মিসেস মুখার্জি তারাপদবাবুকে কিছু বললেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন। তার পরেই ধরলেন একটা কলাওয়ালাকে। সবুজ রঙের সিঙ্গাপুরী কলা। তাই এক ডজন কিনে স্ত্রীর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলুম যে পাঁচুর জন্য কেনা হল। সে একটু পরে পাবে, আমরাও পেতে পারি।

মাটির খেলনা নিয়ে ফেরিওয়ালারা জানালার কাছে জুটেছে। নানা রকমের ফল, পাখি। কাগজের বাক্সে নানা জাতের সাধু পাশাপাশি সাজানো। আরও কত কী। দেখতে বেশ, দামও বেশি নয়। কিন্তু নিয়ে যাবার হাঙ্গামা। মিসেস মুখার্জি বললেন : না, না, এখন এ সব নয়। ফেরার পথে দেখব।

চল্লিশ মিনিট দাঁড়াবার পর ট্রেন ছাড়ল।

এর পর বালামৌ। বালামৌএর নামে আমার নৈমিষারণ্যের কথা মনে পড়ল। বালামৌ থেকে সিতাপুর লাইনে নৈমিষারণ্য ষোল মাইল দূরে। গোমতী নদীর তীরে অতি প্রাচীন তীর্থ। রামায়ণে এর উল্লেখ আছে। ষাট হাজার মুনির বাস বলে এই অরণ্য প্রসিদ্ধ ছিল।

সাড়ে চার হাজার বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেশ ছারখার হয়ে গেছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ শেষ হয়েছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেখানে নিজে কথাবৃত্তি কবেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পঞ্চম শিষ্য রোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবা। তার পর কুলপতি শৌনক এই নৈমিষাবণ্যে যজ্ঞ করলেন। ষাট হাজার মুনি ঋষি এসে একত্র হলেন। পুবাণের আলোচনা হচ্ছে, তাতে সভাপতিত্ব করছেন রোমহর্ষণ। এমন অদ্ভুত ভাবে তিনি পুবাণের গল্প বলতে পারতেন যে তা শুনে শ্রোতাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। সেইজন্যেই তাঁব নাম হয়েছিল বোমহর্ষণ।

সে দিন আষাঢ়েব শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি। দশখানি পুরাণ পাঠ শেষ করে রোমহর্ষণ একাদশ পুরাণ শুরু করেছেন। এমন সময় তীর্থযাত্রী বলরাম এসে সভায় উপস্থিত হলেন। সমবেত ব্রাহ্মণরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু রোমহর্ষণ তাঁর সভাপতির আসন পরিত্যাগ করে বলরামকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। বলরাম ক্রুদ্ধ হলেন, সূতপুত্রের এত বড় স্পর্ধা!

রোমহর্ষণ প্রতিলোম বিবাহের সন্তান। তাঁর ক্ষত্রিয় পিতা, মা ব্রাহ্মণ। বলরাম এই কারণেই বললেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সম্মান দিতে পারলেন, আর এত অহঙ্কার একজন সূতপুত্রের! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলরাম তাঁকে হত্যা করলেন।

তারপর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ল সৌতি উগ্রশ্রবার উপর।

বাকি সাড়ে সাতখানি পুরাণ পিতার উপযুক্ত পুত্র উগ্রশ্রবা আবৃত্তি করে শোনালেন।

নৈমিষারণ্যে এখন অরণ্য আছে কিনা জানি না। তবে একখানা বাঙলা বইএ এই তীর্থের কথা কিছু পড়েছি। নৈমিষারণ্যকে এখন নিমসর বা নিমখার বলে। এই নাম কেন হয়েছিল তা পড়েছি। ব্রহ্মা এক মণিময় নেমি বা চক্র নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই চক্র পৃথিবী পরিক্রমা করে এইখানে এসে ভাঙল। সঙ্গে ছিলেন মুনি ঋষি ও তীর্থ। তাঁরাও এখানে থামলেন। কেউ বলেন, দানব সেনা এখানে এক নিমিষে ধ্বংস হয়েছিল।

নিমসরে আসতে হয় ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষে। তখন এখানে পরিক্রমা মেলা, নানা স্থান ঘুরে সেই মেলা আসবে মিশ্রিকে। মিশ্রিকের দধীচি কুণ্ড ও হত্যাহরণ তীর্থ সকলে দেখে। অসুর বধের জন্য ইন্দ্রের নতুন অস্ত্র চাই। বজ্র তৈরি হবে। দেবতারা দধীচির হাড় প্রার্থনা করলেন। ঋষি এই দধীচি কুণ্ডে স্নান করে ইন্দ্রকে তাঁর দেহ দান করেছিলেন। রাবণ বধ করে রামের ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল। তাঁর সেই পাপ স্খালন হয় হত্যাহরণ তীর্থে স্নান করে।

নিমসরেও অনেক তীর্থ আছে। চক্রতীর্থ, ললিতা দেবীর মন্দির। চক্রতীর্থ চতুষ্কোণ সরোবর নয়, এর ছটি কোণ। চারি দিকে ছোট বড় আরও অনেক তীর্থ ও মন্দির আছে। রাত্রিবাসের জন্য ধর্মশালাও আছে। যাঁদের সময় কম, তাঁরা এক ট্রেনে নেমে আর এক ট্রেনে ফিরে আসেন। আমরা নৈমিষারণ্যে যাব না।

২৭

সকাল সাড়ে ছটার একটু পরে আমরা হরিদ্বারে এসে নামলুম। এক ঘণ্টা আগে লক্সরে আমাদের গাড়ি বদল করতে হয় নি, পাঞ্জাব মেল কিংবা অন্য গাড়িতে এলে নামতে হত। সে সব ট্রেন অমৃতসর যায়। দূন এক্সপ্রেস হরিদ্বারের উপর দিয়ে দেরাদুন যাবে। আমরা হরিদ্বারে নেমে একটা ধর্মশালায় গিয়ে উঠলুম।

স্টেশনের বাহিরে ভাল রিটায়ারিং রুম ছিল। মনোরঞ্জন সে দিকে তাকাতেও দিল না। বলল: মামার সঙ্গে এলে ও সবের খোঁজ ক'রো।

আমি আশ্চর্য হলুম যে মামার সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। মনে হল যে এই ব্যাপারে তাঁদের অনেক কিছু জানা আছে। জানা থাকাই মঙ্গল।

ধর্মশালায় পৌঁছে সাবিত্রী মনোরঞ্জনকে চেপে ধরল। বলল: কোন্ দেবতার জন্যে হরিদ্বার এত বড় তীর্থ।

মনোরঞ্জন বলল: হরিদ্বার নাম থেকেই তো বোঝা যায় হরির দ্বার।

এখানকার লোকেরা হরিদ্বার বলছে না, বলছে হরদোয়ার, মানে হরের দ্বার।

এ দেশের উচ্চারণই অমনি, হরিদ্বার না বলে হরদ্বার বলছে।

সাবিত্রী মানল না, বলল: হরির সঙ্গে গঙ্গার কী সম্বন্ধ! শিবই তো গঙ্গাকে তাঁর জটায় ধারণ করেছিলেন।

তারাপদবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন: সত্যিই একটু গোলমেলে ব্যাপার।

মনোরঞ্জন আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : হরিদ্বার হরদ্বার দুটোই ঠিক।

কী রকম!

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে গঙ্গা বিষ্ণুর স্ত্রী। সরস্বতী তাঁর সতীন। দুজনে বিবাদ করে দুজনের শাপে দুজনেই পৃথিবীতে নদী রূপে প্রবাহিতা। আবার এই গঙ্গাই যখন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করছিলেন, তখন রাজা ভগীরথ তাঁকে পৃথিবীতে আনবার জন্যে তপস্যা করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ অযোধ্যাপতি সগরের ষাট হাজার পুত্র পাতালে কপিল মুনির শাপে ভস্ম হয়ে আছেন। গঙ্গা বললেন, আমি নামব, কিন্তু পৃথিবীতে আমাকে ধারণ করবে কে? শিব। আকাশ থেকে গঙ্গা শিবের জটার ভিতরে নামলেন। কাজেই হরিদ্বার বললেও ঠিক, হরদোয়ার বললেও ঠিক। বৈষ্ণব ও শৈবরা এখন ঝগড়া করছেন, আগে করতেন না।

কেন?

তখন নাম ছিল গঙ্গাদ্বার। স্কন্দপুরাণে আছে :

গঙ্গাদ্বারসমং তীর্থং ন কৈলাসসমো গিরিঃ।
বাসুদেবসমো দেবো ন গঙ্গাসদৃশং পরম্॥

সাবিত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল বিহ্বল ভাবে।

বললুম : মানে বুঝেছ?

ভয়ে ভয়ে সে উত্তর দিল : না।

হেসে বললুম : গঙ্গাদ্বারের মতো কোন তীর্থ নেই, আর কৈলাসের মতো পর্বত। বাসুদেবের মতো দেবতা নেই, আর গঙ্গার মতো নদী।

মনোরঞ্জন বলে উঠল : তাহলেই দেখ, বাসুদেব হরির কথা এসে পড়ল।

বললুম : তার পরের শ্লোকটি শুনলে আর এ কথা বলবে না।

সাবিত্রী বলল : বলুন না সেটা।

বললুম : যে এই গঙ্গার ধারে পনর দিন শিবের চিন্তা করে,

সে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এর বেশি আর কী বলব।

সাবিত্রী হাতে তালি দিয়ে উঠল : কাকাবাবু হেরে গেছেন।

কিন্তু মনোরঞ্জন হারবার পাত্র নয়! হর কী পৌড়িতে স্নান করতে গিয়ে কার কাছে শুনল যে এই ঘাটের দেওয়ালে একখানা পাথরের উপর বিষ্ণুর পায়ের ছাপ আছে। আর যায় কোথা সাবিত্রীকে ডেকে বলল : দেখ এইবারে কার হার।

সাবিত্রীও হারবার মেয়ে নয়। করুণ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : হেরে যাচ্ছি যে গোপালদা।

বললুম : এই ঘাটের নাম কী জিজ্ঞেস কর।

এর নাম তো হর কী পৌড়ি।

তাব মানে শিবেব ধাপ

সাবিত্রী চেঁচিযে উঠল : হেরে গেছেন, কাকাবাবু হেরে গেছেন।

আমি ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে হর কী পৌড়িব রূপ দেখছিলুম। হিমালয় থেকে নেমে গঙ্গা সমতল ভূমির উপব দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাম তীরে হিমালয়, দক্ষিণে হরিদ্বাব। দক্ষিণেও পাহাড় আছে। তার নাম শিবালিক। রাস্তার ধার থেকেই এই পাহাড় ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে গেছে। মাথায় যে মন্দির দেখা যাচ্ছে তা মনসা দেবীর। স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছিলুম যে এই মন্দির প্রায় নশো বছরের পুরনো। যাত্রীরা উপরে উঠে প্রতিমার তিন মাথা ও পাঁচ হাত দেখে আশ্চর্য হয়। পাশে দেবী অষ্টভুজা ও তাঁর ভৈরবের মন্দিরও দেখে। যারা বেশি সমর্থ, তারা পিছনে প্রায় আধ মাইল নেমে সূর্যকুণ্ড দেখে।

স্টেশন থেকে যে রাস্তা এসেছে তা এই হর কী পৌড়ির পাশ দিয়ে হৃষীকেশ গেছে। এই পথের উপরেই রিক্স থেকে নামতে হয়। তার পরে হেঁটে গঙ্গার ঘাট। এই ঘাট অনেক দূর পর্যন্ত বাঁধানো। হর কী পৌড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে যত দূর দেখা যায় সবটাই বাঁধানো।

পারের উপর বড় বড় বাড়ি ধর্মশালা গায়ে গায়ে লেগে আছে। বেনারসের ঘাটের মতো একটার পর আর একটা ঘাট নয়। এ যেন একটাই ঘাট। শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

হর কী পৌড়ির অবস্থান বড বিচিত্র। চা'র দিক বাঁধানো একটি জলাশয়ের মতো মনে হবে। গঙ্গার ধারা এক ধার দিয়ে প্রবেশ করে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মূল গঙ্গা ও হর কী পৌড়ির মাঝখানে প্রশস্ত ঘাট তীরের বাঁধানো ঘাটের সঙ্গে পুল দিয়ে যুক্ত। এরই এক পাশে একটি উঁচু ঘণ্টাঘর, আর দুটি পাথরের মূর্তি। এই পবিত্র পরিবেশে নেতাজীর মূর্তি দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।

হর কী পৌডির মাঝখানটিকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। পুণ্যার্থীরা এই কুণ্ডে স্নান করেন, ঘাটে বসে সাধন ভজন করেন। ঘাটের উপরই গঙ্গা গায়ত্রী রামচন্দ্র বদরীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কুণ্ডের জলের মধ্যে যে গোলাকার মন্দির, তা মহারাজ মানসিংহের ছত্রী। আকবর বাদশাহ তাঁর আজীবনের বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহের অস্থি এইখানে বিসর্জন দিয়ে এই স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

হর কী পৌড়ির ঘাটে আমরা স্নান করলুম। পুরুষরা এক দিকে, মেয়েরা অন্য দিকে। তাদের জন্য ঘাটের কিয়দংশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পঁচিশ বছর আগে যাঁরা এই ঘাটে স্নান করে গেছেন, আজ তাঁরা এই স্থান চিনতে পারবেন না। এই ঘাটের উপরেও বড় বড় বাড়ি ছিল। সরকার নাকি সাত আট লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ দিয়ে সেই বাড়িগুলো ভেঙে এই ঘাট নূতন করে গড়েছেন। অতীতে এই অপ্রশস্ত ঘাটে কুম্ভ যোগ ও বৈশাখী মেলায় বহু লোকের প্রাণনাশ হত। বর্তমান ব্যবস্থা দেখে সবাই খুশী হবেন।

সন্ধ্যা বেলায় আমরা গঙ্গার আরতি দেখতে এই ঘাটে এসেছিলুম। তখনও সূর্যাস্ত হতে কিছু দেরি ছিল। যাত্রীরা একে একে এসে জমা হচ্ছিলেন। ছোট ছেলেদের কাছ থেকে ময়দার গুলি কিনে মাছকে খাওয়াচ্ছিলেন। বড় বড় মাছ একেবারে সিঁড়ির কাছে

এসে ময়দা খাচ্ছে, আর লেজের ঝাপটায় জল তোলপাড় করছে। পাঁচু বলল : ভারি মজা তো, আমরাও মাছকে খাওয়াব।

খানিকটা এগিয়ে সাবিত্রী চেঁচিয়ে উঠল : গোপালদা, ঘুগ্‌নি।

টিনের চোঙ দেখে পাঁচু লাফিয়ে উঠল : এগুলো কী গোপালদা?

আমি বললুম : কুল্‌ফি।

ঘুগনির সামনে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে গেছে, আর পাঁচু কুল্‌ফির সামনে। তারাপদবাবু স্ত্রীর দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন : এ সব খেলে যে অসুখ করবে—একেবারে খোলা—

মনোরঞ্জন বলল : কী আর হবে! দাও এক একটা।

সাবিত্রী আর আমি ঘুগনি নিলুম, আর সবাই নিলেন কুল্‌ফি।

কুল্‌ফি খেয়ে মিসেস মুখার্জি বললেন : মুখটা মিষ্টি হয়ে গেল। বলে তাকালেন মেয়ের দিকে।

মনোরঞ্জন বলল : এবারে একটা ঘুগনি নিন না।

সাবিত্রী বলল : আমরা কুল্‌ফি পাব না কাকাবাবু?

আমি বললুম : পেতেই হবে।

এক জায়গায় এক দল ছেলেমেয়ে পড়ছিল। এক মাস্টার তাদের পড়াচ্ছিলেন। কথকতা হচ্ছিল আর এক জায়গায়, স্থির হয়ে কিছু লোক শুনছে। কখন যে সূর্যাস্ত হয়েছে আমরা খেয়াল করি নি। তাড়াতাড়ি অন্ধকার হচ্ছিল। আমরা ফিরে এসে হর কী পৌড়ির সিঁড়িতে বসলুম, জুতো নিয়ে ঘাটে নামতে মানা বলে আমরা উল্টো দিকে জায়গা পেলুম।

পাঁচু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : দিদি, দেখ দেখ।

যাত্রীরা পাতার ডালায় দীপ জ্বেলে জ্বেলে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। অস্বচ্ছ আলোয় আমরা যাত্রীদের ভাল দেখতে পাচ্ছি নে, শুধু দীপের শিখা দেখছি জলের উপর, স্রোতের টানে ভেসে ভেসে গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য

দীপ। মানুষের আকাঙ্ক্ষার যেমন শেষ নেই, তেমনি এক একটি বাসনার জন্য এক একটি দীপ জ্বেলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্য আর কোথায় দেখেছি, সহসা মনে পড়ল না।

অন্ধকার আরও গভীর হলে আরতি শুরু হল। গঙ্গার আরতি। ব্রাহ্মণেরা ধূপ দীপ কর্পূর নিয়ে আরতি শুরু করলেন। কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে চারি দিক মুখর হল। সমস্ত যাত্রীরা স্তব্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। আলো, আরও আলো। ব্রাহ্মণদের হাতের আলোয় যেন আগুন লেগেছে। জলের উপর তার প্রতিবিম্ব দুলে উঠল। অপূর্ব দৃশ্য, এ দৃশ্যের যেন তুলনা নেই। বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়ে গেলুম। যখন সেই আলো নিবল, তখন আমাদের সম্বিৎ এল ফিরে।

সমস্ত হরিদ্বারে আমরা এমন দৃশ্য আর দেখিনি।

দুপুর বেলায় আমরা শহর দেখতে বেরিয়েছিলুম। তিনখানা রিক্স ভাড়া করে প্রথমে গিয়েছিলুম কন্‌খলে। মাইল দুই দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এই পবিত্র স্থান। প্রবাদ আছে যে দক্ষ প্রজাপতির বাসস্থান ছিল এইখানে। বিখ্যাত দক্ষযজ্ঞ এইখানেই হয়েছিল। সেই যজ্ঞের কথা কার না জানা আছে। শিব তাঁর শ্বশুর দক্ষকে অপমান করেছিলেন। অপমান নয়, সম্মান করেন নি। বিশ্বস্রষ্টার যজ্ঞে তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আসুন আসুন। শিব নির্বিকার ভাবে বসে ছিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর সঙ্গে। এই রাগ। তাই নিজের যজ্ঞে জামাইকে নিমন্ত্রণ করলেন না। এত বড় যজ্ঞ. স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সবাই নিমন্ত্রিত। নারদের মুখে খবর পেয়ে সতী বললেন, আমিও যাব। কিন্তু নিমন্ত্রণ কোথায়! বাপের বাড়ি যাব, তার জন্যে আবার নিমন্ত্রণের কী দরকার! শিব বললেন, দরকার আছে। সতী যাবেনই, আবার স্বামীর মত নিয়েই যাবেন। তাই একে একে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করতে

লাগলেন। শিব ভয় পেলেন। দু চোখ ঢেকে বললেন, আর নয়, তুমি যাও।

সেই সতী বাপের বাড়ি এসে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এ ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। তাঁর স্বামী বাঘছালপরা জটাজূটধারী সন্ন্যাসী, গলায় সাপ জড়িয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। তাই বলে স্বামীর নিন্দা স্ত্রী হয়ে শুনতে হবে। সতীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল কৈলাসে শিবের কাছে। নারদই এই সংবাদ দিয়ে এলেন। শিব ক্ষেপে উঠলেন, তাঁর ক্রোধ থেকে বীরভদ্রের জন্ম হল। সেই বীরভদ্র এই কনখলে এসে দক্ষের মাথা কেটে যজ্ঞ পণ্ড করলেন।

শিবের ক্রোধ কমল, তিনি ছাগমুণ্ড দিয়ে দক্ষের প্রাণ দিলেন। তার পর শোকে অধীর হয়ে সতীর দেহ কাঁধে করে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। বিষ্ণু এসে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। দেহের এক এক অংশ এক এক জাঁয়গায় পড়ে এক একটি পীঠস্থান হল। হরিদ্বার কোন পীঠস্থান নয়, সতীর দেহের কোন অংশ এখানে পড়ে নি। মতান্তরে এখানে সতীর জঠর পড়েছিল। দেবী ভৈরবী, ভৈরব বক্র।

কনখলে এখন দক্ষের একটি মন্দির আছে। গঙ্গার ধারে ছায়া-শীতল পরিবেশের মধ্যে এই মন্দিরে দক্ষেশ্বর মহাদেবও আছেন। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এখানে মেলা বসে।

কনখলের আর এক ধারে একটি কুণ্ড আছে। তার নাম সতীকুণ্ড। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েই সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। ধর্ম বিশ্বাসের কথা। বুকে এই বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে।

এখান থেকে আমরা গুরুকুল কাংড়ী দেখতে গিয়েছিলুম। এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০২ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার এটি অনুমোদন করেছেন।

স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে গুরুকুল কাংড়ী একটি দ্রষ্টব্য স্থান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলি অট্টালিকা। শুনলুম, এখানে প্রধান কলেজ মাত্র চারটি। তাদের নাম আদর্শ কলেজ বেদবিদ্যালয় আয়ুর্বেদ কলেজ ও কন্যাগুরুকুল। ছোটখাট একটি যাদুঘরও আছে। ছয় থেকে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকদের এখানে ভর্তি করা হয়। চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থেকে এরা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করে। এখন শুধু বেদবেদান্ত নয়, পাশ্চাত্য দর্শন রাজনীতি ও অর্থনীতিও শেখানো হচ্ছে।

যাতায়াতের পথে আমরা মায়াপুর দেখেছিলুম। হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন স্থান। কিছু ধ্বংসাবশেষ নাকি এখনও আছে। লোকে বলে তা পৌরাণিক যুগের রাজা বেণের জীর্ণ দুর্গের চিহ্ন। মায়াপুরে এখন গঙ্গার উপরে নূতন বাঁধ হয়েছে। লোকে তার উপর হাওয়া খেতে যায়, জীর্ণ দুর্গ আর দেখতে যায় না।

এই মায়াপুর দেখে আমার একটি অনেক দিনের কৌতূহল নিবৃত্তি হল। দক্ষিণ ভারতের তীর্থ দর্শনের সময় একটি শ্লোক শুনেছিলুম—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।

এই মায়া কোন্ মোক্ষদায়িকা তীর্থের নাম তা জানা ছিল না। প্রফেসর শর্মা বলেছিলেন, মায়া হরিদ্বারের নাম। এখন আর সন্দেহ রইল না যে হরিদ্বারই এই শ্লোকের মায়া বা মায়াপুর। পুরাকালে যে এটি সমৃদ্ধ শহর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মায়াদেবীর মন্দিরের গায়ে যে শিলালিপি আছে, তাতে জানা যায় যে মন্দিরটি দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীর। তার আগেরও অনেক মুদ্রা মাটির নিচে পাওয়া গেছে। একটি বুদ্ধ মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউএন চাঙ যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এই জায়গার নাম ছিল মায়াপুর। তিনি বলেছিলেন মো-য়ু-লো।

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের স্থান স্টেশন রোডের কাছেই। একটি ছায়াঘন পরিবেশে বেলগাছের নিচে এই শিবের মন্দির।

হর কী পৌড়ির দক্ষিণে আর একটি তীর্থ আছে, তার নাম কুশাবর্ত তীর্থ। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ শোনা যায়। ঋষি দত্তাত্রেয় এইখানে গঙ্গার তীরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দশ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। এক সময়ে গঙ্গা স্ফীতা হয়ে ঋষির দণ্ড বস্ত্র ও কুশ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋষির তপস্যার প্রভাবে ব্যর্থ হন। সেই জিনিসগুলি গঙ্গার জলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা এসে বাধা দেন। ঋষি বললেন, যদি তোমরা এই তীর্থে সারাক্ষণ বিরাজ কর, তাহলেই আমি অভিশাপ দেব না। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। সেই থেকে এই স্থানের নাম হল কুশাবর্ত তীর্থ।

শ্রমণনাথ মহাদেবের মন্দির এই তীর্থেরই নিকটে। মহাদেবের মূর্তি পঞ্চমুখ। শঙ্খ পাথরের বিরাট নন্দীশ্বর মূর্তি। শ্রমণনাথ এক সাধুর নাম। তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁর নামেই মহাদেবের নাম। এই সাধুর নামেও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার নাকি তিনি ভাণ্ডারা করেন। সন্ন্যাসী অতিথিরা আহার করবে। বিরাট আয়োজনে ঘি কম পড়ে গেল। শিষ্যদের মাথায় বজ্রাঘাত। স্বামীজীকে বলতেই তিনি বললেন, গঙ্গার কাছে চেয়ে নাও। কী আশ্চর্য ব্যাপার। শিষ্যরা গঙ্গার তীরে পৌঁছতেই আকাশবাণী হল, টিন ভর্তি করে নাও। গঙ্গার জল থেকে ঘি হল।

গঙ্গার অপর পারে নীল পর্বত। এই নাম কেন হল, তারও একটি কাহিনী আছে। অবন্তিকাপুরের এক ব্রাহ্মণের নাম অশ্বচিত্র। কঠিন দারিদ্র্যের জন্য সে চুরি করতে শুরু করে। এক দিন সে চুরি করবার জন্য মায়াপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু

এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হল, আধ্যাত্মিক ভাবে মন তার ভরে গেল। তারপর এই পাহাড়ে উঠে সে মহাদেবের চিন্তায় মগ্ন হল। অনাহারে অনিদ্রায় কাটল সাত দিন সাত রাত। শেষ পর্যন্ত মহাদেব তাকে দর্শন দিলেন। নীলকণ্ঠ মহাদেব। বর দিলেন যে তার নামে এই পর্বতের নাম নীল পর্বত হবে, আর অশ্বচিত্রের নামও এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে।

দুই মাইল দূরে এই পাহাড়ের উপরে আমরা উঠি নি। সাত আট মাইল দূরে গঙ্গার ধারে আর একটি পাহাড়ের উপর চণ্ডী দেবীর মন্দির। সেখানেও আমরা যাই নি। ভীমগোড়া ও সপ্ত সরোবর হৃষীকেশ থেকে ফেরার পথে দেখব বলে স্থির করা হয়েছিল। ভীমগোড়ার কুণ্ড ও মন্দির হর কী পৌড়ির খুবই নিকটে। খানিকটা দূরে সপ্ত সরোবর। গঙ্গা এখানে সাত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার মিলিত হয়েছেন। পুরাকালে সপ্ত ঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের নামে ভীমগোড়া নাম। ভগীরথ যখন স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনলেন, তখন গঙ্গাকে পথ দেখাবার জন্য ভীম এখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরই ঘোড়ার খুরে এই কুণ্ড তৈরী হয়েছে।

গঙ্গার নামে আমার কপিল মুনির নাম মনে পড়ল। কোন সময় এই স্থানেরই কপিলা নাম ছিল। এখন শুধু কপিলস্থান আছে।

গঙ্গার আরতি দেখে ধর্মশালায় ফেরার পথে সাবিত্রীকে আমি বললুম: তাহলে এই শহরের নাম কী সাব্যস্ত হল—হরিদ্বার, না হরদ্বার?

সাবিত্রী বলল: হরদ্বার।

মনোরঞ্জন বলল: হরিদ্বার।

পাঁচু বলল: আমি বলব গোপালদা?

বল।

গঙ্গাদ্বার।

তারাপদবাবু বললেন: পাঁচুই ঠিক বলেছে। এখানে হরিও নয়, হরও নয়, এখানে গঙ্গা। গঙ্গার চেয়ে বড় এখানে কিছু নেই।

ভীষ্মের পিতামহ রাজা প্রতীপের কথা আমার মনে পড়ল। এই গঙ্গাদ্বারে তিনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন তখন গঙ্গা মোহিনী কন্যা রূপে এসে তাঁর দক্ষিণ উরুতে বসেছিলেন। অভিশপ্ত অষ্ট বসুকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে মা হতে হবে, তাই তিনি রাজার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। গঙ্গাকে প্রতীপ যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা অতি অপূর্ব। তিনি বললেন, বরাঙ্গনে, তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসেছ। এই উরু সন্তানের জন্য, পুত্রবধূর জন্যও। প্রিয়ার জন্য পুরুষের বাম উরু। তুমি সেখানে বস নি। আমি তোমার দিকে প্রেমিকের চোখে তাকাব না। তোমাকে আমার পুত্রবধূ হবার জন্য অনুরোধ করব।

ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীর সাক্ষাৎ হয়েছিল এই গঙ্গাদ্বারে। সিক্তবসনা অপ্সরাকে দেখে ঋষির চিত্তবিভ্রম ঘটেছিল। জন্ম হয়েছিল পাণ্ডব ও কৌরবের গুরু দ্রোণাচার্যের।

তারপর অর্জুনের কথা। এই গঙ্গাদ্বারে তীর্থ করতে এসেই তিনি নাগরাজকন্যা উলূপীর কাছে বাঁধা পড়েছিলেন। এক দিন যখন তিনি গঙ্গাস্নান করছিলেন, তখন উলূপী তাঁকে টেনে নিয়ে চলে যান। দীর্ঘ দিন অর্জুন নাগরাজের প্রাসাদে ছিলেন। উলূপীকে বিবাহ করে সংসার করেন। তার পর এইখানে আবার ফিরে আসেন। ব্রহ্মচারী অর্জুনের সঙ্গে উলূপীর কথোপকথন আমার মনে পড়ল। কিন্তু মিসেস মুখার্জির মনে পড়ল অন্য কথা। তিনি বললেন: হরিদ্বার বলতে আমরা কুম্ভমেলা বুঝি।

কথাটা মিথ্যা নয়। এখানে কোন দেবতাকে নিয়ে উৎসব হয়

না। উৎসব হয় কুম্ভ যোগের। কুম্ভের কথা জানতে হলে পুরাণের কথা জানতে হয়। অমৃত মন্থনের কথা।

সমুদ্রের নিচে অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেবাসুরের যুদ্ধ সাময়িক ভাবে বন্ধ হল। বিষ্ণু হলেন কূর্ম। মন্দার পর্বত তাঁর পিঠে স্থাপিত হল, বাসুকি হলেন রজ্জু। অসুরেরা মুখের দিকে ও দেবতারা লেজের দিকে ধরলেন সমুদ্র মন্থন শুরু হল। প্রথমে লক্ষ্মী উঠলেন। রূপমুগ্ধ দেবাসুর বললেন, কে এই দেবী? বিষ্ণু বললেন, ইনি ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি, আমার মায়া প্রিয়া অনন্তা। সমস্ত জগৎকে ধারণ করে আছেন। সুতরাং ভাগাভাগির প্রশ্ন নেই। তারপর উঠলেন উর্বশী, তিনি হলেন ইন্দ্রসভার সুন্দরী। উঠল ঐরাবত, দেবরাজ ইন্দ্র তা পেলেন। পারিজাতও গেল স্বর্গের নন্দন কাননে। অসুরদের ভাগে কিছু পড়ছে না, তবু খাটছে অমৃতের জন্য। শেষ পর্যন্ত সেই অমৃত উঠল, চতুর্দশ সামগ্রী। একটু আধটু নয়, পূর্ণ কুম্ভ অমৃত। দেবাসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই অমৃত খেয়ে অমর হতে চান। ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত সেই কুম্ভ নিয়ে পালালেন। পিছনে অসুর। বার দিন তাঁরা হাত বদল করে অমৃত রক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত অসুরদের পরাস্ত করে দেবতারা অমৃত খেলেন চেটে পুটে। কিন্তু মর্ত্যের ভাগ্যে ছিল চার ফোঁটা। কুম্ভ নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় ভারতের চার জায়গায় সেই অমৃত পড়েছিল—হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ও উজ্জয়িনীতে। দেবতাদের বারো দিন পৃথিবীর বারো বছর। তাই বারো বছর পর পর এই সব স্থানে কুম্ভ যোগ হয়। ১৯৬২ সালে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা হয়েছে, তারপর হবে ১৯৭৪ সালে।

শুনেছি সে এক অদ্ভুত যোগ। এদেশে যে এত সাধু সন্ন্যাসী আছেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে কত শত সম্প্রদায়ের সাধু এসে এখানে সমবেত হন গঙ্গায় কুম্ভ স্নানের জন্য। শঙ্করাচার্য এই সাধুদের শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন।

তাঁদের নাম সরস্বতী পুরী বন তীর্থ গিরি পর্বত ভারতী অরণ্য আশ্রম ও সাগর। কুম্ভ যোগে অনেক যাত্রী এই সাধুর সাক্ষাতে আসেন। নগ্ন ও চীরপরিহিত সাধুরা শোভাযাত্রা করে চলেন সকলের আগে। নানা সম্প্রদায়ের সাধু ও সজ্জন। সকলের শেষে সাধারণ যাত্রী। ধীরে ধীরে সেই বিরাট শোভাযাত্রা গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছয়। কুম্ভ যোগে স্নান করেন গঙ্গার জলে, তারপর অন্য পথে ফিরে যান। এই মাহাত্ম্যই হরিদ্বারের মাহাত্ম্য, গঙ্গার মাহাত্ম্য, গঙ্গাই হরিদ্বারের একমাত্র দেবতা। আমরা তাই গঙ্গার আরতি দেখি।

আমার সামনের দিগন্ত এখনও আগুনে লাল হয়ে আছে।

২৮

পর দিন সকলেই আমরা হৃষীকেশ যাত্রা করলুম। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ পর্যন্ত শাখা লাইন ট্রেন আছে, কিন্তু আমরা ট্রেনে গেলুম না। শহর থেকে বাস চলে। সময়ের কোন ঠিক নেই। যাত্রী ভরলেই এক একখানা বাস ছাড়ে। চোদ্দ মাইল পথ ট্রেনে যাবার যেমন আরাম আছে তেমনি শহরের মধ্য দিয়ে বাসে যাবারও একটা আনন্দ আছে। পথে সাত মাইলে সত্যনারায়ণের মন্দির আছে, সেখানে বাস দাঁড়ায়। হৃষীকেশের বাজারে না থেমে লছমনঝুলার পুল পর্যন্ত নিয়ে যায়। ট্রেনে এসে স্টেশনে নামলে এই পথটুকুর জন্য টাঙ্গা ভাড়া করতে হয়।

বাস স্ট্যাণ্ডে বই বিক্রি হচ্ছিল। হরিদ্বার হৃষীকেশ ও শ্রীবদরী-কেদার যাত্রা, প্রকাশক ভাই হরনাম সিংহ সোহন সিংহ। সোহন সিংহের বদলে মোহন সিংহও লেখা হয়েছে কোন কোন স্থলে। বাঙলা বই, হরিদ্বারেই ছাপা। আমি একখানি অভিনব সংস্করণ কিনে বাসে উঠলুম।

মনোরঞ্জন আমার এই বই কেনা দেখে কটাক্ষ করল।

জিজ্ঞাসা করলুম: ওর মানে?

সুবিধে হল।

কিসের সুবিধে?

বইখানা টুকে দিলেই অনেক পাতা ভরবে।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। বইএর শেষে যে মানচিত্র ছিল তাই খুলে বসলুম।

ভাল করে এই মানচিত্র দেখলে হিমালয়ের এই অংশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। হরিদ্বার থেকে একটি পথ এসেছে হৃষীকেশে। এই পথ লছমনঝুলার ঝোলানো পুল পেরিয়ে

দেব-প্রয়াগের দিকে গেছে। লছমনঝুলা থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার এ পার দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ। অপর পার দিয়ে মোটরের রাস্তা আছে হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ, ভাগীরথী ও অলকনন্দা পেরিয়ে কীর্তিনগর।

কোটদ্বার থেকে একটা পথ শ্রীনগরে মিশেছে। অলকনন্দার এক দিকে শ্রীনগর, অন্য দিকে কীর্তিনগর। আরও খানিকটা এগিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। সেখান থেকে কেদারনাথের পথ বাম হাতে। এই পথের ধারে গুপ্ত কাশী ও ত্রিযুগী নারায়ণ, পথের শেষে কেদারনাথ।

কেদারনাথ থেকে বদরীনাথের দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু সরাসরি যাবার কোন পথ নেই। পাহাড় ডিঙোনো খুব সহজ কথা নয়। তাই কেদারনাথ থেকে আবার একই পথে ফিরতে হয়। উখী মঠ তুঙ্গনাথ হয়ে চামোলি পর্যন্ত হাঁটা পথ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যে পথ সোজা বদরীনাথ গেছে সেই পথের উপরেই চামোলি। কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ থাকে পিছনে। সামনে যোশীমঠ বিষ্ণুপ্রয়াগ ও বদরীনাথ।

মনোরঞ্জন বলল: অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ?

সংক্ষেপে বললুম: তীর্থের পথ।

যোশীমঠ থেকে মানস সরোবর ও কৈলাস যাওয়া যায়। একটা পথ জ্ঞানিমা মণ্ডি তীর্থপুরী হয়ে সোজা কৈলাস গেছে, আর একটা পথ গেছে আস্কোটের দিকে। আলমোড়া থেকে মানস সরোবরের পথে আস্কোট বোধহয় শেষ ভারতীয় শহর। তারপরে ভারত-তিব্বত সীমান্ত।

গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথ অন্য ধারে। তার জন্যে দেবপ্রয়াগে আসবারও দরকার নেই। হৃষীকেশ থেকে নরেন্দ্রনগর হয়ে একটা মোটরের পথ টেহরি গেছে। মসুরি থেকে আর একটা পায়ে চলা পথও এসে এই পথে মিশেছে।

মনোরঞ্জন আমাকে নীরব থাকতে দিল না। বলল: তীর্থের পথে তো আমরাও বেরিয়েছি। পড়াটা মনে মনে না করে জোরে জোরে করলে তোমারও মুখস্থ হত, আমরাও শুনে কৃতার্থ হতুম।

মনোরঞ্জন বলল: বাপ মায়ের এক ছেলে বলে এই রকম হয়েছে। এক দঙ্গলের মধ্যে মানুষ হলে কী করতে দেখতুম।

আমার চোখ ছিল মানচিত্রের দিকে, মনও তাই কোনও উত্তর দিলুম না।

মনোরঞ্জন ঝুঁকে পড়ে বলল: অনেক ক্ষণ তোমাকে দেখবার সময় দিয়েছি, বল এইবারে।

বললুম: গঙ্গা ও যমুনার উৎস যদি দেখতে চাও তো মোটর বাসে চেপে অনেক দূর যেতে পারবে। হৃষীকেশ থেকে যদি বাসে ওঠ তো দেবপ্রয়াগে নেমো না, ধরাসুতেও না, একেবারে ডাণ্ডেল গ্রামে গিয়ে বাস থামবে, সেইখানে নামো। অবশ্য কোথাও বাস বদলাতে হবে কিনা জানি না।

তারপর?

তারপর হাঁটতে শুরু কর।

সামনে থেকে পাঁচু জিজ্ঞাসা করল: কতটা হাঁটতে হবে গোপালদা?

বিপদের কথা।

কেন?

ম্যাপে তো মাইলের হিসেব নেই। দেখছি কোথাও আছে কিনা।

বলে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে এক জায়গায় দেখলুম যে ধরাসু থেকে যমুনোত্রী সাড়ে সাতচল্লিশ মাইল। এই পথের কতটা মোটর যাতায়াত করে তা বুঝতে পারলুম না। একেবারে আন্দাজে বললুম: আটত্রিশ মাইল।

এ যে দেখছি বদরীনাথের চেয়েও বেশি।

হরিদ্বারে ধর্মশালায় আমরা শুনেছিলুম যে বদরীনাথের পথ আজকাল সুগম হয়ে গেছে। শেষ কুড়ি মাইল পথ তৈরি হয়ে গেলে বাসেই আমরা বদরীনাথ যাতায়াত করব। সেই হিসাবে যমুনোত্রীর পথ বেশি কষ্টের। একশো একত্রিশ মাইলের ভিতর একশো চার মাইল পথ মোটর চলাচলের উপযোগী হয়েছে। আরও হবে।

ধরাসু থেকেই পথ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটা পথ যমুনোত্রী গেছে, আর একটা গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর পথেও উত্তর কাশী পর্যন্ত ট্যাক্সি যাচ্ছে।

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল: তারপর?

বললুম: যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রী যেতে হলে ধরাসু পর্যন্ত ফিরবার দরকার নেই। খানিকটা ফিরেই একটা পায়ে হাঁটা পথ আছে, সেটি এসেছে উত্তর কাশী। উত্তর কাশী থেকে গঙ্গোত্রী ছাপ্পান্ন মাইল।

মানচিত্রে দেখলুম যে গঙ্গোত্রী থেকেও কেদারনাথে আসবারও একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে। খানিকটা ফিরে সেই পথ পাওয়া যায়, বুদ্ধকেদার হয়ে ত্রিযুগী নারায়ণে এসে মিলেছে।

যদি কোন যাত্রী সমগ্র উত্তরাখণ্ড দেখতে চান তো তাঁর বারে বারে কোন একটি স্থানে ফেরার দরকার নেই। মসুরি থেকে যমুনোত্রী, সেখান থেকে গঙ্গোত্রী কেদার ও বদরীনাথ হয়ে মানস সরোবর ও কৈলাস চলে যেতে পারেন। ফিরবেন আলমোড়ার পথে। তা না হলে এই হৃষীকেশ তো আছেই। বাসে উঠেই পায়ে চলার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। একযোগে এই চারটি তীর্থ পরিক্রমা করতে প্রায় পৌনে সাতশো মাইল অতিক্রম করতে হয়।

মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল: আমরা এ সব তীর্থ দেখব না গোপালদা?

সাবিত্রী মিসেস মুখার্জির পাশে বসে ছিল। আমার মনে

হল যে মিসেস মুখার্জি মেয়েকে দৃষ্টি দিয়ে শাসন করলেন। এ কথা মনে হতেই আমি আরও অন্তরঙ্গ হবার ভাণ করলুম। বললুম: না ভাই, আমাদের অত সময় কোথায়।

মনোবঞ্জন আমাব পাশে বসে ছিল। সেও কটমট করে তাকাল।

সাবিত্রীর চোখে আমি পুলক দেখলুম।

তারাপদবাবু এ সবের কিছু দেখেন নি, বললেন: হিমালয়ের এই তীর্থগুলি দেখতে হলে মাস দুয়েকের ছুটি দবকাব। সেও গ্রীষ্মকালে।

বললুম: এই বইএ দেখছি যাত্রার সময় বৈশাখ মাস থেকে। জন্মাষ্টমীর পর আর যাওয়া চলে না। তখন পাহাড়ে শীত প্রবল হতে শুরু করে।

মনোবঞ্জন আমাকে বলল: তোমার একবার যাওয়া দরকার।

কেন?

তিন ধামেব কথা লেখা হয়েছে, বাকি আছে চতুর্থ ধাম।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল: ধাম মানে কী?

উত্তর মনোরঞ্জন দিল, বলল: ভারতবর্ষে চার ধাম। পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্বর ও উত্তরে বদরীনাথ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কি? পুরী, দ্বারকা ও বদরীনাথে বিষ্ণু, রামেশ্বরে শিব।

মনোরঞ্জন বলল: ব্যাপারটা একটু গোলমেলে লাগছে। দক্ষিণে কি কোন বিষ্ণুর মন্দির নেই?

রামেশ্বরে নেই। আর সব জায়গায় বিষ্ণু ও শিবের সমান প্রাধান্য। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ ও ত্রিবেন্দ্রমের পদ্মনাভ স্বামী বিশেষ বিখ্যাত। বরং শিবের ধাম চারটি হতে পারত। পূর্বে চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে সোমনাথ, দক্ষিণে রামেশ্বর ও উত্তরে কেদারনাথ।

মানচিত্রটি মুড়ে রেখে গাড়ির যাত্রীদের দিকে আমি একবার

তাকালুম। সবাইকে স্থানীয় যাত্রী মনে হল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের পিছনে বসে জানালার বাহিরে তাকিয়ে ছিলেন। আমি মুখ ফেরাতেই বললেন: রামের প্রতিষ্ঠিত শিব রামেশ্বরে। রাম বিষ্ণুর অবতার, তাঁর পায়ের ছাপ আছে রাম ঝরকায়।

তা বটে।

ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলায় কথা কইলেন, কিন্তু হাবে ভাবে তাঁকে এই দেশের লোক বলেই মনে হল। মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি হরিদ্বারেই থাকেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: বুড়ো বয়সে আর কোথায় থাকব?

কেন, কাশীতে?

অনেক দিন আগে একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এই পাহাড়ে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বাঙলা দেশে পদ্মার পারে তাঁর বাড়ি। কী একটা কথায় তিনি বলেছিলেন, শেষ বয়সটা তিনি ঐ পদ্মার পারেই কাটাবেন।

কেন?

সে ঐ পদ্মার সঙ্গে প্রেম। নিজের চোখে পদ্মা আমি দেখি নি। পদ্মার রূপের বর্ণনা আমি দিতে পারব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার প্রেম কি এই হিমালয়ের সঙ্গে?

উত্তরে ভদ্রলোক শুধু হাসলেন।

সাত মাইল অতিক্রম করে আমাদের বাস এসে সত্যনারায়ণের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়লেন, নামলেন না সেই ভদ্রলোক। আমি এক নজরে মন্দিরটা দেখে সকলের আগেই ফিরে এলুম। দেখলুম, ভদ্রলোক তখনও চুপচাপ বসে আছেন। কী মনে করে আমি তাঁর পাশে এসে বসলুম।

ভদ্রলোক আমাকে তাঁর পাশে বসতে দেখে একটুখানি হাসলেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না।

আমিই তাঁকে প্রশ্ন করলুম : হৃষীকেশে আপনি বুঝি কাজে যাচ্ছেন ?

গীতাভবনে কয়েকজন গুণী লোক এসেছেন, তাঁদের পায়ের কাছে খানিক ক্ষণ বসবার ইচ্ছা।

এর পরে আমি কী জিজ্ঞাসা করব ভেবে পেলুম না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন : আপনাকে বড় অশান্ত দেখছি।

আমাকে ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : এই প্রশ্ন করেই আপনি আমার সন্দেহটা সমর্থন করলেন।

এই মুহূর্তে আমার কাশীর কথা মনে পড়ল। সে দিন রাতে দশাশ্বমেধ ঘাটেও আমাকে একজন এই রকমের কথা বলেছিলেন। আমি তা বলতেই ভদ্রলোক বললেন : সাধারণ বেশে সেখানে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান শুনেছি। আপনি হয়তো তাঁদেরই কারও সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবেন।

হেসে বললেন : আমাকে যেন সে রকম কিছু ভাববেন না।

আমি উত্তর দিলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : পাহাড়ে বোধ হয় আপনি এই প্রথম আসছেন ?

আজ্ঞে।

পাহাড়ের নিচে থেকেই ফিরে যাবেন, উপরে উঠবেন না।

কেন ?

পাহাড় একবার ভাল করে দেখলে মনে আর শান্তি থাকবে না, বারে বারে আপনাকে টানবে। তাছাড়া—

ভদ্রলোক থেমে গেলেন। আমি বললুম : বলুন।

ঘরে বোধ হয় আপনার মন টেকে না।

আমি চমকে উঠলুম না, কোনও কৌতূহলও প্রকাশ করলুম না। শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলুম : কোন দিনই কি টিকবে না ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমি আমার অনুমানের কথা বলছি।

তাই বলুন।

এ শুধু এই বয়সের ধর্ম। কিছু দিন পরেই আপনার মন স্থির হবে। আপনার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সরে যাচ্ছে, আপনি সুখী হবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, তার কত দেরি আছে।

যাত্রীরা তখন একে একে ফিরে আসছেন। ভদ্রলোক বললেন: এ আমার অনুমানেব কথা, অভিজ্ঞতার কথা। আমি তো সাধু মহাপুরুষ নই, গণৎকারও নই। শুধু মানুষ দেখে কথা বলি।

আমি সরে এসে নিজের জায়গায় বসলুম। যাত্রীরা সবাই ফিরে আসবার পব আবার বাস ছাড়ল।

মনোরঞ্জন বলল: হৃষীকেশ দেখা আমাদের হবে না।

কেন?

হৃষীকেশের বাজারে বাস অল্প ক্ষণ দাঁড়ায়।

আমরা তো হৃষীকেশেই যাচ্ছি।

মনোরঞ্জন বলল: না, এই বাস লছমনঝুলা পর্যন্ত যাবে।

তাহলে তো আরও ভাল। আমাদের একেবারেই হাঁটতে হবে না।

কিন্তু এত বড় একটা তীর্থস্থান আমাদের দেখা হবে না!

কী দেখবার আছে, খবর নিয়েছ?

নিয়েছি বৈকি। ভরতের প্রাচীন মন্দির। বাবা কালীকমলী-ওয়ালার পঞ্চায়েতী সত্র, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী সত্র, ধর্মশালা—

আমি হেসে ফেললুম।

মনোরঞ্জন রেগে উঠল, বলল: হাসছ যে?

পিছন ফিরে সাবিত্রী বলল: ধর্মশালা আবার কেউ দেখে নাকি কাকাবাবু?

সেও হাসছিল।

কালীকমলীওয়ালার নাম আমরা সকলে জানি না। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সারা ক্ষণ কালো কম্বল গায়ে দিতেন বলে লোকে তাঁকে কালীকমলীওয়ালা বলত। তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠান। এদের ধর্মশালার সংখ্যা নব্বই, সদাব্রত পঞ্চাশ, মন্দির চিকিৎসালয় গোশালা অনাথ আশ্রমের সংখ্যা অনেক।

মনোরঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল, আর কোন কথা কইল না।

আমাদের সহযাত্রী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সহসা বড় রহস্যময় মনে হল। যে কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন, তাতে তাঁকে সাধু বা মহাপুরুষ বলা যায় না। তিনি গণৎকারও নন, তা তিনি নিজেই বললেন। অথচ তাঁর কথাগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। হাত দেখে বা কোষ্ঠী বিচার করে জ্যোতিষীরা এই রকম কথা বলেন।

হিমালয়ের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কোন নূতন কথা নয়। অনেকের মুখেই আমি এই কথা শুনেছি। দিল্লীতে মামাও আমাকে এই কথা বলেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে তাঁরা দুই বন্ধুতে গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখতে বেরিয়েছিলেন। পিঠে ঝোলাঝুলি হাতে লাঠি নিয়ে তাঁরা মসুরি থেকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

মামা বলেছিলেন: সে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মসুরি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধরাসু গ্রাম ভাগীরথী তীরে। মূলধারা নামে আর একটি ধারা এসে সেখানে মিলেছে। কী অবিরাম তরঙ্গ ভঙ্গ, কী গভীর কলোচ্ছ্বাস! মানুষে মন্দিরে, নদীতে সঙ্গমে, পাহাড়ে পাইনে একটি মায়াচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম।

যমুনার দেখা পাওয়া যায় আরও পঁচিশ মাইল উত্তরে হেঁটে, গাঙ্গনানিতে। এই শস্যশ্যামল গ্রামখানি ঠিক যমুনার তীরেই। গাঢ়োয়াল রাজ্যের স্ত্রী-পুরুষ কুৎসিত নয়, কিন্তু এমন রূপ বুঝি এ তল্লাটে নেই। এই শ্রী তাদের অন্তরেও খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষকে তারা শ্রদ্ধা করে, অতিথিকে ভাবে নারায়ণ।

যমুনোত্রী এখান থেকে মাইল চব্বিশেক। চার মাইল পথ বাকি থাকতে খরশালি গ্রামে রাত্রিবাসের বিধি। যমুনোত্রীর প্রচণ্ড শীতে রাত্রিবাস দুঃসাধ্য বলেই বুঝি এমন বিধি হয়েছে। পথে যমুনা উত্তীর্ণ হতে হয় দুবার। খরস্রোতা যমুনার কলভাষণ শোনা যায় না, শোনা যায় গর্জন। নিচে খাদের ভিতর থেকে তার গর্জন গুমরে গুমরে উপরে উঠে আসে। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু এই খরশালি গ্রাম। দোকানে বাড়িতে মন্দিরে ধর্মশালায় সহায় ও পাণ্ডাতে সারাক্ষণ গমগম করছে।

এর পরের পথটুকু বুঝি স্বর্গের সিঁড়ি। সমস্ত ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। চার মাইল পথ মনে হবে চারশো মাইল। কী কঠিন চড়াই, মানুষকে মনে হবে পিঁপড়ের মতো দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠছে। আর পাহাড়ের শিখরে উঠেই কি পথের শেষ হয়। যমুনা বয়ে যাচ্ছে অনেক নিচে খাদের ভিতর দিয়ে। সেইখানে মন্দির আর ধর্মশালা। পথহীন পাহাড় ভেঙে যমুনার তীরে নেমে দেখা যায়, ধর্মশালায় পৌঁছতে হলে আবার খানিকটা চড়াই ভাঙতে হবে।

সমুদ্রতল থেকে এ স্থান প্রায় এগারো হাজার ফুট উপরে। চার পাঁচটি প্রবল ধারায় যমুনা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সেই অপ্রশস্ত ধারাগুলি পেরিয়ে যমুনোত্রীর ক্ষুদ্র মন্দির। গল্পের শেষে যেমন তার ক্লাইম্যাক্স, তীর্থপথের শেষে তেমনি মন্দির। ক্লাইম্যাক্স জানবার জন্য আমরা গল্প পড়ি, তেমনি মন্দিরে পৌঁছতে ভাঙি দুস্তর পথ নদী ও পর্বত। সত্যিকার রসিক যে তার অন্য দৃষ্টি। শেষের পরেও সে আরও কিছু চায়। যমুনোত্রী পৌঁছেও মনে হবে, সবই তো বাকী রয়ে গেল। মন্দিরের পিছনে ঐ যে চিরতুষারের রাজ্য, ঐশ্বর্য লুকনো আছে তারই দুর্গমতার ভিতর। মনে হবে, সেখান থেকে ফিরে গেলে সে হবে একটা মস্ত পরাজয়।

* যারা তীর্থলোভী, তারা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করে বেলাবেলি

বরশালিতে ফিরে যায়। মামারা রয়ে গেলেন। মন্দিরের পূজারীর গুহায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। তার নিচে দিয়ে পাঁচ ছটি উষ্ণ জলের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই শীতের রাজ্যে পূজার গৃহকে বাসের উপযোগী করে যমুনার ধারার সঙ্গে তারা মিলিত হচ্ছে। আগুনে চাল সিদ্ধ করবার প্রয়োজন এখানে হয় না, কাপড়ে বেঁধে এই কুণ্ডের জলে ফেলে দিলেই তা ভাত হয়ে ভেসে ওঠে।

উত্তরে বরফের বিপুল বিস্তার, যমুনার ধারা তার তলা দিয়ে গলে আসছে। তুষারের উপর দিয়ে খানিক এগিয়ে দেখা যায় যে সামনের পাহাড় থেকে নেমেছে তিনটি জলধারা। মহাদেবের ত্রিশূলের মতো তারাই মিলিত হয়ে পাহাড়ের নিচের বরফের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে পাওয়া যায় বন্দরপুঁছ পর্বতচূড়া আর তার পাশের চম্পা সরোবর। এই হ্রদেই জন্ম নিয়েছে কালিন্দী যমুনা।

এই অপূর্ব পরিবেশের ভিতর মামারা একটি রাত কাটিয়েছিলেন। আকাশ সারা দিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাতে পেঁজা তুলোর মতো তুষার পাত শুরু হয়েছিল। নিস্তব্ধ নির্জন পৃথিবী। দেবাদিদেবের ডমরুর মতো যমুনার গর্জন এসেছে এ গুহার ভিতরে। পৃথিবীর কথা তাঁর মনে ছিল না, যা মনে এসেছে তা অন্য কোন জগতের কথা। এই আমাদের তীর্থ, হিন্দুর তীর্থ। দেবতা তো বড় নয়, বড় এই সুন্দর পৃথিবী। যা সুন্দর, তাই তীর্থ। সুন্দরের সাধনা করে আমরা দেবতাকে পাই। দেবতাও যে সুন্দর!



লছমনঝুলার বাস থেকে নেমে আমরা গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালুম। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ভাগীরথী গঙ্গা বয়ে আসছে। নিচে জলের ধারা। উপরে ঝোলানো পুল। লোহার তার দিয়ে দুধারের পাহাড়ের সঙ্গে বাঁধা এই লোহার পুলটির নামেই এই স্থানের নাম। এ ধারে যেমন মন্দির ও ধর্মশালা আছে, ও ধারেও তেমনি।

এ পারের মন্দিরগুলো দেখে আমরা পুলের উপরে উঠলুম। মনে হল, পুলটা অল্প অল্প দুলছে। মাঝখানে কয়েকজন দাঁড়িয়ে পুলটা দোলাবার চেষ্টা করছে। মনোরঞ্জন বলল: একজন লেখক এই পুলকে ক্যান্টিলিভার ব্রীজ বলেছেন।

বললুম: কলকাতার পুলকে ক্যান্টিলিভার বলে শুনেছি।

দুটো কি একই রকমের পুল?

না। দুটোর কোনটার নিচেই থাম নেই সত্যি, কিন্তু ব্যবস্থা অন্য রকম। কলকাতার অত বড় পুল দুটো পায়া আর নিজের ওজনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট পুল দেখছি লোহার দড়ি দিয়ে ঝোলানো।

তাহলে এটাকে কী পুল বলবে?

আমি ইঞ্জিনিয়ার নই, এর বেশি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।

পুল পার হয়ে আমরা ছোট ছোট মন্দিরগুলি দেখলুম। তার পর অগ্রসর হলুম স্বর্গাশ্রমের দিকে। লছমনঝুলায় লক্ষ্মণের মন্দিরটিই সব চেয়ে ভাল দেখলুম। হৃষীকেশে ভরতের মন্দির, এখানে লক্ষ্মণের, দেবপ্রয়াগে শুনলুম রামচন্দ্রের মন্দির। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ। এই মনোরম স্থানে রামের

বিশাল শ্যামবর্ণ মূর্তি যাত্রীরা তুচোখ ভরে দেখে। শত্রুঘ্নের মন্দির কোথায় আছে তা জানি না।

হিমালয়ের পাদদেশে রামচন্দ্র বোধ হয় রাবণবধের পাপক্ষালনে এসেছিলেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানবার মতো পণ্ডিত মানুষ সঙ্গে নেই। বাসের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক লছমনঝুলা পর্যন্ত আসেন নি। হৃষীকেশ ও লছমনঝুলার মাঝখানে মুনিকী রেতি নামে একটি জায়গায় নেমে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে সেখানে গঙ্গায় নৌকা পাওয়া যায়। এপারে কৈলাস আশ্রম, ওপারে স্বর্গাশ্রম, শিবানন্দ স্বামীর আশ্রম ও গীতা ভবন। তিনি নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে গীতা ভবনে যাবেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম: দেখা হবে তো সেখানে?

উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন: তাঁর ইচ্ছা।

লছমনঝুলায় আমরা একজন গাইড পেয়েছি। সে ছোকরা নাছোড়বান্দা। আমাদের সে সব কিছু দেখাবেই। পয়সা না দিলেও দেখাবে। মনোরঞ্জনের তাড়া খেয়েও সামনে সামনে চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রফা হল। সে পাঁচ টাকা থেকে পাঁচ সিকেয় নামল, আর মনোরঞ্জন পাঁচ আনা থেকে এক টাকায় উঠল। সে আমাদের লছমনঝুলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গাশ্রম যাবে, স্নান আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে গীতা ভবন প্রভৃতি স্থান দেখিয়ে নৌকোয় তুলে দেবে।

সে বলেছিল: বলেন তো ও পারে গিয়ে বাসেও তুলে দিয়ে আসতে পারি।

মনোরঞ্জন ধমক দিয়েছিল: তার জন্য তো আবার পয়সা চাইবে। যথেষ্ট হয়েছে।

সে আর কথা বলে নি। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরের নাম দেবতার নাম বলেছে। আমাদের দর্শনের পর আবার নিঃশব্দে চলেছে আগে আগে।

দেবপ্রয়াগের কথা আমি এই ছেলেটির কাছেই শুনেছিলুম। সে নিশ্চয়ই সেখানে গেছে, হয় তো কেদার-বদরীও ঘুরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে হয়তো আরও কিছু জানা যাবে। আমি তাই এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললুম।

ছেলেটি বলল: এই রাস্তাটি বেশ ভাল। তাই নয় বাবুজী? গাছের ছায়ায় চলতে একটুও কষ্ট হয় না।

বললুম: গঙ্গার বাতাসও পাওয়া যাচ্ছে।

কয়েক পা এগিয়ে বললুম: তুমি তো দেবপ্রয়াগ দেখেছ, কেদার-বদরী যাও নি?

তুবার গিয়েছি।

বললুম: সাবাস! তাহলে তো তোমার অনেক পুণ্য হয়েছে।

ছেলেটি গদগদ হয়ে বলল: আপনারা যান নি?

কই আর যাওয়া হল। খুব ভাল জায়গা বুঝি?

একবার গেলে বারে বারে যেতে ইচ্ছে করে।

সেই একই কথা। সবাই এই কথা বলে। বললুম: আর কষ্ট?

কষ্ট এমন কী! আর আপনারা পায়ে হেঁটে কেন কষ্ট করবেন? এখান থেকে বাসে উঠে দেবপ্রয়াগে গিয়ে নামবেন। কালকমলী-ওয়ালার ধর্মশালায় উঠে হরি কুণ্ডে স্নান করবেন, রঘুবীরের পূজা দেবেন। তারপর অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম দেখে আবার বাসে উঠবেন। টেহরীর বাসে উঠলে ভাগীরথীর তীরে তীরে আপনাকে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীর দিকে নিয়ে যাবে। আপনি রুদ্রপ্রয়াগের বাসে উঠে মন্দাকিনীর তীরে তীরে সোজা চলে যাবেন। কীর্তিনগর আর শ্রীনগর রাস্তা থেকেই দেখে নেবেন।

রুদ্রপ্রয়াগে এক রাত্রি ধর্মশালায় থাকবেন। জায়গাটি আপনার ভাল লাগবে। অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখবেন, আর রুদ্রনাথজীর পূজা করবেন। কেদারনাথ এখান থেকে আটচল্লিশ

মাইল, আর বদরীনাথ আটাশি মাইল। কুণ্ড পর্যন্ত একুশ মাইল পথ আপনি মোটরে যাবেন। দেড় মাইল হেঁটে গুপ্তকাশী। তার পর মন্দাকিনী পার হয়ে দু মাইল দূরে উখী মঠ। এইখান থেকে বদরীনাথের রাস্তা ডান হাতে।

কেদারনাথে যাবার মাঝপথে আপনি ত্রিযুগী নারায়ণের বিশাল মন্দির দেখবেন। নারায়ণের নাভি থেকে জল বেরিয়ে বাহিরের কুণ্ডে গিয়ে পড়ছে। কুণ্ড এখানে চারটি—ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র ও সরস্বতী কুণ্ড। সরস্বতী কুণ্ডের ভিতরে ছোট ছোট সোনালী রঙের সাপ আছে, কিন্তু কাউকে কামড়ায় না। এক জায়গায় একটা ধুনী জ্বলছে। সবাই সেখানে হোম করে। কত দিনের পুরনো আগুন জানেন ?

না।

হর-পার্বতীর বিবাহের সময় থেকে এই আগুন জ্বলছে।

সত্যি !

ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা কেন বলবে !

আমি দেখলুম, এই ছেলেটি এ-কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তার মনে কোন সন্দেহ কোন দিন জাগে নি। আমি তার বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে বললুম : তার পর ?

তার পর কেদারনাথ। এই মন্দির কে তৈরি করেছে জানেন ?

না।

পঞ্চপাণ্ডব।

পঞ্চপাণ্ডব এই পথে মহাপ্রস্থানে গিয়েছিলেন জানি। দ্রৌপদী বদরীনাথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। বদরীনাথে সহদেবের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কেদারনাথে এই মন্দির নির্মাণের কথা কোথাও পড়ি নি। বললুম : এত পুরনো মন্দির ?

ছেলেটি বলল : বোধহয় ভেঙ্গে গিয়েছিল, কেউ মেরামত করে দিয়েছেন।

তাই হবে।

কেদারনাথের মন্দির আপনার খুব ভাল লাগবে। একেবারে পিছনেই বরফের পাহাড়, রুপোর মতো ঝকঝক করছে। মন্দিরের ভিতরে কিন্তু শিবলিঙ্গ নেই, শ্যামবর্ণের একখানি বিশাল শিলা। যাত্রীরা পূজার পর আলিঙ্গন করে, অনেকে কাঁদে মাথা ঠুকে। কেন কাঁদে বুঝি না।

বোধহয় কষ্টে কাঁদে।

কষ্টের কথা তো কেউ বলে না! পুরাণ কী বলে জানেন? কেদারনাথ মহিষের পিঠের মতো, দ্বিতীয় কেদার বা মধ্য মহেশ্বরের নাভির আকার, তুরঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ ও কল্পেশ্বরে জটা। শীতকালে কেদারনাথের মন্দির বন্ধ থাকে, তাঁর পূজা হয় উখী মঠে।

উখী মঠ থেকে বদরীনাথের পথে তুঙ্গনাথ খুব উঁচু জায়গা, আর খুব শীত। গাছ পালাও বাঁচে না, কিন্তু দোকানদাররা ঠিক আছে। উপর থেকে চারি দিকে চেয়ে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। বরফের পাহাড় এত সুন্দর দেখায় কী বলব! অমৃত কুণ্ড কিংবা আকাশ কুণ্ডে স্নান করে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন।

চামোলিতে এসে আপনি অলকনন্দা পাবেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বদরীনাথের পথে এই চামোলি। এইখানে আবার আপনি বাসে উঠবেন। আমরা গোলাপকুটি পর্যন্ত বাস দেখেছিলাম, আপনি এখন যোশী মঠ পৌঁছে যাবেন। হৃষীকেশ থেকে যোশীমঠ এখন এক দিনে যাওয়া যায়।

যোশী মঠের নামে আমার শঙ্করাচার্যের কথা মনে পড়ল। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে কোচিনের এক নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে জাতিস্মর ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দর্শনাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন

করেন। কিছু দিন কাশীধামে বাস করে বদরীনাথে চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সকল ধর্মের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।—

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ভারতবর্ষের চারি দিকে তিনি যে চারটি মঠ স্থাপন করেন, যোশী মঠ তার অন্যতম। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। হিমালয়কে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন সমুদ্রকেও। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে তিনি কোথায় চলে যান, কেউ তা জানে না। তাঁর শেষ জীবন আজও রহস্যময় হয়ে আছে।

ছেলেটি বলল: এই যোশী মঠে বদরীনাথজীর গদি আছে। শীতকালে তাঁর চলমূর্তি এখানে এনে পূজা করা হয়। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে, আছে নবদুর্গা ও গণেশের মন্দির। এক জায়গায় দ্রৌপদীর একটি কালো পাথরের মূর্তিও আছে।

দ্রৌপদী কি তাহলে যোশী মঠে প্রাণত্যাগ করেন? কে জানে?

ছেলেটি বলল: যোশী মঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ। অলকনন্দা ও ধৌলি গঙ্গার সঙ্গম। কিন্তু সেখানে নামবার চেষ্টা করবেন না। এক দিক থেকে নর ও আর এক দিক থেকে নারায়ণ পর্বত এসে এইখানে মিলেছে। নদীতে নামবার সিঁড়ি দেখলেই আপনার ভয় করবে। ঘটিতে করে মাথায় জল ঢেলে বিষ্ণুর পূজা করে নেবেন।

তার পরেই বদরীবিশালজী। অলকনন্দার তীরে একটি ছোট শহর। সোনার মন্দিরের ভিতর বদরীনারায়ণের কালো পাথরের মূর্তি, মাথায় মুকুট, কপালে হীরা। দক্ষিণে কুবের ও গণেশের মূর্তি, বামে লক্ষ্মী ও নরনারায়ণ গরুড় ও আরও অনেক মূর্তি আছে।

আমি কোনও বইএ পড়েছিলুম যে শঙ্করাচার্য এই অঞ্চলের নারদ কুণ্ডে কতগুলি দেবমূর্তি দেখতে পান। সেই সময় আকাশবাণী হয়। তিনি সেই আদেশ শুনে মূর্তিগুলি কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে একটি বদরি গাছের নিচে স্থাপন করেন। বদরি মানে কুল গাছ। এই স্থানেব নামই আদি বদবী।

ছেলেটি বলল: শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন, কেদারনাথ ও বদরীনাথের সমস্ত পুরোহিত দক্ষিণদেশের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ।

আশ্চর্য! শঙ্কবাচার্য কি তাঁব আত্মীয়দের এখানে এনেছেন, না তাঁরাই এসেছেন শঙ্করের অন্বেষণে!

খানিকটা পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করবাব পব আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি গঙ্গোত্রী গেছ?

না। তবে গঙ্গোত্রীর কথা আমি শুনেছি। গঙ্গার তীরে খুব বড় মন্দির, সামনে ভগীরথ হাত জোড করে দাঁড়িয়ে আছেন। পূজার বাসনপত্র সব সোনাব।

একটু থেমে বলল: গোমুখ গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে, খুবই কঠিন পথ। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া আর কিছু দেখবাব নেই।

পিছন থেকে সাবিত্রী বলল: এত কী গল্প হচ্ছে গোপালদা?

মনোরঞ্জন বলল: ওব লেখার খোরাক যোগাড় করছে।

তারাপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: এরই নাম স্বর্গাশ্রম নয়? সাধু সন্ত তো দেখতে পাচ্ছি না!

ছেলেটি একটু দাঁড়িয়ে বলল: আছেন সবাই, কিন্তু যাত্রীদের সামনে বড় একটা বেরোন না।

আমার এক প্রাচীন ভ্রমণ কাহিনীর কথা মনে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দুর্গাচরণ রক্ষিত এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন: অখিল ভারতে এমন স্থান আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। ভারতীয় তীর্থে অধিকাংশ স্থান পবিত্রতা শূন্য। সর্বত্রই লোকালয় হইয়াছে।

এখানকার তপোবনে প্রবেশ করিলে সন্ন্যাসীদিগকে প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হয়।

আমরা কোন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলুম না, বরং আরও খানিকটা এগিয়ে লোকালয় দেখতে পেলুম। ছেলেটি বলল: এইবারে আমরা গঙ্গার ধারে যাচ্ছি।

ডান হাতে একটা ভোজনালয় ফেলে আমরা এগিয়ে গেলুম। সামনেই গঙ্গার ঘাট বাঁধানো। আমার কাঁধে ঝোলার ভিতর কাপড় গামছা ছিল, অন্য সবারও ছিল। দু তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে খানিকটা ক্লান্তি এসেছিল, ক্ষুধাও পেয়েছিল। স্নান করতে আমরা বিলম্ব করলুম না। কী ঠাণ্ডা কনকনে জল! হাত পা যেন কেটে যাচ্ছে কিন্তু কয়েকটা ডুব দেবার পর আর কোন কষ্ট রইল না। শরীর সুস্থ হল, স্নিগ্ধ হল, সমস্ত ক্লান্তি গেল দূর হয়ে। গা হাত পা মুছতে মুছতে মনোরঞ্জন বলল: আপনারা আসুন, আমরা এগোচ্ছি।

পাঁচু আমাদের সঙ্গে এল। পরে তারাপদবাবুরা এসে ভোজনালয়ে ঢুকলেন।

বিশুদ্ধ ঘিএর খাবার। দেরাদুনের বাসমতী চালের ভাত, ঘি মাখানো রুটি, ডাল তরকারি ও দই। খেয়ে সবাই তৃপ্তি পেলুম।

তার পরে আমরা গীতা ভবন দেখতে গেলুম। গঙ্গার ধারে ধারে এখন অনেক নূতন সৌধ নির্মিত হয়েছে। গোরখপুরের গীতা প্রেসের মাড়ওয়ারীরা এই গীতা ভবন নির্মাণ করেছেন। বাসস্থান ও ধর্মালোচনার জন্য এই গীতা ভবন।

সবাই যখন ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছিলেন, আমি খুঁজছিলুম বাসের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। এক জায়গায় ঘাসের উপর কয়েক জনকে দেখতে পেলুম। রোদ্রে বসে তাঁরা কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি এগিয়ে যেতেই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম।

তিনিও আমাকে চিনলেন, বললেন : কেমন দেখলেন সব ?

সংক্ষেপে বললুম : ভাল।

এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন ?

কেন বলুন তো ?

আত্মীয় বন্ধু কেউ এখন আছেন না সেখানে ?

আমার মনে হল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বলছেন, সেখানে গেলে কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব। জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন ?

ততক্ষণে মনোরঞ্জনরাও সেখানে এসে পড়েছিল। আমার প্রশ্ন শুনে বিস্ময়ে বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন : না না, যেতে আমি বলব কেন! আমি এমনই এ কথা বললাম।

আমাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে সেই ছেলেটি বিদায় নিল। আমার কাছে বোধ হয় কিছু আশা করেছিল, কিন্তু আমি কিছু দেবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। মনোরঞ্জনের কথায় আমার খেয়াল হল। সে জিজ্ঞাসা করছিল : তুমি কি সত্যিই মসুরি যাবে ভাবছ ?

জানি নে।

সত্যিই সেখানে কারও সাক্ষাৎ পাব কিনা আমি জানি না। আমার আত্মীয় কোথায় ? বন্ধুই বা কে ? তবে কি স্বাতিরা এখন মসুরিতে আছে ?

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা আমার মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন : সাধারণ বেশে কাশীতে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান।

তার পরেই বলেছিলেন : আমাকে যেন সে রকম কিছু ভাববেন না।

ভদ্রলোককে বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে। কে মহাপুরুষ আর কে নন, তা কি বেশ দেখে চেনা যায়!

মনোরঞ্জন একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল: কপালে তোমার অনেক দুঃখ আছে।

দুঃখ তো সুখেরই ভূমিকা।



পরদিন সকাল সাড়ে ছটায় আমি হরিদ্বার ত্যাগ করলুম। তারাপদবাবুরা বিদায় দিয়েছিলেন ধর্মশালাব দরজায়, মনোরঞ্জন এল স্টেশন পর্যন্ত। বলল : কোথাকার এক পাগলের কথা শুনে শুধু শুধু ঝামেলা পোয়াচ্ছ! যাচ্ছ যাও, কিন্তু রাত্রিবাস কিছুতেই ক'রো না। সঙ্গে গরম জামা নেই—

এ কথা মিসেস মুখার্জিও বলেছিলেন।

সাবিত্রী আমাকে লুকিয়ে বলেছিল : স্বাতিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে একটা সোয়েটাব কিনে নেবেন।

নেব।

আমার কথা বলবেন তো!

পরিমলের কথাও।

আপনি ভারি দুষ্টু!

বলে সাবিত্রী পালিয়ে গিয়েছিল।

বিদায় দেবার সময় মিসেস মুখার্জি বলেছিলেন : ফিরে আসতে দেরি হবে না তো, আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

আমি বলতে পারি নি যে আমার অপেক্ষা করবেন না, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। স্টেশনে মনোরঞ্জন যখন এই কথা বলল, তখন তাকে জানিয়ে দিলুম : আমাকে রেহাই দাও।

মনোরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বলল : কী বলছ তুমি!

বলছি এই কথা যে ভদ্রলোককে তুমি জানিয়ে দিও, তাঁরা যেন আমার অপেক্ষায় না থাকেন।

এই তোমার শেষ কথা?

হেসে বললুম: তোমার সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে কথা আমার কোন দিন শেষ হবে না।

মনোরঞ্জন কী বলবে বোধ হয় ভেবে পেল না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

কাল নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে আমরা বাস পাই নি। বাস সব সময় পাওয়া যায় না। দু একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল, আর একখানা স্টেশন ওয়াগন। একদল মানুষকে লছমনঝুলায় পৌঁছে দিয়ে সেইখানে অপেক্ষা করছিল। আমাদের মতো গঙ্গা পেরিয়ে এলে হরিদ্বারে ফিরবে। তারা পুরো গাড়িটা ভাড়া করেছিল। এই গাড়ির ড্রাইভার আমাদের হৃষীকেশ পৌঁছে দিতে রাজী হল। বলল, মাথা পিছু দু আনা লাগবে।

তথাস্তু বলে আমরা সব উঠে পড়েছিলুম।

হৃষীকেশ থেকে হরিদ্বারের বাস পেয়েছিলুম। সবাই যখন বাসের অপেক্ষা করছিলেন, আমি বেরিয়েছিলুম টুরিস্ট অফিসের খোঁজে। কাছেই একটা গলির ভিতর অফিস। সেখান থেকে দেরাদুন ও মসুরির ফোল্ডার সংগ্রহ করে নিয়ে নিলুম। আমি যে মসুরি যাবই, এ কথা মনোরঞ্জনই প্রচার করেছিল। বলেছিল: মা মনসাকে শুধু একটু ধুনোর গন্ধের দরকার। হৃষীকেশ থেকে কেদার বদরীর পথ দেখল, এবারে মসুরি থেকে দেখবে যমুনোত্রী গঙ্গোত্রীর পথ। তারপরেই দেখবেন পুরাণ সংহিতা—উত্তরাখণ্ড।

বলেছিলুম: ভয় নেই। আর যাই লিখি, এ পথের বর্ণনা লিখব না।

কেন?

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব থেকে মহাপ্রস্থানের পথের বর্ণনা শুরু হয়েছে, এখনও শেষ হয় নি। কেউ ও পথ দেখে ঘুরে এসেই

ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, কেউ ভ্রমণ কাহিনী লেখবার জন্যেই ও পথে যান। লেখেন সবাই।

তুমি না হয় না গিয়েই লিখবে—ইয়ারো আন্‌ভিজিটেড।

সে নজিরও নাকি আছে।

তারাপদবাবু বলেছিলেন : সত্যি নাকি?

পথের ভুল নির্দেশ দেখে অনেকে সন্দেহ করেন যে হয় শোনা কথা, নয় অনুমানের কথা।

মনোরঞ্জন বলেছিল : একটা কথা কিন্তু সত্যি বলেছ।

মিথ্যাও কিছু বলেছি নাকি?

মনোরঞ্জন বলল : বাঙলার ভ্রমণ কাহিনী সব হিমালয়কে নিয়ে। অন্য স্থানের সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী প্রায় না থাকার মতন। অজন্তা ঘুরে এলাম, আর দেখে এলেম খাজুরাহো, এ সব প্রবন্ধেরই মতো।

গ্রন্থ নেই ব'লো না, সংখ্যায় কম বলতে পার।

ঐ একই কথা।

দেরাদুন এক্সপ্রেস যখন স্টেশনের এলাকা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল, তখন আমি মনোরঞ্জনের কথা ভুলে গেলুম। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন আমার দুলে উঠল। সত্যিই আমার সঙ্গে কোন গরম জামাকাপড় নেই। হোটেলে হয়তো লেপ কম্বল পাওয়া যাবে, কিন্তু গরম জামা ভাড়া পাওয়া যাবে না। পকেটে এত পয়সাও নেই যে সাবিত্রীর পরামর্শ মতো একটা সোয়েটার কিনতে পারি। কাজেই বিকালের বাসে আমাকে ফিরে আসতেই হবে। মসুরিতে আমি কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় পাব। এই স্বল্প সময়ে আমি কী করতে পারি।

শুনেছি, মসুরিতে মাত্র একটি রাজপথ শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি তাই হয়, তাহলে বিকাল বেলায় কোন এক জায়গায় অপেক্ষা করলে হয়তো তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া

যাবে। পাহাড়ে বেড়াতে এসে তারা নিশ্চয়ই ঘরে বসে থাকবে না। পথে বেরলেই দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। এই ট্রেন দেরাদুনে পৌঁছবে বেলা সোয়া নটায়, তারপরে বাসে চেপে মসুরি। সকাল বেলায় পৌঁছতে পারলেও কিছু আশা ছিল।

পর ক্ষণেই আমার হাসি পেল। আমি কী জন্যে এই সব ভাবছি! একজন অপরিচিত লোকের একটা বেযাড়া মন্তব্যে আমি এত বিচলিত হয়ে পড়ছি। আমার কি সাধারণ বিচারবুদ্ধিটুকুও লোপ পেল। আমি সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলুম।

পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলছে। তেত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে দু ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে। জীবনের গতির মতো এই গাড়ির গতিও মন্থর।

বাইরের সবুজ গাছ পালার দিকে তাকিয়ে আমার ভাল লাগল। একটা মুক্তির আনন্দ এল মনে। সাবিত্রীকে আমি বঞ্চনা করি নি, ছলনা করেছি আর সকলের সঙ্গে। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার সহজ ব্যবহার দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু সন্দেহ করেছেন। এই সন্দেহে তাঁদের দুর্ভাবনার বদলে ছিল প্রচুর আশ্বাস আমার কাছে তাঁরা কোন প্রস্তাব করেন নি, আমিও সুযোগ পাই নি কোন উত্তর দেবার। মনোরঞ্জন মাঝখানে ছিল, আজ তাকে আমার মনের কথা জানিয়ে দিয়ে বেশ আরাম পাচ্ছি।

অনেক দিন আগে মনোরঞ্জন আমাকে নাযিকা বদলের পরামর্শ দিয়েছিল। এ হল বর্তমান যুগের কথা। পিছনের পায়ের চিহ্ন মুছে নূতন পথে চল, মনের পাতায় যেন কোন দাগ না পড়ে। অতীত শব্দটা অভিধান থেকে কেটে দাও, পার তো ভবিষ্যৎ শব্দটাও। ঐ দুটো বিশ্রী শব্দের উপর দাঁড়িয়ে তুমি বর্তমানকে উপভোগ কর। কালচক্রে ভেসে যাবে জীবন যৌবন ধন মান। তাকে ধরে রাখ, বেঁধে রাখ। ঐ ঝাঁঝালো মদ আকণ্ঠ পান করে

সমাজে গড়াগড়ি দাও। লোকে বাহবা দেবে, লোকে পুজো করবে, জ্ঞান ফিরে না এলে শহীদ নামে অমর হবে।

আর হে অতীত, তুমি তোমার ঐতিহ্যের লজ্জা নিয়ে হিমালয়ের গুহার ভিতর মুখ লুকোও। অনেক শতাব্দীর পরাধীনতার পর ভারত স্বাধীন হয়েছে, তাকে তার গ্লানি ভুলতে দাও। স্বাধীন দেশের মতো সেও পা বাড়াক। শুধু বিবাহের পূর্বে কেন বিবাহের পরেও তার নায়িকা বদলাক। নিজের রঙই বদলাক ক্ষণে ক্ষণে।

এই সমাজে তো প্রাণ নেই। একটা হৃদয়হীন দেহ কোল্ড স্টোরেজে রাখা আছে। স্বাভাবিক আলো বাতাসেব ভিতর টেনে আনলে পচে দুর্গন্ধ বেরবে। হৃদয়হীন দেহকে ভোগের বস্তু ভাবে নির্বোধ প্রাণী। বুদ্ধিকে আমরা সভ্যতার নামে বলি দিয়েছি. হৃদয়কে বাদ দিয়েছি বিজ্ঞানের নামে।

এক দিন দিল্লীতে চাওলা একটা পুরনো গল্প বলেছিল। তার এক বন্ধুর গল্প। অনেক চেষ্টায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে বাহিরে আসতে পেরেছিল। যিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি একটা উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একজন বড় ডাক্তারকে ব্রেনটা দেখিও, তা না দেখালে করে খেতে পারবে না। সে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার ব্রেনটা অপারেশন করে বার করে নিলেন। বললেন, দিন কয়েক পরে এসে নিয়ে যেও, এটা পরিষ্কার করে রাখব। চাওলার সেই বন্ধু আর ও পথ মাড়াল না। এক দিন অন্যত্র তার দেখা পেয়ে ডাক্তার বললেন: তোমার ব্রেনটা নিয়ে গেলে না? বন্ধুটি সপ্রতিভ ভাবে বলল: ওতে আর আমার দরকার নেই, আমি সরকারী চাকরি পেয়েছি।

এটি পুরনো গল্প। আর একজনের কাছে একটু অন্য রকম শুনেছিলুম। সে ব্রেন নয়, হার্ট। মগজের বদলে হৃদয়। সেটা এই সভ্য সমাজের মানুষের কথা।

দেরাদুন পৌঁছতে বেশি দেরি ছিল না। সেখানে পৌঁছেই আমাকে মসুরির বাস ধরতে হবে। যাবার সময় দেরাদুন দেখার আমি সময় পাব না। ফেরার পথেও পাব কিনা জানি না।

দেরাদুনের সম্বন্ধে আমার সামান্য কয়েকটি কথা জানা ছিল। কেদার খণ্ডের অন্তর্গত এই স্থানে একদা রাম ও লক্ষ্মণ রাবণ-বধের পাপ-ক্ষালনে তপস্যা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন শিখ গুরু রাম রায়।

শহরটি একেবারে সমুদ্র সমতলে নয়। কিছু উঁচুতে। কাজেই আবহাওয়া কতকটা পাহাড়ী শহরের মতো। দেরাদুনের মিলিটারী একাডেমীর নাম শুনেছি। এগার বৎসরের বালকেরা ভর্তি হতে পারে। তার পর শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে মিলিটারী অফিসারের পদে সরাসরি বহাল হয়ে যায়। একটি ছেলের জন্য যা দিতে হয়, কোন মধ্যবিত্তের পক্ষে তা সাধ্যাতীত। সাধারণ শিক্ষার জন্য দূন স্কুল আছে, তারও নাম শুনেছি। আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছি, তার নাম ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এর যাদুঘরে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। কয়েকটি বড় বড় ঘরে নানা রকমের বন্য দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি শাখা আছে—সিল্‌ভি কালচার লগিং বটানি ফরেস্ট প্যাথলজি এন্‌টমলজি উড অ্যানাটমি। উড লাইব্রেরিটিও নাকি দেখবার মতো। সেখানে নানা জাতের কাঠ বই-এর মতো সাজানো আছে। এ সমস্ত আমার শোনা গল্প। ফেরার পথে যদি সুযোগ পাই তো দেখে যাব।

এইবারে ফোল্ডার খুলে আরও কিছু জানলুম। ন মাইল দূরে একটি সুন্দর পরিবেশে সহস্রধারা গন্ধকের প্রস্রবণ। পাহাড়ের কোল দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে, আর গুহার মতো একটি স্থান থেকে গন্ধকের জল বেরচ্ছে। এই জল পেটের পক্ষে বড় উপকারী, চর্ম রোগের পক্ষেও। দেরাদুনের বাসিন্দারাও শুধু উপকারের লোভেই

আসে না, আসে পিকনিক করতেও। এই নদীতে স্নান করে বড় বড় পাথরের উপরে বসে আহার করে। সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। দেরাছুন শহর থেকে বাস চলাচল করে। বাসে এলে অনেকটা হাঁটতে হয়। ট্যাক্সি নিলে নদীর পুল পর্যন্ত চলে আসে, অল্প একটু হাঁটলেই এই সুন্দর জায়গাটি।

শহরের অন্য ধারে সেনা ছাউনির দিকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি গুহা আছে। তাব ভিতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়ে আসছে। তার ইংরেজী নাম রবার্স কেভ, লোকে বলে গুচ্চু পানি। জলধারার লুকোচুরি খেলা। উঁচু নিচু পার্বত্য পথে অনেকটা হেঁটে গিয়ে এই গুহা। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন যে এই পরিশ্রমের মজুরি পোষায় না।

দেখে নাকি তৃপ্তি পাওয়া যায় টপকেশ্বর মহাদেব। পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা, তার ভিতর মহাদেব। গুহার ছাদ থেকে মহাদেবের মাথায় টপটপ করে জল পড়ছে। এই জল কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। অলৌকিক ব্যাপার বলে সবার ভক্তি উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

ট্রেনের যাত্রীরা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাঁরা চাঁদর বিছিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা তৎপর ভাবে গুটিয়ে ফেললেন। জিনিসপত্র সামলাতে লাগলেন সবাই। বুঝতে কষ্ট হল না যে এবারে আমরা দেরাছুন পৌঁছব।

আবার আমার স্বাতির কথা মনে পড়ল। এবারে স্বাতিকে আমি খুঁজতে যাচ্ছি। দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যাবার সময় তারা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, রাজস্থানে আমাকে ডেকে এনেছিল, দিল্লীতেও আমি গিয়েছিলুম তাদের নিমন্ত্রণে। এবারে তার ব্যতিক্রম হবে। এবারে কেউ আমাকে ডাকে নি, আমি নিজেই যাচ্ছি। দৈবক্রমে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না।

যদি দেখা না হয়?

ফিরে আসব।

হরিদ্বারে?

সেখানে আর নয়। সোজা কলকাতায় ফিরে যাব।

কিন্তু স্বাতির সঙ্গে তাহলে দেখা হবে না। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা নেই। স্বাতি কি আমাকে ভুলে গেল। ভুলে গেলেন মামা মামী। জগতে অসম্ভব কিছুই নয় সম্ভবটাই শুধু সম্ভব হয় না।

গাড়ি এসে দেরাদুনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল।

৩৯

দেরাতুন স্টেশনের বাহিরে বাসের স্ট্যাণ্ড, ট্যাক্সিও আছে। পনর কুড়ি টাকা খরচ করলে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। বাসে তু রকমের জায়গা—আপার ক্লাসে তু টাকা টিকিট, এক টাকা ছ আনা লোয়ার ক্লাসে। এর পরে মসুরি প্রবেশের আগে টোল ট্যাক্স লাগবে মাথা পিছু দেড় টাকা। ট্যাক্সিতে গেলে তু টাকা। বড় লোকের মাথার দাম বেশি।

আমি একখানি লোয়ার ক্লাসের টিকিট সংগ্রহ করে পিছনের দিকে জায়গা পেলুম। পিছনে বেশি ঝাঁকি লাগে, যাদের মাথা ঘোরে বা বমির ভাব হয় তাদের কষ্ট বেশি। সামনের দিকে কষ্ট কম। মোটরে আরাম আছে। কষ্টবোধ একটা শৌখিনতা। যে যত শৌখিন, তার কষ্ট বোধ তত বেশি। গরিবের এই বোধ কম, তপস্বীর একেবারে নেই। বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় আর কত লাগবে! চারি দিকের সুন্দর দৃশ্য উপভোগেরই হয় তো সময় পাব না!

আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন, গরম কাপড়ের ভারে তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন। গরম ফ্লানেলের প্যাণ্ট, গলাবন্ধ কোট পরেছেন সোয়েটারের উপর, কোটের হাতের তলা দিয়ে সোয়েটারের হাত বেরিয়ে আছে। একখানা গরম চাদর মাথায় জড়িয়েছেন। জানালা দিয়ে যে হাওয়া আসছিল তাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে উসখুস করছিলেন, তারপর জানালার কাচ বন্ধ করবার চেষ্টা শুরু করলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?

ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশি নয়, মাঝবয়সী মনে হল। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন: কষ্ট হলে আপনি কী করবেন?

আমি ভিতরের দিকে বসে ছিলুম, বললুম: কষ্ট হলে আমি আপনার জায়গায় বসতে পারি।

আপনি বসবেন?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম: সরে আসুন।

ভদ্রলোক সরে এলেন। আর আমি তাঁর জায়গায় জানালার ধারে গিয়ে বসলুম।

একটু সুস্থ বোধ করতেই আমাকে বললেন: কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না।

কেন?

সেধে গিয়ে ওখানে বসলেন, অথচ গায়ে একটা জামা নেই।

এই তো মোটা খদ্দরের জামা গায়ে।

তলায় সোয়েটার নেই?

না।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন: বলেন কি মশাই!

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন: সঙ্গে যথেষ্ট গরম কাপড় আছে তো?

আমার ঝোলা ও কম্বলখানি দেখালুম। তিনি আঁৎকে উঠলেন: এ করেছেন কী! প্রাণে যদি বাঁচতে চান তো এইখানেই নেমে যান।

তার উদ্বেগ দেখে আমি হাসলুম।

হাসছেন আপনি!

এর পর ভদ্রলোক কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ল। গত বছর পূজার সময় আমরা রাজস্থান বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ভোর বেলায় আবু রোড স্টেশনে নেমে একখানা ট্যাক্সি করে আবু পাহাড়ে উঠেছিলুম। মামা মামীর সঙ্গে স্বাতি পিছনে বসে ছিল, আমি

বসে ছিলুম ড্রাইভারের পাশে। একখানা বাস আমাদের কিছু আগে ছেড়েছিল। সেখানা পেরবার সময় স্বাতি হেসেই আকুল।

মামী ধমক দিয়ে বলেছিলেন : অত হাসছিস কেন ?

স্বাতি কোন রকমে যা দেখতে বলল, তা ঐ বাসের ভিতর। আমি এক ভদ্রলোককে দেখলুম গলাবন্ধ কোট ও গায়ের চাদরে আপাদমস্তক ঢেকেও ক্ষান্ত হন নি, মাথায় একটা ব্যালাক্লাভা টুপি পরেছেন। স্বাতি বোধ হয় ঐ টুপি দেখেই হাসছে। খানিকটা সংযত হয়ে বলল : শীত দেখ।

মামা নিজেদের গরম জামা কাপড় দেখলেন। বললেন : এ-গুলো গায়ে দিয়ে নিলেই ভাল হত।

মামার মন্তব্য শুনে মামীও একটু হাসলেন। জোরে জোরে বাতাস বইছিল ঠিক, কিন্তু সে বাতাসে কারও শীত করে না। মামা তবু তাঁর আদেশটাকে জারি করবার চেষ্টা করলেন। বললেন : আমার সোয়েটারটা দাও।

উত্তরে মামী বললেন : এমনিতেই মাথা গরম, আর গরম জামা গায়ে দিয়ে কাজ নেই।

সে দিনও আমার কোন গরম জামা ছিল না। মামার হুকুমে আমার জন্য একখানা গরম চাদরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ আমার চাদরের নিচে একখানা কম্বল আছে। শীত করলে ঐখানিই ভরসা।

খানিক ক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমার সহযাত্রী বললেন : আমার কথাটা কি ভেবে দেখলেন ?

বললুম : বাস থেকে নামলেও তো মরণ।

কেন ?

এই বন জঙ্গলে—

খাবার কথা ভাবছেন ? এই তো একটু আগে একটা ছোট শহর পেরিয়ে এলাম। কী নাম মশাই জায়গাটার ?

হিন্দীতে আমাদের কথা হচ্ছিল, একজন হিন্দীতেই প্রশ্ন করলেন : কাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

আমার পাশের ভদ্রলোক চটে উঠলেন, বললেন : কাকে তার দরকার কী! জানেন তো বলুন না।

গায়ে পড়ে কথা বলা আমার স্ত্রী একদম পছন্দ করেন না। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তো উত্তর দিই।

সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর পাশেই ছিলেন, তিনি কটমট করে স্বামীর দিকে চাইলেন।

বেশ তো, আপনাকেই বলছি।

তবে জেনে রাখুন, ঐ জায়গার নাম রাজপুরা।

এই বারে আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন : শুনলেন তো, এইখানে নেমে হেঁটে চলে যান। থামতে বলব?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : যদি বাঘে খেয়ে ফেলে?

বাঘ! বাঘ কোথায়?

ভদ্রলোক পথের দু ধারে চাইলেন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে।

ও ধারের ভদ্রলোক বললেন : দিনের বেলায় বাঘ কোথায়!

এ ধারের ভদ্রলোক বললেন : আমিও তো তাই বলছি।

আর এক জন ভদ্রলোককে দেখলুম একখানা বইএর উপর চোখ রেখে হাসছেন।

আমাদের বাস এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর উঠছে। দেরাদুন যদি সমুদ্র সমতল থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচু হয় তো আমাদের আরও পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে। মসুরির উচ্চতা সাড়ে ছ হাজার ফুট। মাত্র বাইশ মাইল পথে এই পাহাড়ের মাথায় উঠতে হবে।

এক সময় আমার পাশের ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন : মসুরিতে কোথায় উঠবেন?

জানি নে।

সেকি মশাই, আপনি কোথায় উঠবেন তা কি আমি জানব!

বেশ তো, আমি না হয় আপনার পাশেই উঠব।

সর্বনাশ! আপনি আবার আমার পিছু নেবেন কেন!

ও ধারের ভদ্রলোক বললেন: দেখুন, গায়ে পড়ে কথা বলা—

স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি দেখেই ভদ্রলোক থেমে গেলেন।

কিন্তু আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন: থামলেন কেন, বলুন না কী বলছিলেন।

না না, আপনাদের কথার ভেতরে আমি কেন নাক গলাতে যাই!

নাক গলাবেন কেন, ঐখান থেকেই বলুন।

আজ আমার এই ছেলেমানুষী কথোপকথন মন্দ লাগছিল না। মন বড় হালকা ছিল। মনে হচ্ছিল, মসুরিতে পৌঁছে আমি স্বাতির সাক্ষাৎ পাব। মামা মামীও হয় তো আমারই অপেক্ষা করছেন।

সেবারে আবু পাহাড়ে রাণার অপেক্ষা করবার কথা ছিল। দিল্লীর মিস্টার ব্যানার্জির একমাত্র পুত্র রাণা। স্বাতিকে তার ভাল লেগেছিল, আর তাকে ভাল লেগেছিল মামীর। মামী তাকে জামাই করতে চেয়েছিলেন। তাই আগে থেকে ব্যবস্থা করে আবু আসছেন। কয়েকটা দিন এক সঙ্গে কাটাবার ইচ্ছা ছিল, একটু ভাল করে জানাশোনা, তার পর কথাবার্তা। দিল্লীতে ফিরে গিয়েই মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিয়ের দিন স্থির করবেন।

আবু পৌঁছে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। হ্যালো গোপালবাবু: বলে চাওলা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল। নমস্কার করেছিল ভিতরের সবাইকে।

ড্রাইভার অন্য দিকের দরজা খুলে ধরেছিল মামা মামীকে নামাবার জন্য। ওঁরা একটু সময় নিয়ে নামলেন। আমি চমকে

উঠলুম আর একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। মিত্রা কথা কইছিল মামীর সঙ্গে।

মামী বললেন: রাণা কোথায়?

দাদা। দাদা আসতে পারে নি।

আমি ফিরে দেখেছিলুম, স্বাতির মুখের প্রসন্নতা এতটুকু কমে যায় নি। পাহাড়ের মিঠে রোদে তাকে আরও বেশি খুশী দেখাচ্ছিল।

আজ মসুরিতে আমাকে দেখে কি স্বাতি খুশী হবে না।

মোটর এবারে বড় বেশি পাক খাচ্ছে। আমার পেটের ভিতরটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল। মুখ খুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলুম। বাসের ভিতরে অনেকে বমি করে। কিন্তু এ যাত্রায় সবাইকে সুস্থ দেখছি, স্বাভাবিক ভাবে সবাই বসে আছেন।

আবু পাহাড়ে উঠবার সময়ও আমার এই রকম মনে হয়েছিল। মামা বলেছিলেন: গোটা কয়েক কমলালেবু সঙ্গে নিলে ভাল হত।

মামী উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন: তোমার কি—

মামা বলেছিলেন: আমার একার জন্যে বলছি না। সবারই ভাল লাগত।

এবারে আমাদের এক সহযাত্রীর সঙ্গে কমলালেবু ছিল। কিন্তু তিনি খাচ্ছিলেন না। তাঁকে একজন ভয় দেখিয়েছে যে কমলালেবুর রস বড় মারাত্মক জিনিস, পেটে পড়লেই পাক দিয়ে উঠবে।

পথের দৃশ্য এত ক্ষণ ভাল লাগছিল, এইবারে পথ ফুরোলেই ভাল লাগবে।

এক সময় সত্যিই পথ ফুরলো। বাস টোল দিতে দাঁড়াল, তার পর মসুরিতে গিয়ে থামল।

মসুরি পৌঁছে গেছি শুনে আমার পাশের ভদ্রলোক আঁৎকে উঠলেন: অ্যাঁ, পৌঁছে গেছি!

তাই তো দেখছি।

তা আগে বলেন নি কেন!

বলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে পকেট হাতড়ে এক জোড়া উলের দস্তানা বার করলেন। সেটি পরে অন্য পকেট থেকে বার করলেন একটি টুপি। সেই টুপি মাথা থেকে কান পর্যন্ত নামিয়ে বললেন: কেলেঙ্কারি দেখুন।

তারপরেই আমার মুখের দিকে চেয়ে চটে উঠলেন। বললেন: আপনি হাসছেন!

ও ধার থেকে সেই ভদ্রলোক বললেন: গায়ে পড়ে কথা বলা—

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা তিনি ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন: উচিত নয়।

এ ভদ্রলোক ধমক দিলেন: বলুন না কী বলবেন। অত ভূমিকার কী দরকার!

মানে, আপনি একটু বেশি সাবধানী।

কেন, বেশিটা কোথায় দেখলেন!

সে ভদ্রলোক এ কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নামবার জন্যে তাড়া দিলেন।

যাত্রীরা সবাই একে একে নামছিলেন। আমরাও নামলুম।

৩২

যে জায়গায় আমরা নামলুম, তার নাম কিনক্রেগ। এটি মোটর বাসের আড্ডা। মাল চলাচলও হয় এইখান থেকে। রেলের বুকিং অফিস আছে। আউট এজেন্সি বুকিং অফিস। মোটর ও রেলে থ্রু বুকিং হয়।

এইখান থেকে দু দিকে দুটো রাস্তা গেছে। একটা লাইব্রেরির দিকে, আর একটা ল্যাণ্ডরে। এ দুটি মসুরি শহরের দুই প্রান্ত, একটি প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যুক্ত। তারই উপর বাজার হাট, হোটেল সিনেমা। যাত্রীরা এই দুই পথে কেহই গেলেন না। সকলে একটা পায়ে চলা পথ ধরলেন। ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। কুলীরা মাল নিয়ে তাঁদের পিছনে উঠতে লাগল। আমার ইতস্তত করবার কিছু নেই, জিজ্ঞাসা করবারও নেই কিছু। আমিও তাদের অনুসরণ করে পিছনে পিছনে উঠতে লাগলুম।

আমার সঙ্গে মসুরির যে ফোল্ডার ছিল, তাতে আমি দ্রষ্টব্য স্থানের পরিচয় মোটামুটি দেখে নিয়েছিলুম। এক দিকে লালটিব্বা আট হাজার ফুট উঁচু, অন্য দিকে ক্যামেল্‌স্ ব্যাক গান হিলের পিছনের রাস্তা। গান হিল সাত হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড় —তার উপর থেকে হিমালয়ের বরফ দেখা যায় সুন্দর ভাবে। প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে কেম্প্‌টি ফল্‌স্। এই জলপ্রপাত ছ শো ফুট উপর থেকে পাঁচটি ধারায় নিচে নেমেছে। মসি ফল্‌স্ আর হিয়ারসে ফল্‌স্‌ও সুন্দর দেখতে। মাছের জন্যে যেতে হয় অ্যাগলার ভ্যালি। সবই দূরে দূরে, নয় তো পাহাড়ের উপরে। এ সব দেখবার মতো প্রচুর সময় আমার হাতে নেই। উৎসাহও নেই। যে জন্যে আমি ছুটে এসেছি, তার হদিস পাব কেমন করে তাও জানিনে।

আমি বুঝি যে, কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে স্বাতির দেখা পাওয়া যাবে না। মসুরির রৌদ্রে এখন উত্তাপ পাচ্ছি। তারা বেড়াতে বেরিয়ে থাকলেও এতক্ষণ ফিরে গেছে। উত্তাপ তার ভাল লাগে না। ঘরের জানালায় বসে সে উত্তাপ উপভোগ করবে, তার জন্যে বাহিরে যাবে না।

তবু ভাবলুম যে মসুরির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একবার হেঁটে যাব। লাইব্রেরি থেকে ল্যাণ্ডর, কিংবা ল্যাণ্ডর থেকে লাইব্রেরি। গান হিলের উপরে উঠব না, উঠব না লালটিব্বাতেও, কেম্পটি ফল্‌স্ দেখে নেব মনে মনে। শুধু দেখব পথের ধারের বাড়িগুলো, আর হোটেল রেস্তোরাঁ। জনতার ভিতর কোন চেনা মুখ আছে কিনা তাই দেখে যাব।

উপরে উঠে আমি বাঁ দিকের পথ ধরলুম। বাঁ দিকে নাকি লাইব্রেরি। শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পথ ঘাট দোকান পাট হোটেল ও বাড়ি দেখতে দেখতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলুম। কাছে কোন লাইব্রেরি আছে কিনা চিনিয়ে দেবার সঙ্গী নেই। শুধু বাজারই দেখলুম। যে পাহাড়টির নিচে দিয়ে পথ, তাকে বেষ্টন করে আছে ক্যামেল্‌স্ ব্যাক। অরণ্যময় নির্জন পথ। মনে হল যে এই পথে অগ্রসর হলে পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে হিমালয়ের অন্য রূপ দেখতে পাব। সে উত্তর দিক। প্রত্যূষ হলে হয় তো বন্দরপুঁছ কিংবা বদরীনাথ পাহাড়ের দর্শন মিলত, তুষার ধবল উজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গ। এখন যে সবই মেঘে আচ্ছন্ন তাতে আমার সংশয় নেই।

ছোট ছোট পথ পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে। কত দূর গেছে তা জানি না। ছোট বড় রাজা মহারাজাদের অনেক বাড়ি আছে। একটি পাহাড়ী পথ নাকি চক্রাতা হয়ে সিমলা গেছে। চক্রাতা পর্যন্ত মোটর বাস চলে। তারপর পায়ে হাঁটা পথ।

চক্রাতা এখান থেকে একুশ মাইল। এ দেশের এটি একটি প্রিয়..

সেনানিবাস। মসুরির চেয়েও উঁচু তবে সেখানে যাবার সোজা রাস্তা দেরাদুন থেকে। পথ ষাট মাইল হলেও ঐ পথেই যাতায়াত বেশি।

চক্রাতা থেকে দুটি ঐতিহাসিক জিনিস লোকে দেখতে যায়। একটি অশোকের শিলালিপি, আর একটি মহাভারতের জতুগৃহ। মাইল তেইশেক দূরে লাখমণ্ডল নামে একটি গ্রামে যে প্রাচীন প্রাসাদ আছে, সেইটিই জতুগৃহ বলে পরিচিত। পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার জন্য কৌরবেরা এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

লাইব্রেরি থেকে আমি রাজা মহারাজাদের প্রাসাদ দেখতে গেলুম না, গেলুম না ক্যামেল্‌স্ ব্যাকএর নির্জন পথে। গান হিলের দিকে চেয়ে উপরে উঠবার উৎসাহ পেলুম না। তাই আবার ফিরলুম পুরনো পথে।

এক জায়গায় ক্যামেল্‌স্ ব্যাকের রাস্তা সমস্ত গান হিলটা ঘুরে আবার এসে বড় রাস্তায় পড়েছে। তার পরে এগিয়ে গেছে ল্যাণ্ডরের দিকে। দুধারের ঘর বাড়ি দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে গেলুম। এক সময় সরু পথ পেরিয়ে ল্যাণ্ডর পাহাড়েই পৌঁছে গেলুম। বাম হাতের পথ ধরে উপরে উঠবার বাসনা হল না, দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলুম। নীল দিগন্তের গায়ে অনেকগুলি ঘর বাড়ি। একজন যাত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে দূরের ঐ জায়গার নাম ঝরিপানি, ওক গ্রোভ নামে রেলওয়ের একটা ভাল স্কুল আছে। মসুরির উড স্টক হাই স্কুল ও সেণ্ট জর্জেস কলেজেরও নাম আছে।

মনে হল যে মসুরিতে আর কিছু দেখবার নেই। যা দেখতে এসেছিলুম, তা দেখলুম না। যা দেখলুম, তা না দেখলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এইবারে ক্লান্তি এল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও পেয়েছে দেখলুম। পথে অনেক হোটেল রেস্তোরাঁ আছে। কোন একটায় ঢুকে কিছু খেয়ে নিতে হবে। তার পরে বাস

স্ট্যাণ্ড। সময় মতো পৌঁছতে পারলে টিকিট পাবার আশ্বাস পেয়েছি।

ফেরার পথে আমি হোটেল দেখছিলুম। ছোট খাট কোন খাবার জায়গায় গিয়ে বসব। জাঁক জমক দেখলেই ভয় হয়, পকেট হালকা থাকলে সকলেই ভয় পায়। ভয় তো গরিবের অলঙ্কার।

শহরের মাঝামাঝি ফিরে এসে একটি পছন্দমতো হোটেল পেলুম। একটু নিরিবিলি, অল্প অন্ধকার। ধবধবে পোষাকের উপর তকমা ও পাগড়ির জৌলুসে চোখে ধাঁধা লাগছে না, কানেও তালা লাগছে না অবিশ্রাম বাজনায়। এই হোটেলেই ঢুকব বলে যখন স্থির করলুম, তখন ঘটনাটা ঘটল।

হ্যালো গোপালবাবু!

বলে লাফিয়ে যে ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে চিনতে আমার একটুও সময় লাগল না।

মিস্টার চাওলা যে!

অত্যন্ত সহজ ভাবে আমরা জড়িয়ে ধরেছিলুম। কতক্ষণ আলিঙ্গন-বদ্ধ ছিলুম জানি না, চমক ভাঙল আর একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে। মুক্ত হবার পরেও চাওলা আমার হাতখানা ধরে রইল। তার হাতের উষ্ণতায় আমি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করছিলুম।

মিত্রা বলল: এখানে যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

বললুম: আমি কিন্তু আপনাদের খোঁজে এসেছিলুম।

সত্যি!

খাঁটি সত্যি।

চাওলা আমাকে সেই হোটেলের ভিতর টেনে আনল। আমার কাঁধের ঝোলা-ঝুলি কেড়ে নিয়ে একখানা চেয়ারের উপর রাখল। তার পর বলল: এস।

তার সঙ্গে আমি ঘরের কোণায় এলুম। তারই নির্দেশে মুখ

হাত ধুয়ে মিত্রার কাছে ফিরে এলুম। দু প্লেট খাবার এসেছিল। চাওলা বলল : আর এক প্লেট, বহুত জল্‌দি।

আমার দিকে ফিরে বলল : তুমি শুরু কর, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

সমস্ত ঘটনাটা বুঝতে আমার বেশি সময় লাগল না। ওরা দুজনে এখানে খেতে এসেছিল। চাওলা বসে ছিল পথের দিকে মুখ করে। আমাকে দেখতে পেয়েই চিনতে পেরেছে।

চাওলা আমার হাতে কাঁটা চামচ গুঁজে দিয়ে বলল : আর দেরি কেন দোস্ত, সামনে খাবার নিয়ে কি কেউ দেরি করে।

তবু আমি আর এক প্লেট খাবারের জন্য অপেক্ষা করলুম। সেই প্লেট এলে এক সঙ্গে হাত লাগালুম।

মিত্রা বলল : এখনও আমার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

আমারও।

তার পরে আমি হৃষীকেশের সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কথা বললুম। সমস্ত শুনে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : সত্যিই অবিশ্বাস্য।

মিত্রা বলল : তাহলে আরও একটু বলি। কাল দুপুরে আমাদের ফিরবার কথা ছিল। সময় মতো বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়েও জায়গা পাই নি। আজ ট্যাক্সি ভাড়া করেছি।

আমার বুকের ভিতর এক রকমের অদ্ভুত বেদনা গুমরে উঠল। কাল দুপুর বেলায় বোধহয় ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক আমাকে বলছিলেন : এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন ?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : কেন বলুন তো ?

আত্মীয় বন্ধু কেউ এখন আছেন না সেখানে ?

সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বলছেন, সেখানে কোন আত্মীয় বা ব র সাক্ষাৎ পাব। জিজ্ঞাসা করেছিলুম : আপনি কি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন ?

ভদ্রলোক বললেন : না না, যেতে আমি বলব কেন, আমি এমনিই বলছিলাম।

এই ভদ্রলোকই আমাকে বলেছিলেন : সাধারণ বেশে কাশীতে অনেক মহাপুরুষ ঘুরে বেড়ান বলে শুনেছি। বাহিরটা দেখে তাঁদের চেনা যায় না।

হরিদ্বার বা হৃষীকেশে কি এ রকম মহাপুরুষ নেই। না তাঁদের আমরা দেখলেই চিনতে পারি।

মিত্রা তার রুটির একটা টুকরো নিয়ে খেলা করছিল। চাওলা বলল : খেয়ে নাও।

এতক্ষণে আমিও সম্বিৎ ফিরে পেলুম। তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করে বললুম : এইবারে তোমাদের কথা বল।

আমাদের কথা শুনতে হলে আরও কিছু খেতে হবে।

বলে বেয়ারাকে ডেকে বলল : রোগন জুস, সামী কাবাব ঔর চিকেন বিরিয়ানি। সুইট ডিশ কী আছে? ফির্নি ঔর—

বাধা দিয়ে আমি বললুম : ব্যাপার কী বল তো?

চাওলা প্রসন্ন মুখে মিত্রাকে বলল : বল ব্যাপারটা।

মিত্রা এক মুহূর্ত দেরি করল না। বলল : আমরা হানিমুনে এসেছি।

চামচে ফেলে দিয়ে আমি চাওলার ডান হাতখানা চেপে ধরলুম : কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌। কবে বিয়ে হল?

বুক ফুলিয়ে চাওলা বলল : এখানে আসবার আগে। বিয়ে করেই এখানে চলে এসেছি।

মিত্রার চোখে আজ কোন ভৎ‍র্সনা নেই, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মুখে প্রসন্নতা।

চাওলা বলল : তোমার বাবা হয়তো পুলিশে খবর দিয়েছেন।

কেন?

কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করেছে। তবে বিবাহটা দ্বারকায় না করে

দিল্লীতেই সেরে এসেছে। বিধিমতে খাতায় রেজেস্ট্রি করে। সাক্ষীদ্বয়ের নাম শুনে চমকে যাবে। মিত্রার পক্ষে রাণা, আর আমার পক্ষে—

বলে চাওলা থামল। তার পর বলল : কে বল তো ?

একটা অসম্ভব প্রশ্ন।

নাম শুনলে আরও অসম্ভব মনে হবে।

মিত্রা জানিয়ে দিল : স্বাতি।

আমার বুকের ভিতর দপ করে উঠল। চাওলা বলল : ভয় পেলে নাকি ?

মিত্রা হেসে বলল : ভয় নেই। দাদারও বিয়ে হয়ে গেছে। তার অফিসের একজন স্টেনোগ্রাফারকে বিয়ে করেছে।

আপনার বাবা রাজী হলেন ?

চাওলা বলল : পাগল। মিস্টার ব্যানার্জি তাকে গলা ধরে বার করে দিয়েছেন।

আমি ভেবে পাচ্ছিলুম না, এত সাহস রাণার কোথা থেকে হল !

কানের কাছে মুখ এনে চাওলা বলল : প্রেম।

এই দুটি অক্ষরের ভিতর কত শক্তি নিহিত আছে, তার পরিমাপ আজও হয় নি। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে মহাকাব্যে অনেক কাহিনী পড়েছি। দেখছিও অনেক মানুষকে, রাণাকেও দেখলুম। যে ছেলে বাপের আদেশ অমান্য করে আবু পাহাড়ে এল না স্বাতিকে পাবার লোভে, সেই ছেলেই এক দিন এমন দুঃসাহসের কাজ করল।

চাওলা বলল : স্বাতির কথা কিছু জানতে চাইলে না ?

আগে তোমাদের কথাই শুনে শেষ করি।

চাওলা বলল : মিত্রা আজও স্বীকার করে নি, কিন্তু আমি জানি, স্বাতি এই অসাধ্য সাধন করেছে।

বললুম: ভালবেসে রাণা বিয়ে করল, এর ভিতর অসাধ্য সাধনের কী আছে।

হায় দোস্ত, তুমি দেখছি এখনও আগের মতো আছো।

কেন?

তোমার বুদ্ধি হয়তো দৌড়য়, কিন্তু মন দৌড়য় না। রাণার গল্প আমরা অনেক ক্ষণ শেষ করেছি, এবারে নিজেদের কথা বলছি। স্বাতির সাহায্য না পেলে আমাদের এই হানিমুনে আসা হত না।

এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

আলবৎ। তোমার আমার মধ্যে প্রভেদটা তুমি এত শিগগির ভুলে যাচ্ছ।

আমি চুপ করে ছিলুম।

চাওলা বলল: তোমার কথাই আলাদা। আসল দুজন মানুষ এখনও তোমার পক্ষে। মেয়ে আর মেয়ের বাপ।

হেসে বললুম: সত্যি নাকি?

কেন স্থাকা সাজছ। আমার মতো একটা বিজনেস থাকলে মেয়ের মাও ভুলে যেতেন। আমার মতো ফুটো বিজনেস।

আবু পাহাড়েও সে আমাকে এই কথা বলে এমনি করেই হেসেছিল। আমি বললুম: তোমার বেলায় বুঝি স্বাতি তোমার পক্ষে ছিল?

আর রাণা। সে এখন রাজবাড়ি থেকে নিজের কোয়ার্টারে নির্বাসিত হয়েছে। তবে সুখে আছে দেখতে পাই।

গভীর ভাবে মিত্রা বলল: বাবাকে আমরা খুবই দুঃখ দিলাম।

মামার কাছে মিস্টার ব্যানার্জির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর মর্মান্তিক দুঃখ পাবার কথা। রাণা-মিত্রার পিতা নীতীশ ব্যানার্জি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সঙ্গে পড়েছেন, সেইখানেই সম্বন্ধের শেষ। বি-এ পাশ করে মিস্টার

ব্যানার্জি বিলেত গেলেন, ফিরলেন সিভিলিয়ান হয়ে। মামা তাঁর পৈতৃক জমিদারী দেখছেন শুনে বলেছিলেন, ফুল। সম্পত্তি দেখছে, না অধঃপাতে গেছে। আস্কারা দিয়ে গভর্নমেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

বাঙলার জমিদারদের প্রতি এই তাঁর মনোভাব। মামা আমাকে বলেছিলেন : তুমি জান না গোপাল, আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধু মহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাইবা শুনলে।

আজ নীতীশবাবুর সম্বন্ধে মামা কী বলবেন জানি না।

চাওলা বলল : তোমার বাবা দুঃখ পেতেনই, নিজের জন্যেই দুঃখ পেয়েছেন।

নিজের জন্যে কেন?

গদি হারাবার আগে ইজিপ্টের রাজা ফারুক কী বলেছিলেন মনে আছে?

না।

বলেছিলেন যে পৃথিবীতে এক দিন শুধু পাঁচটি রাজা থাকবে। চারটি তাসের রাজা, বাঙলায় তোমরা সাহেব বল ; আর ইংলণ্ডের রাজা, বর্তমানে রাণী।

তার সঙ্গে—

সম্বন্ধ আছে দোস্ত, সম্বন্ধ আছে। ব্যানার্জি সাহেব তাঁর ছেলে মেয়ের জন্যে রাজকন্যা আর রাজপুত্র জোগাড় করতে পারতেন না। চেষ্টা চরিত্র করলে হয়তো মন্ত্রীর পুত্র কন্যা পাওয়া যেত। কিন্তু সে যে পাঁচ বছরী মন্ত্রী। যাঁদের আসন কায়েমী, তাঁদের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েছে। ছেলে মেয়ের বদলে নাতি নাৎনি ধরতে হত।

হেসে বললুম : কোটালদের কথা বললে না?

এ যুগের কোটালরা ব্যানার্জি সাহেবকে আমল দেবে না। তিনি রিটায়ার করছেন কবে?

মিত্রা বলল: এই বছরেই।

তাহলে বুঝতে পারছ।

বললুম: এইবারে তোমাদের কথা বোঝা দরকার।

কাজের কথা। আমাদের কথা বুঝলে তোমাদের কথাও বোঝা হয়ে যাবে।

পরম কৌতুকে মিত্রা বলল: তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।

খাবার চেয়ে গল্পে আমাদের বেশি মন ছিল। বললুম: বলুন।

মিত্রা বলল: আজ আপনাকেও আমাদের সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে।

চাওলা চীৎকার করে উঠল: স্‌প্লেন্‌ডিড আইডিয়া। ঠিক এই জন্যেই তোমাকে বিয়ে করেছিলাম মিত্রা।

তুমি কি ওঁকে ফেলে যাবে ভেবেছিলে?

কথা না দিলে জোর করে নিয়ে যাব।

বললুম: কথা দিলে?

সকৌতুকে মিত্রা বলল: স্বাতির কথা সব বলে দেব।

এই কথা দেবার সময় স্বপ্নেও ভাবি নি যে আমার জন্যে আরও অনেক বিস্ময় ছিল সঞ্চিত হয়ে। আমার ভাগ্য দেবতা নিজে বাউণ্ডুলে, তাই আমার ভ্রমণের শেষ নেই। বললুম: এতে লাভ হল, না ক্ষতি, তা দিল্লী গিয়ে বুঝতে পারব।

চাওলা বলল: লাভ আঠারো আনা নয় দোস্ত, লাভ অমূল্য। আমার লাভের কি পয়সায় হিসেব হয়!

মিত্রার দৃষ্টিতে একটুখানি ভর্ৎসনা দেখলুম। তাতে আগের মতো তীব্রতা নেই, স্নেহস্নিগ্ধ সুন্দর ভর্ৎসনা। বলল: স্বাতির কথাতেই আমি চাকরি নিয়েছি। সে আমাকে স্বাধীন হবার পরামর্শ দিয়েছিল।

চাওলা বলল : কেন দিয়েছিল বুঝতে পার ?

মিত্রা বলল : তার এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরলে সেও চাকরি নেবে। তবে আমার মতো কলেজে নয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে।

চাওলা বলল : তার ধারণা যে এ যুগে একজনের রোজগারে সংসারের অভাব কোন দিন ঘুচবে না। অন্তত প্রথম জীবনে। স্বামী স্ত্রী দুজনকেই তখন সমান সংগ্রাম করতে হবে।

হেসে জিজ্ঞাসা করলুম : সে কি আজকাল দাম্পত্য জীবন নিয়ে রিসার্চ করছে ?

চশমার ফাঁক দিয়ে মিত্রা আমাকে কটাক্ষ করল, বলল : বিয়ের পরে করবে।

খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। উঠে আমরা মুখ হাত ধুয়ে নিলুম। চাওলা ম্যানেজারকে বলল : আজকের বিলটা তৈরি করে ফেলুন ম্যানেজার সাহেব, আজ আমরা সত্যিই যাচ্ছি।

প্রসন্ন মুখে ম্যানেজার বললেন : দেখিয়ে।

নিজেদের ঘরে চাওলারা তাদের জিনিসপত্র বেঁধে রেখেছিল। খানিকটা বিশ্রাম করেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম

যে পথ দিয়ে উঠেছিলুম, সেই পথ দিয়েই নামলুম। কিন্তু তখন যা দেখি নি, এখন তা দেখতে পেলুম। প্রায় চার হাজার ফুট নিচে বিস্তৃত শ্যামল সমতল ভূমি। চাওলা বলল : ঐ সমতল ভূমির নাম দুন প্লেনস্। পরিষ্কার দিনে গঙ্গা ও যমুনা দুই নদীকেই দেখা যায় রূপোলি ধারার মতো।

ট্যাক্সিতে করে আমরা মসুরি ত্যাগ করলুম। এখানে কেউ আমাদের বিদায় দিতে এল না; কেউ বলল না,

এস। আমরা নিজেরাই মসুরির কাছে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলুম।

খানিকটা পথ অতিক্রম করবার পর মিত্রা বলল: স্বাতি আমাকে কী বলেছে জানেন?

আমি তার মুখের দিকে ফিরে তাকালুম।

মিত্রা বলল: স্বাতি বলেছে যে রাজার ঘরে যতক্ষণ, ততক্ষণই রাজকন্যে। সেকালে রাজকন্যারা যখন মুনি ঋষিকে বিয়ে করতেন, তখন কি আর কেউ তাঁদেব রাজকন্যে বলত!

কথাটা মিথ্যে নয়।

কিন্তু কেন এ কথাটা বলেছে জানেন! ওকে আমি কেন বিয়ে করছি না জানতে চেয়েছিল। আপনাকে যা বলেছিলুম, তাই বললুম।—আমাদের মতের মিল নেই। ও ভাবে যে ঘুঁটেকুড়োনির দুঃখই হল দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। ওর সমাজ-সচেতন মন একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে।

মিত্রা একটু দম নিল, তার পরে বলল: স্বাতি বলল যে মিস্টার চাওলাই ঠিক বলেন। রাজার ঘরের রাজকন্যের জন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই, যখন তিনি ঘুঁটেকুড়োনির মতো ঘুঁটে কুড়োন, তখন তিনি আর রাজকন্যে নন, তখন তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। তাঁরও দুঃখ বেদনাব জন্যে আমরা দায়ী হব।

স্‌প্লেন্‌ডিড।

বলে চাওলা একেবারে চেঁচিয়ে উঠল।

মিত্রা বলল: স্বাতি আমাকে আরও একটা কথা বলেছে। সে কথাটিও আমি সযত্নে মনে রেখেছি। সে বলেছিল, মনের মিলনের

রম্যাণি বীক্ষ্য

। ভ্রমণের আনন্দ চিরন্তন—নতুন দেশ দেখার বাসনা একটা নেশার মতো। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের কাছে তো অপরিহার্য, যাঁরা ভ্রমণ না করেও ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁরাও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর রম্যাণি বীক্ষ্যর পর্বগুলি পর পর পড়ে যান। ভ্রমণের শখ তাঁদের অনেকাংশে মিটবে।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, রম্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই কথা। আর বাস্তবিক, রম্য-দর্শনই হল রম্যাণি বীক্ষ্যর মূল সুর, তার বিস্তার অতীতের ঐতিহ্য আলোচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, পৌরাণিক কাহিনী ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। এতে সমগ্র ভারতের বিচিত্র দর্শনীয় স্থানগুলির সবিস্তার বর্ণনার সূত্র ধরে লেখক তাদের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোকিত কুঠরীতেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তীর্থমাহাত্ম্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্যের বা সংশ্লিষ্ট তীর্থ ও জনপদের বর্তমান পরিচয় দানেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার অতীত কাহিনী কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে বিবৃতি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ—নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে।

শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। রম্যাণি বীক্ষ্যর একটিমাত্র খণ্ডও যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এ বইয়ে ভ্রমণ-কাহিনীর পাশে পাশে একটি রম্য কাহিনীও গ্রথিত আছে। এই জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনী বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। এতে শুধু যে কাহিনীই বিস্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়, ভ্রমণের রসের ভিতর উপন্যাসের রসেরও

অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভ্রমণে যাঁরা ততটা উৎসাহী নন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁরা প্রাণরসের সন্ধানী, একমাত্র উপন্যাসের রসের আকর্ষণেই তাঁরাও যে রম্যাণি বীক্ষ্যর প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন তা অসংশয়ে বলা যায়। ভ্রমণরসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসরসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী, মামী ও তাঁদের অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। তাঁরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ধরতে এসেছেন। স্টেশনে তাদের ভৃত্য নিখোঁজ, আর এই সময় প্লাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগ্নে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। কিন্তু পদ-মর্যাদা বা সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মাপকাঠিতে গোপালের বাজারদর যাই হোক, সঙ্গী হিসাবে তার মতো রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও জ্ঞানান্বেষী যুবককে সঙ্গে পাওয়া আনন্দের কথা। মামা তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন আর গোপালও স্বাতির চোখের তারায় আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। ফলে সেও হল দক্ষিণ ভারতের যাত্রী।

প্রথম গ্রন্থ **দক্ষিণ ভারত পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ধরা দেবার মত সহজ পাত্রীও সে নয়। সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। মাদ্রাজে, মহাবল্লীপুর ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি ও রামেশ্বরে আমরা দুজনকে পাশাপাশি দেখি। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে এক অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **দ্রাবিড় পর্ব**। তাদের ঘরে ফেরার পালা। কেরালা রাজ্য থেকে মহীশূর রাজ্য। হালেবিদ বেলুর ও শ্রাবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে এল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই দ্রাবিড় পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

তারপর যখন যবনিকা উঠল তখন গোপালকে দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও

আগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণরত দেখা গেল। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়। মামা অঘোর গোস্বামী গোপালকে গরিব জেনেও জামাই করতে পারতেন, কিন্তু মামীর তাতে গভীর আপত্তি। গোপালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজেদের ধনী মানী সমাজে মুখ দেখাতে তিনি ভয় পান।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি চতুর্থ গ্রন্থ **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তারা আবু রোডে এলো। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা। গোপাল ও স্বাতির সম্পর্ক আগের মতোই সহজ রইল।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের বিখ্যাত তীর্থস্থান দ্বারকা সোমনাথ ও জুনাগড়ের কথা **সৌরাষ্ট্র পর্বে** বিবৃত হয়েছে। একদা এই রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্যস্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে ব্রত-সংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি, ষষ্ঠ গ্রন্থ **মহারাষ্ট্র পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুণা ভ্রমণে ব্যস্ত। তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি— ধারা, মাণ্ডু, বিদিশা ও উজ্জয়িনী, ঝাঁসি সাঁচী খাজুরাহো, নাগপুর ও জব্বলপুর।

সপ্তম অষ্টম ও নবম গ্রন্থ **উৎকল মগধ ও কোশল পর্বে** সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। পুরীর সমুদ্রবেলায় ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। মগধ পর্বে শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে একসঙ্গে।

তারপরে আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। কোশল পর্বে বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা। কুমায়ুনের শৈলাবাস ও হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির পরিচয়ও বাদ পড়েনি।

দশম গ্রন্থ **হিমাচল পর্বে** গোপাল আবার মামা-মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান।

অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্যদিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে যাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রম্যাণি বীক্ষ্যর একাদশ গ্রন্থ **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

দ্বাদশ গ্রন্থ **কামরূপ পর্বে** সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা, নাগারাজ্য ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প-পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীর আশ্চর্য পরিচয়।

বাকী রইল বাঙলার কথা